এখন হৃদয়

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

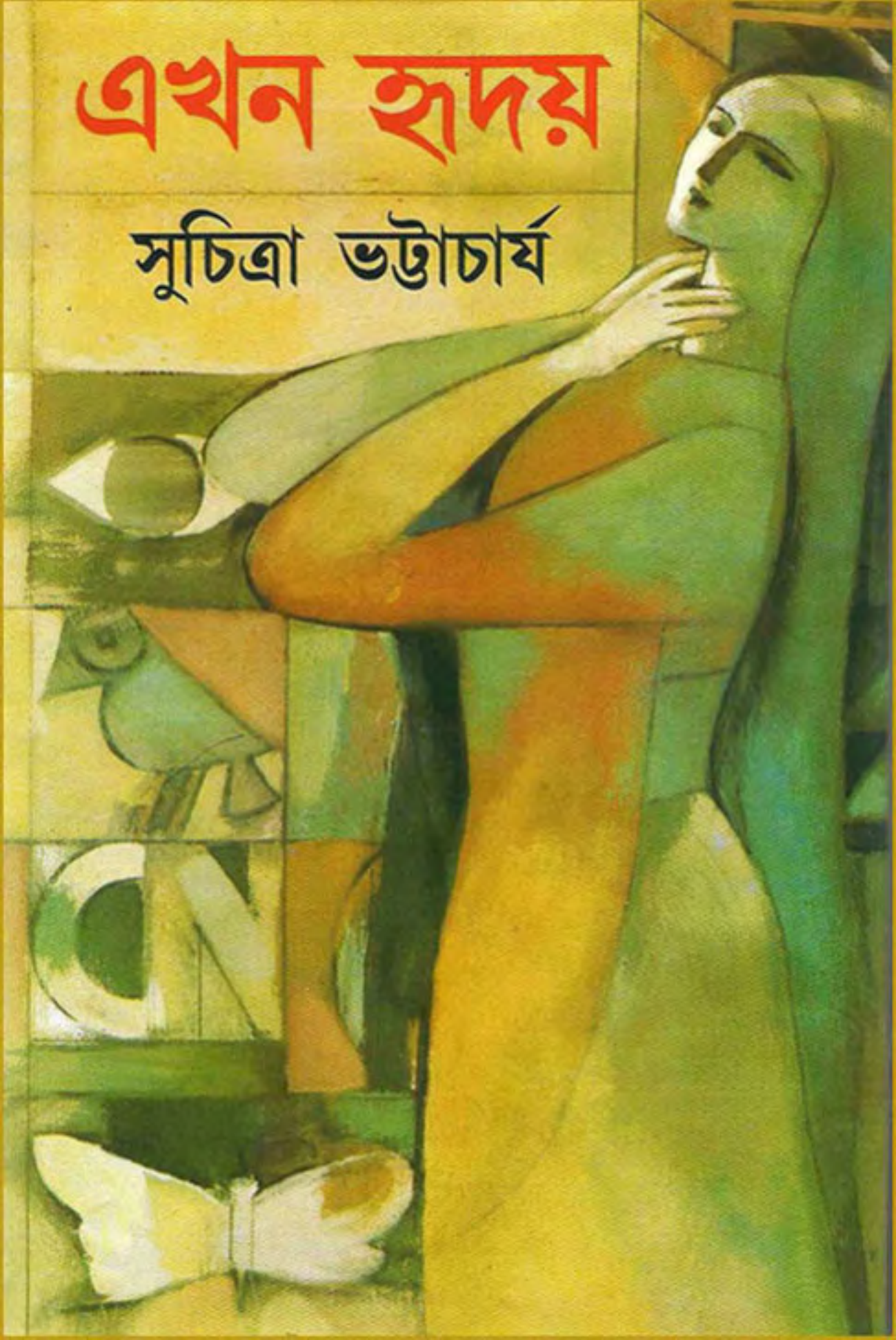

এখন হৃদয়

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সাহিত্যম্ ॥ ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সুরজিৎ ঘোষ
বন্ধুবরেষু

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে ছোটগল্পের জগতে সুচিত্রা ভট্টাচার্য এক প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব। গল্প বলার ক্ষেত্রে এবং বিষয় নির্বাচনে তিনি ভীষণ রকম আধুনিক। দৈনন্দিন জীবনে নরনারীর মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বহু অনুভূতি প্রতিনিয়ত নড়াচড়া করে, যেগুলি কখনও কখনও প্রকাশিত হয়, আবার কখনও কখনও হৃদয় জুড়ে ছটফট করে অথবা বরফ-শান্ত সময়ের মধ্যে একান্ত নীরবতার মধ্যে বসবাস করে। লেখিকা এই সমস্ত অনুভূতির শেকড় ধরেই তুলেদেন পাঠকের কাছে। অবশ্যই প্রতিটি লেখার মধ্যে লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্য পরীক্ষা নিরীক্ষার ছাপ স্পষ্ট করে তোলেন। সাম্প্রতিক মানুষের জীবনযাপন, আশা নিরাশা আবেগ অনুভূতিগুলি এমন সুন্দর ও সাবলীলভাবে পরিবেশন করেন, যা লেখিকাকে পাঠক পাঠিকার খুব কাছে পৌঁছে দেন।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের তেমন কিছু হৃদয়ে সাড়া জাগানো পনেরটি গল্প নিয়েই প্রকাশিত হল গল্প সংকলনটি। আশাকরি এই সংকলনটিও পাঠকের মধ্যে সাড়া ফেলবে।

প্রকাশক

সূচিপত্র

এখন হৃদয়	৯
রাঙাকাকা	২৬
মুহূর্ত	৪৪
হারাণের বাঁচা মরা	৫৮
খুরশিদ	৬৬
ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি	৯০
অন্য সুখ	১০৮
আয়নার মুখ	১১৫
বীরপুরুষ	১২৫
সুধাকর	১৪২
সহযাত্রী	১৬০
নক্ষত্রের মন	১৭২
ফেরা	১৮৩
অশরীরী সভা	১৯৩
আলোছায়া	২০৮

এখন হৃদয়

রুমির সঙ্গে এখনও সেভাবে কথা হয়নি বিজয়ার। সবে গতকাল শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে রুমি। সন্ধেবেলা। ব্যাগ স্যুটকেস সব গুছিয়ে নিয়ে।

মাসখানেক ধরেই বিজয়ার মন বলছিল কিছু একটা ঘটতে চলেছে। বাড়ি যেন তেতে আছে সামান্য। যেন কাছেপিঠে কোথাও আগুন লেগেছে, তার তাপ এসে ঢুকে পড়েছে এই পরিবারে। কারণে অকারণে মেজাজ গরম করছে দীপু, সোমার মুখ সারাক্ষণ হাঁড়ি, এ তো শুভ লক্ষণ নয়!

নিজে থেকে কিছুই বলছিল না দীপু সোমা। অবশ্য সংসারের কোন কথাটাই বা ছেলে ছেলের বউ আজকাল জানায় বিজয়াকে! জিজ্ঞেস করলেও তো এড়িয়ে এড়িয়ে যায়, নয় উত্তর দেয় ভাসা ভাসা। ভাবে হয়তো তিয়াত্তর বছরের বুড়িটাকে বেশি পাত্তা দিয়ে কী লাভ, কোন সুরাহাটা করতে পারবে সে!

তবু এইটুকুন ফ্ল্যাটে কিছুই কী গোপন থাকে পুরোপুরি? ফোনাফুনি, ফিসফাস, চাপা স্বরে কথাবার্তা কানে তো এসেই যায়। হাঁটু কোমর গেলেও

বিজয়া তো কানের মাথা খাননি এখনও। চোখের জ্যোতিও আছে কিছুটা। তাই হয়তো নজরে পড়ে ছেলের কপালে যেন আচমকা উঁকি দিয়েছে একটা-দুটো বলিরেখা।

তা এ কালের রেওয়াজে তো বিজয়া তেমন অভ্যস্ত নন, চেপে রাখতে পারেননি কৌতূহল। কৌতূহল, না উদ্বেগ? উদ্বেগ, না আশঙ্কা? না কি সবগুলোই মিলেমিশে পাক খাচ্ছিল মনে?

দিন কয়েক আগে জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলেন ছেলেকে,—হ্যাঁ রে, রুমির কী হয়েছে রে?

দীপু তখন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। এক হাতে ধরা ছিল গ্রিল, দূরমনস্ক চোখ মেলা ছিল সামনের মাঠটার ওপারে। আনমনে বলেছিল,—উঁ? কিছু বলছ?

—রুমির কথা জিজ্ঞেস করছি। ওর কোনও সমস্যা হয়েছে নাকি?

—হুঁ।

—কী হল?

—রুমি আর শ্বশুরবাড়ি থাকবে না। চলে আসবে। মনে হচ্ছে পাকাপাকি।

শুনেই বিজয়ার বুক ঢিপঢিপ,—সে কী রে? কেন?

আলগা কাঁধ ঝাঁকাল দীপু,—বনিবনা হচ্ছে না।

—কার সঙ্গে? শ্বশুর শাশুড়ি?

—নাহ্।

—তাহলে? কৌশিক?

—ধরে নাও তাই।

—বলিস কী! অত কাণ্ড করে ভাবভালবাসার বিয়ে হল...দুজনের কত প্রেম...আর মাত্র এক বছরের মধ্যেই...? হলটা কী?

—কিছু তো হয়েছে নিশ্চয়ই। নইলে তো আর কোনও মেয়ে শখ করে বর ছেড়ে চলে আসে না।

দীপুর স্বর হঠাৎই রুক্ষ। ঢোক গিললেন বিজয়া,—রুমি বলছে না, কেন চলে আসছে?

—আহ্ মা, কেন ঘ্যানঘ্যান করছ? তেতো মুখে খেঁকিয়ে উঠল দীপু।

তারপর কক্ষনো যা করে না তাই করল, পরিচ্ছন্ন ব্যালকনিতেই সিগারেট ফেলে নেবাল চিপে চিপে। পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল মরে আসা চন্দ্রমল্লিকার টবখানা। নতুন ফাল্গুনের সন্ধেটাকে ঝলসে দিয়ে বলল,—জেনে তোমার কটা হাত পা গজাবে, অ্যাঁ?

—না মানে...

—বয়স তো অনেক হল, ঠাকুর দেবতা নিয়ে থাকো না। নইলে টিভি খুলে সিরিয়াল দ্যাখো। নাতনির চিন্তায় তোমায় উতলা হতে হবে না।

বলেই গটগটিয়ে নিজেদের ঘরে।

আহত মুখে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বিজয়া। ছেলে হুকুম ঝাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে নাতনির চিন্তা ঠাকুমার মাথা থেকে কর্পূরের মতো উবে গেল, এ তো হয় না। বাপ মা দুজনেই তো নাচতে নাচতে অফিস বেরিয়ে গেছে চিরটাকাল, ওই মেয়েকে তিনিই তো কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। আজ রুমির কথা ভেবে বিজয়ার বুক আনচান করবে না তো কার করবে?

বিজয়া ভেবেই পাচ্ছিলেন না কী করে অমন অলুক্ষুণে কাণ্ড ঘটতে পারে! এই তো বড়দিনের সময়ে দুজনে এসেছিল একসঙ্গে, তখনও তো দুটিতে কী ভাব! কত হাহা হি হি করল, এ ওর পাত থেকে তুলে তুলে চিনে খাবার খেল, মুখ থেকে কথা খসতে না খসতেই কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল কৌশিক, ড্যাং ড্যাং করে ট্যাক্সি চেপে চলেও গেল জোড়ে। তখন নিশ্চয়ই অশান্তি চলছিল না? নাকি মা বাবা ঠাকুমা দুঃখ পাবে বলে টের পেতে দেয়নি রুমি? তাহলে বলতে হয় বিয়ের পর তুখোড় অভিনেত্রী বনে গেছে নাতনি! আগে তো রাগ বিরাগ অনুরাগ কিছুই লুকোতে পারত না। অন্তত বিজয়ার কাছে। ঠোঁট ফোলাত কথায় কথায়, মুখ ছেয়ে যেত মেঘে।

তবে বিবাদটা কী পরে শুরু হয়েছে? তাহলেও তো বেশি দিন নয়, বড় জোর দেড়-দু মাস। মাত্র এই কদিনে কী এমন মনোমালিন্য হতে পারে, যাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই ছিঁড়ে যায়! একেবারেই চলে আসতে হয় বাপের বাড়ি?

না কি দীপু সোমা একটু বেশিই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছে? হয়তো তেমন কিছুই নয়, তুচ্ছ কারণে খিটিমিটি বেধেছে বর-বউয়ে, গোঁসা করে কদিনের জন্য আসছে রুমি? কৌশিককে জব্দ করতে? বিরহের স্বাদ টের পাওয়াতে? বরকে টাইট দিতে বউরা কী বাপের বাড়ি চলে যায় না? বিজয়াই তো

গেছেন। কী তাসের নেশা ছিল তাঁর কর্তাটির, বাপস্! একবার দল বল নিয়ে আসরে বসে পড়লেন, তো আর হুঁশটি নেই। রাত বারোটার আগে বাড়িমুখো হতেন না। বিজয়া তখন নতুন বউ, পথ চেয়ে বসে আছেন তো বসেই আছেন। হাই তুলতে তুলতে দেখছেন শাশুড়ি শুয়ে পড়লেন, জায়েদের ঘরে খিল পড়ে গেল, কর্তার তবু দর্শন নেই। কাঁহাতক ওই অত্যাচার সহ্য হয়! অনুনয় বিনয় কাকুতি মিনতিতে যখন কাজ হল না, তখন দিলেন এক মোক্ষম প্যাঁচ। সোজা চলে গেলেন কোন্নগর।

বউ আর ফেরার নামটি করে না দেখে উনিশ দিনের মাথায় ঘাড় ঝোঁকাতে বাধ্য হয়েছিলেন বিজয়ার দাপুটে কর্তাটি, মান ভাঙাতে গুটিগুটি পায়ে এসেছিলেন শ্বশুরবাড়ি। তাসের নেশা যদিও ছাড়েননি, তবে খানিকটা সংযত তো হয়েছিলেন, নটা-দশটার মধ্যে ফিরতেন তো বাড়িতে। পুরুষ মানুষকে বশে রাখতে গেলে বাপের বাড়ির জুজুটা দেখাতেই হয়, বিজয়া জানেন।

রুমিও হয়তো তাই করছে। কোনও কারণে কৌশিককে বাগে আনতে ঠাকুমার পলিসিটাই নিচ্ছে নাতনি। সময় যতই পাল্টাক, হুঁ-হুঁ বাবা, ঘি-আগুনের সম্পর্ক যাবে কোথায়? রুমি এসে কটা দিন বসে থাকুক ঘাপটি মেরে, দ্যাখ না দ্যাখ কৌশিক এসে নির্ঘাত হামলে পড়বে। বউকে ওই ছেলে চোখে হারায়, এ বিজয়া স্বচক্ষে দেখেছেন। পুজোর সময়ে মাত্র পাঁচ-ছটা দিন এ বাড়িতে এসেছিল রুমি, প্রতিদিন দৌড়ে দৌড়ে এসেছে ছেলেটা। সেই সল্টলেক থেকে এই বেহালা, কম দূর তো নয়!

প্রেম অবশ্য রুমিরও কম নেই, বিজয়া এও জানেন। নইলে ওইভাবে বিয়ে করে ছেলেটাকে? তখন সবে প্রথম একটা সম্বন্ধ এসেছিল রুমির, সোমা মেয়ের কাছে প্রস্তাবটা পেড়েছে কি পাড়েনি, ওমনি মেয়ে খরখর করে উঠল,—কেন ফালতু ফালতু এনার্জি লস করছ মা? আমার বিয়ের ভাবনা আমার। তোমাদের নয়।

সোমা নরম করে বলেছিল,—তা বললে হয়? মা বাবার একটা কর্তব্য আছে তো।

—কোরো কর্তব্য। দাঁড়িয়ে থেকে বিয়েটা দিয়ো। তবে পাত্র খোঁজার হাঙ্গামায় যেয়ো না। ওটা আমার চুজ করা আছে।

দীপু চমকিত হয়ে বলেছিল,—কে?

—তোমরা চেনো তাকে। কৌশিক তো রণজয় সুদীপ মধুমিতাদের সঙ্গে এসেছে এ বাড়িতে।

—কৌশিক? মানে ঢ্যাঙা মতন ছেলেটা?

—বলছিস কী তুই! সে তো চাকরি বাকরিও করে না!

—কে বলেছে? জার্নালিজম পড়েছে, এখন ফ্রিলান্স করছে। প্লাস, আবৃত্তিতেও ওর কত নাম। শিগগির ওর ক্যাসেট বেরোবে।

—কিন্তু তোমার বিয়ে আমরা আরও ভাল ছেলের সঙ্গে দিতে চাই রুমি। যার অন্তত একটা স্ট্যান্ডার্ড ইনকাম আছে, একটা মিনিমাম স্ট্যাটাস আছে।

—তোমরা চাইলে তো হবে না। বিয়ে তো করব আমি।

ব্যস, লেগে গেল ধুন্ধুমার। এক দিকে বাবা মা, অন্য দিকে মেয়ে। দীপু তড়পাচ্ছে, দেখি কী করে ওই ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়, মেয়েও শাসাচ্ছে, দেখি তোমরা কী করে আটকাও...!

যুদ্ধের সময়ে আগাগোড়াই স্পিকটি নট ছিলেন বিজয়া। জানতেন দৃশ্যপট বদলাবেই, ছেলে ছেলের বউ যতই গর্জন করুক, মেয়ের কাছে তাদের হার মানতেই হবে। মেয়ের কোনও বাসনা অপূর্ণ থাকলে যে বাবা মার রাতের ঘুম চলে যায়, কতক্ষণ তারা মেয়ের সঙ্গে যুঝবে?

তাছাড়া কৌশিক তো ছেলে খারাপ নয়। দিব্যি দেখতে, চোখ দুটো মায়াবী মায়াবী, কথাবার্তায় অতি ভদ্র, বাপ সরকারি চাকুরে, সল্টলেকে নিজেদের ফ্ল্যাটও আছে। মূর্খ অশিক্ষিতও নয় ছেলে, আজ ভাল রোজগারপাতি না থাকলে কাল হবে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের আসল বনেদ তো প্রেম, সেটি থাকলে অনেক বাধা বিঘ্নই উৎরে যাওয়া যায়।

বিজয়া যা ভেবেছেন, তাই হল। দুম করে রুমি একদিন রেজিস্ট্রি করে ফেলল কৌশিককে, খবর পেয়ে দীপু গুম হয়ে রইল এক-দু'দিন, সোমা ফোঁচ ফোঁচ করে কাঁদল, তারপর মেনেও নিল। সামাজিক অনুষ্ঠান, শাড়ি গয়না খাট আলমারি, নমস্কারী দেওয়া থোওয়া, কী না হল নিয়মমাফিক! বিয়েটা শুধু চুকতে যা দেরি, তারপর তো ওই দীপু সোমাই কৌশিক কৌশিক করে অজ্ঞান।

সব কিছু নিয়েই বড় বাড়াবাড়ি করে দীপু সোমা। জামাইষষ্ঠীতে কী এলাহি আয়োজনটা করেছিল। ট্রে সাজিয়ে তত্ত্ব গেল এ বাড়ি থেকে। জামাইকে একদিন ঘরে রেঁধে খাওয়াল সোমা, একদিন বড় হোটেলে। মেয়েকে গয়নাও দিল এক প্রস্থ। পুজোতেও দামি দামি উপহার, গাদা গাদা জামাকাপড়...। দেখে কে বলবে, ওই জামাই-এর নাম শুনে কদিন আগেও চিড়বিড়িয়ে জ্বলেছিল?

মাত্রাজ্ঞান নেই বলেই কি দীপুরা ঘাবড়ে গেছে এত? রজ্জুতে ওদের সর্পভ্রম হচ্ছে না তো?

দুই

রুমির সঙ্গে এখনও পর্যন্ত সেভাবে কথা হয়নি বিজয়ার। সুযোগ মিলছে কই!

কাল সন্ধেয় এ বাড়ি আসার পর থেকে বাপ মা যেন ঘিরে রেখেছে মেয়েকে। কথা বলছে হাবিজাবি। রুমির চাকরি নিয়ে, কাজকর্ম নিয়ে...। বিয়ের পর পরই এক টেলিভিশান চ্যানেলে ঢুকেছে রুমি। স্টুডিয়োতে বসেই কাজ। কম্পিউটারে কীসব করে-টরে। টিভির প্রোগ্রাম-টোগ্রামগুলোকে দেখন বাহার করে তোলাটাই নাকি ওর ডিউটি। তা ওসব নিয়েই কৌতূহল দেখাচ্ছে দীপুরা, আসল প্রসঙ্গটিকে ভুলেও তুলছে না।

হয়তো এটাই স্বাভাবিক। হয়তো এভাবেই মেয়ের মনটাকে একটু অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখতে চাইছে বাবা মা। মেয়েকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে।

কিন্তু বিজয়ার তর সইছিল না। ছটফট করছিলেন মনে মনে। আজ সকাল থেকেই তক্কে তক্কে ছিলেন, কখন নাতনিকে একটু একান্তে পাওয়া যায়।

দীপু সোমা অফিস বেরিয়ে যাওয়ার পর ফাঁকা হল বাড়ি। বাবা মার ঘরে কম্পিউটার খুলে বসেছে রুমি, পায়ে পায়ে সেখানে এলেন বিজয়া।

সরাসরি অবশ্য পাড়লেন না কথাটা। নাতনির পিঠের ধারে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন,—তোর শরীরটা ভাল নেই না কি রে রুমি?

কী একটা যেন টাইপ করছিল রুমি। কাজ না থামিয়েই বলল,—কেন? ঠিকই তো আছি।

নাতনির গলা কি একটু ভার ভার? বুঝতে পারলেন না বিজয়া। নরম গলাতেই বললেন,—তাহলে জলখাবার খেলি না কেন?

—খেয়েছি তো।

—কই, মাত্র একটা তো টোস্ট খেলি!

—সকালে ওইটুকুই ভাল। বারোটার মধ্যে তো ভাত খেয়ে নেব।

—অফিস যাবি?

—যাব না?

—কটা দিন ছুটি নিতে পারতিস।

—কেন? রুমি হেসে ঘাড় ঘোরাল, —কিস্ খুশিমে?

—না মানে...তোর একটু বিশ্রাম হত। মনের ওপর দিয়ে এত বড় একটা ঝড় যাচ্ছে...

—কীসের ঝড়? রুমি চোখ কুঁচকোল।

—বুঝি রে বাবা, সব বুঝি। বিজয়া গিয়ে বসলেন খাটের কোণটিতে। মাথা দুলিয়ে বললেন,—তোর মনে এখন কী চলছে, আমি কি টের পাই না? তোর বয়সটা কি আমার ছিল না?

রুমির চোখ আর একটু কুঁচকোল। পালক পালক আঁখিপল্লব পিটপিট করল একটুক্ষণ। তারপর দু হাত মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, —কিসুই বোঝো না। একটা সম্পর্ক তৈরি হওয়া উচিত ছিল, হতে হতেও হল না, ব্যস্ ফিনিশ। এর জন্য বিছানায় শুয়ে সাত দিন গড়াগড়ি দেব কোন দুঃখে?

বিজয়া ভারি অবাক হলেন। চোখ গোল গোল করে বললেন,—সে কী রে! তোর কোনও কষ্ট নেই!

—খারাপ তো একটু লাগছেই। বন্ধুবিচ্ছেদ হলেই একটা অড ফিলিং হয়, সে জায়গায় কৌশিক তো বনে গেছিল আমার লাইফ পার্টনার।

—বনে গেছিল কেন? এখনও তো আছে।

—অবশ্যই না। কৌশিক এখন পাস্ট টেন্স। আর কদিন পরে হয়ে যাবে ওয়ান্স আপন আ টাইম...। পরিচয় দিতে গেলে বলতে হবে কৌশিক বসু কোনও এক সময়ে আমার হাজব্যান্ড ছিল।

কথার কী ছিরি! মুখে কিছু আটকায় না গো!

বিজয়া ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে বললেন,—ছাড়াছাড়ি তা হলে তোদের হবেই? একেবারে সব ফাইনাল করে ফেলেছিস?

—হ্যাঁ ঠাম্মা। সুখের চেয়ে স্বস্তিই বেটার।

নাতনির স্বরে হাহাকার নেই কণামাত্র। বিষণ্ণতা? উঁহু, তাও নেই যেন। বরং হাবভাবে মনে হয় সত্যিই যেন দুশ্চিন্তামুক্ত হয়েছে রুমি।

থমকে গেলেন বিজয়া। কী বলবেন এই মুহূর্তে ভেবে পাচ্ছিলেন না। তিনি তো আদ্যিকালের ঠাকুমা নন, চারদিকে যে আজকাল ডিভোর্স ফিভোর্সের ধুম পড়ে গেছে তা তো তিনি হরদম দেখছেন। আজকাল নয়, বেশ কিছুকাল ধরেই। চেনাজানার মধ্যেও তো ডিভোর্স হয়েছিল। বছর কুড়ি আগে। ভাইঝির জামাইটা মদ টদ খেত, স্বভাবচরিত্রও সুবিধের ছিল না, মারধরও করত শীলাকে। কাটানছাড়ান হয়ে যাওয়ার পর বিজয়ারা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। তবু ওই পাষণ্ডটাকে ছেড়ে এসেও কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকত শীলা, সংসার ভেঙে যাওয়ার শোক সামলাতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল।

কিন্তু রুমির কোনও হেল্‌দোলই নেই! এক বছর হোক আর যাই হোক, একসঙ্গে ঘর করেছে, একত্রে শোওয়া বসা থাকা, কোনও রেশ কি থাকবে না তার?

বিজয়া জিজ্ঞেসই করে ফেললেন,—বেশ তো ছিলি। হঠাৎ ঘটল কী তোদের? কী নিয়ে বাধল?

—ওই আর কি। মনের মিল হল না।

—আগে অত মন দেওয়া নেওয়া হল, আর পরে মনের মিল হল না!

—হল না। মনের আসল চেহারা কি বিয়ের আগে দেখা যায়? ও যে এত অসভ্য, এত বর্বর আমি বুঝব কী করে?

—আশ্চর্য, হঠাৎ ছেলেটা মন্দ হয়ে গেল! আগে তো কোনও দিন এ কথা বলিসনি? শেষ যেদিন এলি, সে দিনও তোদের কত ঢলাঢলি...

—অশান্তি থাকলেই কি মুখে তার সাইনবোর্ড টাঙিয়ে ঘুরতে হবে? লোককে দেখাতে হবে, আমি অসুখী?

—ও। বিজয়া অপ্রসন্ন স্বরে বললেন,—তা এখন তোমাদের অশান্তির কারণটা জানতে পারি?

—বললাম তো। ও একটা অসভ্য। বর্বর। ওকে দেখে যা মনে হয় ও মোটেই সেরকম নয়।

—কী অসভ্যতা করেছে? তোর গায়ে হাত তুলেছে?

—অত সোজা! হাত ভেঙে দিতাম না তাহলে!

—তবে? নেশাভাঙ্ ধরেছে? মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে?

—সে কে না একটু আধটু খায়! তবে পেঁচি মাতাল হয়ে বাড়ি এসে হল্লাগুল্লা করবে, কৌশিক সেই টাইপ নয়।

—তাহলে? অন্য মেয়ের সঙ্গে ভাব করেছে?

—হুঁহ্, সে গাট্‌স ওর আছে নাকি! আমিই যা ভুল করে ওকে বিয়ে করে ফেলেছি, আর কোনও মেয়ে ওকে পাত্তা দেবে?

বিজয়া অধৈর্যভাবে বললেন,—তাহলে তোদের ঝামেলাটা কী?

—বললাম তো, মনের অমিল। আমি একরকম। কৌশিক একরকম। ও একটা নির্ভেজাল এম-সি-পি।

এই শব্দটা রুমির মুখে আগেও কয়েকবার শুনেছেন বিজয়া। মানেটা ঠিক জানেন না, তবে এটুকু বোঝেন কথাটা পুরুষদের উদ্দেশে ছোঁড়া এক চোখা গালাগাল। ছেলেদের নাকি পৌরুষের অহংকারে মটমট শুয়োর না কী যেন বলা আছে গালাগালটায়।

ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন,—কী পৌরুষের গরম দেখাল সে?

—এক রকম নয়, অনেক রকম। নিজের এখনও পাকা চাকরি জোটানোর মুরোদ হল না, ওদিকে আমি চাকরি করছি, সেটাও সহ্য হয় না। তুমি তো জানোই আমার চাকরির নেচার। ফিরতে রাত হয়। কৌশিকের সেটা একেবারেই না-পসন্দ। কেন চাকরি করছি...এমন চাকরি করার দরকার কী...! এর সঙ্গে আবার কী সাংঘাতিক সন্দেহবাতিক। উৎকট পজেসিভনেস। কোনও ছেলের সঙ্গে ফোনে আমি দশটা মিনিট কথা বললেই বাবু রেগে কাঁই। কারুর সঙ্গে যদি মিশি একটু, কিংবা কেউ যদি বাড়ি পৌঁছে দেয় তবে তো হয়েই গেল। তাদের সামনেই বাবু সিন ক্রিয়েট করবেন। জানো, এবার কী করেছে? আমার অফিসের বস্ আমায় গাড়ি করে নামিয়ে দিতে গিয়েছিল, আমি জাস্ট ভদ্রতা করে তাকে কফি খেতে ডেকেছি...ভদ্রলোককে মুখের ওপর অপমান করে দিল! সেদিনই আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম, আর নয়। দু সপ্তাহ টাইম

দিয়েছিলাম ক্ষমা চাওয়ার জন্য। কৌশিক ঘাড় তেড়া করে রইল, আমিও চলে এলাম।

—শুধু এইটুকু কারণে সম্পর্কে ইতি?

—শুধু এইটুকু বলছ! রুমি আহত চোখে তাকাল,—আমাকে অন্যায় সন্দেহ করবে, আর আমি নির্বিবাদে মেনে নেব?

স্বামী স্ত্রীকে একটু সন্দেহ করবে, স্ত্রী স্বামীকে, এ তো ভালবাসারই লক্ষণ। হারানোর ভয় থাকলেই না সন্দেহটা আসে। ভবানীপুরে বিজয়াদের পাশের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন রমেশ সেন, তৃতীয় বাচ্চাটির জন্ম দিতে গিয়ে বউ মারা গেল বেচারার, তারপর থেকে কেমন খ্যাপাখ্যাপা হয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক, খালি পায়ে ঘুরে বেড়াতেন সর্বত্র। এমনকী অফিসেও যেতেন জুতো চটি না পরে। পাড়ায় মানুষটার নামই হয়ে গেল খালিপদবাবু। তা সেই খালিপদবাবু হুটহাট চলে আসতেন বিজয়ার কাছে। ছলছল চোখে নিজের দুঃখের কাহিনি শোনাতেন, আর আঙুল চেটে চেটে খেতেন বিজয়ার হাতের শুক্তো, কাঁটাচচ্চড়ি, পোস্তর বড়া। দেখলেই দীপুর বাবা রেগে টং। কেন সবসময়ে লোকটা তোমার কাছেই এসে বসে থাকে? এত কী পীরিত তোমার সঙ্গে? একদিন তো খালিপদবাবুর সামনেই বলেছিলেন, পেয়ার মোহব্বত ঘুচিয়ে দেব! আলাভোলা খালিপদবাবু কথাটা ধরতে পারেননি, কিন্তু বিজয়ার তো লজ্জায় ঘেন্নায় মরে যাই মরে যাই দশা। দীপুর বাবার এক দেশতুতো ভাই, হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করত, ছুটির দিনে চলে আসত বিজয়াদের বাড়ি। গান গেয়ে, নাটকের ডায়ালগ বলে দারুণ আড্ডা জমাতে পারত সৌরেন। তাকে নিয়েও দীপুর বাবা কম খোঁটা দেননি। তা বলে স্বামীকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা কি কখনও মাথায় এসেছিল?

আরও অনেক গুণ ছিল দীপুর বাবার। ওই যাকে বলে পাক্কা এম-সি-পি। নিজে যা চাইবেন তাই হবে, মুখে মুখে তর্ক চলবে না। ফোঁস করলে চড়চাপড় পর্যন্ত চালিয়ে দিয়েছেন দু-চারবার। পরে হয়তো ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন, তবু মেরেছেন তো। আজকালকার মেয়ে হলে টানা বত্রিশ বছর ঘর করত ওই স্বামীর সঙ্গে?

অবশ্য সময় তো পাল্টেছে। ওই ধরনের তেজ দেখানো এখন চলবেই বা কেন? নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে মেয়েরা, তাদের মান অপমানবোধ তো বেশি

থাকবেই।

তবু বিজয়ার কোথায় যেন খচখচ করে। হয়তো বা সংস্কারের বশেই। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই যদি এত ঠুনকো হয়, তাহলে আর রইলটা কী?

রুমি ফের ফিরেছে কম্পিউটারে। টাইপ করছে না, দৃষ্টি পরদায় স্থির। আঙুল নড়ছে, মৃদু, মাউস ছুঁয়ে।

বিজয়া ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন,—শোন্ রুমি, ঝোঁকের বশে কিছু করিস না। মাথাটাকে ঠাণ্ডা রাখ, কটা দিন যেতে দে, দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।

—অনর্থক সময় নষ্ট করব কেন? রুমির স্বর নির্বিকার,—যে গাছ বাঁচবে না, তাতে মিছিমিছি জল ঢেলে কী লাভ!

—যদি গাছটাই তোর কাছে আসে? যদি জল চায়?

—নো চান্স ঠাম্মা। কৌশিক সে বান্দাই নয়। তাছাড়া আমরা দু'জনেই বুঝে গেছি আমাদের ওয়েভলেংথ ডিফারেন্ট, আমরা টোটাল মিসম্যাচ। এমন একটা রিলেশান আর বেশিদিন গড়াতে না দিয়ে তাড়াতাড়ি এন্ড করে দেওয়াই তো ভাল।

বলেই একটুক্ষণ বিজয়ার ভ্রূকুঞ্চন নিরীক্ষণ করল রুমি। তারপর হাসছে ফিকফিক। হাসতে হাসতেই উঠে এসে টিপে ধরেছে বিজয়ার গাল। আদুরে গলায় বলল,—ও রে বুড়ি, এসব তুই বুঝবি না। তুই শুধু বসে বসে মেগা দ্যাখ্, আর ফোঁচ ফোঁচ করে কাঁদ্। ঠিক আছে?

বিজয়া মাথা নাড়লেন দু'দিকে। না। ঠিক নেই। ঠিক নেই।

তিন

সত্যি সত্যিই রয়ে গেল রুমি।

দিব্যি আছে। সেজেগুজে বেরিয়ে যাচ্ছে অফিস, হাক্লান্ত হয়ে ফিরছে রাত্তিরে, তারপর খেয়েদেয়েই বিছানায় ঝপাং। অবসর মিললে টিভি দেখছে, গল্প করছে, কম্পিউটার খুলে ই-মেল্ পাঠাচ্ছে বন্ধুদের, কিংবা কাজ করছে নিজের মনে। ছুটির দিনে উঠছেও বেলা করে, আয়েস করছে সারাদিন। দেখে মনে হয় এ যেন সেই বিয়ের আগের রুমি। মাঝের একটা বছর যেন কোনও

মন্ত্রবলে উধাও করে দিয়েছে জীবন থেকে।

দীপু সোমার মুখ থমথমে ছিল কয়েকদিন। তারাও আবার সমে ফিরেছে। পুরোপুরি নয়, তবে অনেকটাই। উদ্বেগ আছে নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে, তবে তার প্রকাশ নেই তেমন। মেয়ে জামাইয়ের সম্পর্কের ভবিষ্যৎ যে ঝরঝরে, এ বুঝি ধরেই নিয়েছে তারা। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। হয়তো অপেক্ষায় আছে মেয়ে কী করে দেখার জন্য। কিংবা সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়েছে মুশকিল আসানের ভার।

একমাত্র বিজয়াই সুস্থিত হতে পারছিলেন না কিছুতেই। থেকে থেকে হু হু করে ওঠে বুক। স্বপনে জাগরণে কুরেকুরে খায় নাতনির চিন্তা। এত ঘটাপটা করে বিয়ে হল, দুম করে ভেঙে যাবে? কী হবে রুমির? একা একাই থাকবে? নাকি এ বিয়েটা ভেঙে গেলে আবার বিয়ে থা করে থিতু হবে সংসারে? ডিভোর্স আজকাল আকছারই ঘটছে বটে, কিন্তু বিয়েভাঙা মেয়েদের এখনও যে লোকে বেশ বাঁকা চোখে দেখে, এও তো বিজয়ার অজানা নয়। এই যে রুমি এখানে এসে আছে, তাই নিয়েও কি কানাঘুষো করছে না পাঁচজনে?

সাত-পাঁচ ভাবনা থেকে ছেলের কাছে একদিন পেড়েই ফেললেন প্রসঙ্গটা। নাতনির অনুপস্থিতিতে।

সরাসরিই বললেন,—কী রে, এমন গা-ছাড়া দিয়ে বসে রইলি কেন? নয় নয় করে দু'মাস তো হল, এবার রুমির ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা কর্।

অফিস থেকে ফিরে, সবে চান টান করে টিভি চালিয়েছিল দীপু। খবর শুনছিল। বিরস গলায় বলল,—কী ভাবব বলো?

—বেয়াই বেয়ানের সঙ্গে দেখা কর। কৌশিকের সঙ্গে কথা বল্। এবার তো একটা মিটমাট হয়ে যাওয়া উচিত।

—চেষ্টা হয়ে গেছে মা। লাভ হয়নি।

সোমা রান্নাঘরে চা করছিল। খর কান, শুনতে পেয়েছে কথা। রান্নাঘর থেকেই বলল,—মাকে বলে দাও কী বলেছেন কৌশিকের মা!

—কী বলেছে?

—ওঁরা নাকি কৌশিককে বোঝাতে গেছিলেন। কৌশিক পাত্তা দেয়নি। বলেছে, বিয়ে আমরাই করেছি, সেটা রাখব না ভাঙব আমাদেরই ডিসাইড

করতে দাও।

—ওমা! সে কী কথা? ওই ছেলেই না ক'মাস আগেও বউ বিহনে চোখে অন্ধকার দেখত!

—এটা এখন গতির যুগ মা। সব কিছুতেই স্পিড স্পিড। গড়তেও স্পিড, ভাঙতেও স্পিড। আজ বলবে আই লাভ ইউ, কাল বলবে আই হেট ইউ।

বিজয়ার গলা কেঁপে গেল,—আমাদের মেয়েটার তাহলে কী হবে?

হাত উল্টোল দীপু। আঙুল তুলে ওপরটা দেখিয়ে দিল। ঘুরন্ত ফ্যানটাকে দেখাল, না ভগবান, বোঝা গেল না।

সোমা চা এনে বসেছে সোফায়। ভার মুখে বলল,—আমাদের যে কৌশিকের বাবা মার সঙ্গে কথা হচ্ছে, এটা কিন্তু ভুলেও রুমিকে বলতে যাবেন না মা। কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে তাহলে।

বিজয়া অভিমানী গলায় বললেন, আমার বলার কী দরকার? আমি আর কতদিন আছি, যা ভাল বোঝো তোমরাই করো। লাফঝাঁপ করে বিয়ে হল, আবার সে বিয়ে বছর ঘুরতে না ঘুরতেও ছিঁড়েও গেল, এমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড আমি জন্মেও দেখিনি।

তা দেখার আরও কিছু বাকি ছিল বৈকি বিজয়ার।

দিন কয়েক পর সন্ধে দিচ্ছিলেন, দীপু সোমা তখনও ফেরেনি, হঠাৎই ফোন বেজে উঠেছে ঝনঝন।

টলমল পায়ে গিয়ে রিসিভার তুললেন বিজয়া,—হ্যালো?

—ঠাম্মা? আমি কৌশিক বলছি।

ছলাৎ করে উঠল রক্ত। বিজয়া প্রায় খামচে ধরলেন রিসিভারটাকে,—ওমা কী কাণ্ড, তুমি? কী খবর? কেমন আছ?

—চলে যাচ্ছে ঠাম্মা। আপনার শরীর কেমন?

—আমি আর ভাল থাকি কী করে! বিজয়া শিশুর মতো প্রগল্‌ভ সহসা। নিত্যদিন কানের কাছে বাজতে থাকা গানটাকে আউড়ে দিলেন,—তোমার

ও প্রান্ত নিশ্চুপ। শনশন হাওয়া বাজছে ফোনে। ঝড়ের মতো। নাকি বিজয়ার নিঃশ্বাসই ফেরত পাঠাচ্ছে দূরভাষ?

বিজয়া ব্যাকুল স্বরে বলে উঠলেন,—হ্যালো? হ্যালো? লাইন কেটে গেল নাকি?

—না না। কৌশিকের স্বর ফিরেছে,—রুমি কি বাড়ি আছে ঠাম্মা?

—না তো ভাই। সে তো এখন অফিসে। ওখানে ফোন করো, পেয়ে যাবে।

—করেছিলাম। লাইন পাচ্ছি না।

—তো মোবাইলে করছ না কেন?

—মোবাইলেই তো করতে বলেছিল আমায়। এখন দেখছি সুইচ অফ। তাই ভাবলাম আজ হয়তো বেরোয়নি...

রুমি কৌশিকে ফোনাফুনি হয় তা হলে? গোপনে গোপনে? বিজয়ার বুক আনন্দে চলকে উঠল। যাক বাবা, ছেলেমেয়ে দুটোর সুমতি তবে ফিরেছে!

বিগলিত স্বরে বিজয়া বললেন,—রুমি এলেই আমি তোমায় ফোন করতে বলব।

—ফোন না করলেও চলবে। জাস্ট বলে দেবেন আমি রিং করেছিলাম, তাহলেও ও বুঝে যাবে। আর হ্যাঁ, বলবেন কাল যেন সন্ধেবেলা অবশ্যই দেশপ্রিয় পার্কের উল্টো দিকে বাসস্টপে চলে আসে। ঠিক সাড়ে সাতটায়। আমি ওর জন্য ওয়েট করব।

টেলিফোন রেখে দেওয়ার পর সত্যি সত্যি নাচতে ইচ্ছে করছিল বিজয়ার। নাহ্, নাতনিটা তাঁর মহা বিচ্ছু, কেমন সবাইকে ঘোল খাইয়ে রেখেছে! দীপু সোমা ঢুকলেই শোনাতে হবে সুসংবাদটা। না থাক, ওদের এক্ষুনি বলাও দরকার নেই। ওরা কবে আগে কোন সংবাদটা দেয় বিজয়াকে? একবার অন্তত ওরা পিছিয়ে থাকুক।

দম চাপার মতো উত্তেজনাটাকে চেপে রাখলেন বিজয়া। রুমি ফেরা পর্যন্ত। পৌনে দশটা নাগাদ এল রুমি। ঘরে ঢুকে সালোয়ার কামিজ ছেড়ে নাইটিতে নিজেকে বদলেছে, দুলে দুলে বিজয়া হাজির।

মুখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বললেন,—খুব ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে

চোখের কোণ দিয়ে ঠাকুমাকে দেখল রুমি,—কেন?

—তুমি ধরা পড়ে গেছ। বাড়িতেই ফোন এসেছিল আজ।

—কার ফোন?

—আহা, জানো না যেন! ন্যাকা!...তোমার বরের।

—ও, হ্যাঁ। ওর তো যোগাযোগ করার কথা ছিল। রুমির মুখ ভাবলেশহীন,—কখন করেছিল?

—সন্ধের মুখে মুখে। চোখ টিপে বৃন্দাদূতির ঢঙে বললেন বিজয়া,—কাল তোকে দেখা করতে বলেছে। সাড়ে সাতটায়।

রুমির তাপ উত্তাপ নেই,—কোথায়? দেশপ্রিয় পার্কের বাসস্টপে?

—ওওও, সেখানে বুঝি মাঝেমাঝেই তোমাদের মিলন হয়? তা ঢং করে বাইরে বাইরে কেন? বাড়িতে ডাকলেই পারো। বরই তো, লজ্জা কিসের!

রুমির ঠোঁট বেঁকে গেল অল্প,—কেন দেখা করতে বলেছে জানো?

—আমার জানার সাধ নেই বাছা। তোমরা মিলেজুলে থাকো, তাহলেই আমি খুশি।

—তুমি যা ভাবছ তা নয় ঠাম্মা। রুমির ঠোঁট আর একটু বেঁকল,—কাল আমাদের উকিলের কাছে যাওয়ার কথা। মিউচুয়াল সেপারেশনের ড্রাফ্‌ট তৈরি হবে।

—মানে?

—আমরা মামলা টামলায় যাচ্ছি না। কৌশিকের চেনা ল-ইয়ার আছে, তাঁর মাধ্যমে দুজনে একসঙ্গে আইনমাফিক পিটিশান করে দেব, তারপর যা হওয়ার হয়ে যাবে। আপাতত জুডিশিয়াল সেপারেশান, ছ মাস পরে ডিভোর্স।

বিজয়ার মুখ হাঁ হয়ে গেছে,—জোড় বেঁধে বিয়ে ভাঙতে যাবি?

—হ্যাঁঅ্যা। আমরা দুজনেই ভেবে দেখলাম হাজব্যান্ড ওয়াইফ হয়ে যখন থাকা যাচ্ছে না, তখন ঝুটঝামেলায় না গিয়ে পিসফুলি দাঁড়ি টানাই ভাল। পোষাচ্ছে না, থাকব না একসঙ্গে, তা বলে আমরা তো কেউ কারুর শত্রু নই! মিছিমিছি কেস ফেসে গিয়ে দুজনে দুটো উকিলের পেছনে টাকাই বা ঢালব কেন! কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতেই বা কেন করতে যাব! তুমিই বলো, যুক্তিটা কি ভুল?

বিজয়া স্তম্ভিত। বিজয়ার মুখে বাক্যি সরছিল না।

চার

বিজয়ার ঘুম আসছিল না। রাতে আজকাল ঘুম এমনিই কমে গেছে, তার ওপর মাথায় কোনও চিন্তা সেঁধিয়ে গেলে তো কথাই নেই, সারা রাতই অনিদ্রা।

আজ গরমও পড়েছে খুব। এত গুমোট, যে পাখার হাওয়াও গায়ে লাগে না। বৈশাখ গড়িয়ে গেল, এখনও ভাল করে একটা কালবৈশাখী এল না। এক-আধ দিন মেঘ উঁকি দেয় বটে, মিলিয়েও যায় হুশ করে। তারপর আকাশ আবার খটখটে, নিষ্করুণ। বৃষ্টিহীন পৃথিবীতে তাপ চড়ছে ক্রমশ।

গা জ্বালা জ্বালা করছিল বিজয়ার। উঠে বসলেন। তেষ্টা পাচ্ছে। ঘরে সবজেটে রাতবাতি, মৃদু আলোয় সবই কেমন আবছা আবছা। বিজয়া হাতড়ে হাতড়ে মশারি সরালেন। নেমেছেন বিছানা থেকে। বেঁটে টুলে জল ঢাকা থাকে, খেলেন দু চুমুক। সন্তর্পণে বেরোচ্ছেন ঘর ছেড়ে। বুড়ো বয়সের এই এক ঝঞ্ঝাট, রাতে বাথরুম পায় ঘন ঘন।

তিন কামরার ফ্ল্যাটে একটাই লাগোয়া বাথরুম। দীপু সোমার ঘরের সঙ্গে। ছেলে ছেলের বউয়ের পাশের ঘরেই থাকেন বিজয়া, অন্য বাথরুমটায় যেতে বড়সড় ড্রয়িং-ডাইনিং স্পেসটা পার হতে হয়। সোফা টোফা সামলে সুমলে। পাছে হোঁচট খান।

পায়ে পায়ে এগোতে গিয়ে বিজয়া থমকালেন হঠাৎ। বসার জায়গায় ফ্যান ঘুরছে বনবন। কী আক্কেল বাড়ির লোকেদের, ইলেকট্রিক বিল দেখে তুলকালাম করবে, এদিকে এ ব্যাপারে হুঁশটি নেই! এই অপচয়ের কোনও মানে হয়!

দেওয়ালের ধারে গিয়ে বিজয়া সুইচটা অফ করলেন। আলো অন্ধকারে তখনই মনে হল কে একটা নড়ে উঠল সোফায়।

সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বালিয়েছেন।

ওমা, এ তো রুমি! অন্ধকারে কী করছে সোফায় বসে? এখানেই ঢুলছে নাকি?

আচমকা আলোর ঝলকানিতে রুমিও চমকে তাকিয়েছে। বিজয়া স্পষ্ট দেখতে পেলেন নাতনির দু চোখে টলটল করছে মুক্তোদানা।

—এ কী রে রুমি, তুই কাঁদছিস?

—কই, না তো। ঝটিতি চেটোর উল্টোপিঠে চোখ মুছে নিল রুমি। নাক টেনে বলল,—কী একটা যেন পড়েছে চোখে। খুব করকর করছে।

—যা, ঘরে গিয়ে শুড়ে পড়।

বাধ্য মেয়ের মতো উঠে পড়ল রুমি। ধীর পায়ে যাচ্ছে নিজের ঘরে।

নাতনিকে একদৃষ্টে দেখছিলেন বিজয়া। এ দেখাও তাঁর কপালে ছিল!

বুকটা চিনচিন করছিল বিজয়ার। আবার যেন কেটেও যাচ্ছিল ভেতরের ভ্যাপসা ভাবটা। হে ঈশ্বর, চোখ করকর করার জন্য ওই বালিটুকু যেন পৃথিবীতে থাকে চিরকাল।

রাঙাকাকা

মানুষের মনের তল পাওয়া সত্যিই বড় কঠিন। এক একজনকে দেখে মনে হয় খুব চিনি, এর জীবনের সবটাই তো মিলে যাচ্ছে বাঁধাধরা ছকের সঙ্গে। আবার সেই মানুষটাই যে কখনও কখনও কী ভীষণ অচেনা হয়ে যায়!

কথাটা ভীষণভাবে মনে হয় রাঙাকাকার কথা ভাবলে। আমাদের ছোটবেলাটা কেটেছিল একান্নবর্তী পরিবারে। ঠাকুরদা মারা গেছিলেন আমার জন্মের আগে, ঠাকুমা আর বাবা জেঠা মিলিয়ে বেশ বড়সড় সংসার ছিল আমাদের। রাঙাকাকা ছিল ভাইদের মধ্যে সব চেয়ে ছোট। লাস্ট বাট নট দা লিস্ট। আমাদের সাদামাটা পরিবারের সবচেয়ে বর্ণময় চরিত্র।

চেহারাটা ভারি চটকদার ছিল রাঙাকাকার। টকটকে রং, তীক্ষ্ণ নাক, উজ্জ্বল চোখ, অল্প অল্প কোঁকড়া চুল, হাঁটাচলায় বেশ একটা ফিল্মস্টার ফিল্মস্টার ভাব। যাকে বলে পারফেক্ট রমণীরঞ্জন।

লালটুমার্কা চেহারাটাকে রাঙাকাকা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহারও করেছে এক সময়ে। পাজামা-পাঞ্জাবি চড়িয়ে কার্তিক ঠাকুরটি সেজে দেশপ্রিয় পার্কের

কোনায় কাঁঠালিচাঁপা গাছের ডাল ধরে কায়দা মেরে সিগারেট ফুঁকছে রাঙাকাকা, আর সামনে দাঁড়ানো গদগদ প্রণয়িনীটি বদলে যাচ্ছে ঘন ঘন, এ তো আমাদের স্বচক্ষে দেখা। একমাত্র পাশের পাড়ার তানিয়াদির সঙ্গেই প্রেমপর্বটা যা-একটু লম্বা হয়েছিল। সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ের বুলেভার্ড ধরে তন্ময় হয়ে হাঁটছে রাঙাকাকা আর তানিয়াদি, এ দৃশ্য তো এখনও চোখে ভাসে।

ভাসে আরও অনেক ছবি। রাঙাকাকা ঘরে আসর বসিয়েছে গল্পের। উদ্ভটরসের কাহিনি। ব্রহ্মা আর শিব জুডো লড়ছে, বিষ্ণু রেফারি। কাতুকুতু দিয়ে ব্রহ্মাকে চিত করে ফেলল শিব, মরিয়া ব্রহ্মা শিবের বাঘছাল নিয়ে টানাটানি করছে, বিষ্ণু হুইস্‌ল বাজিয়ে উঠল, ফাউল ফাউল...! বানরবাহিনীর সঙ্গে রাক্ষসদের ফ্রেন্ডলি ফুটবল ম্যাচ। এক দিকে সুগ্রীব ক্যাপ্টেন, অন্য দিকে রাবণ। বক্সের বাইরে ফ্রি কিক পেয়েছে রাক্ষসরা, বল বসিয়ে সবে শট নিতে যাচ্ছে কুম্ভকর্ণ, অঙ্গদ এসে টুক করে লেজ দিয়ে বলটাকে সরিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গদকে টেনে চড় কষিয়েছে মেঘনাদ...! শিকারায় চেপে কাস্পিয়ান সাগরে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে শার্লক হোম্‌স আর ঘনাদা, ফুস করে একটা মৃতদেহ ভেসে উঠল জলে। মড়ার গোঁফ দেখেই ঘনাদা শনাক্ত করে ফেলল খুনিকে। ডিটেকশানের কেরামতিতে শার্লক হোম্‌সের চক্ষু চড়কগাছ! যেমনই বিটকেল কাহিনি, তেমনই সরস বর্ণনা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি আমরা ভাইবোনরা, কুটিপাটি হচ্ছি হেসে হেসে। জাঠতুতো খুড়তুতো মিলিয়ে তখন আমরা ছ'জন। আড়াই বছরের খুড়তুতো বোন পিকু ছাড়া সকলেই মোটামুটি পিঠোপিঠি। তুচ্ছ কারণে কাজিয়া বাধত আমাদের, মারপিটও লাগত খুব। দাদার সঙ্গে দিদির, আমার সঙ্গে ছোড়দির, কিংবা হাবুলের। কোথায় রাঙাকাকা আমাদের থামাবে তা নয়, উল্টে চটি বাজিয়ে তাতাতো। লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্! নারদ নারদ নারদ নারদ! জিতলে চুয়িংগাম, হারলে লেমোনেড, লড়ে যা বাছারা! ব্যস্, কে আর তখন জিততে চায়? মারামারি খতম।

আরও আছে। অফিস থেকে একটু রাত করে ফিরেছে রাঙাকাকা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুপিচুপি ডাকছে আমাদের। ইয়া বড় একটা হাঁ করে বলল,—দ্যাখ্ তো, মুখে কোনও গন্ধ পাস কিনা। উঁহু, সিগারেটের নয়, অন্য কিছুর। মিষ্টি মিষ্টি। রাঙাকাকার মুখের খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নাক

টানলাম জোরে জোরে। নাহ্, তামাক বা অ্যালকোহল নয়, ঝাপটা মারছে এলাচের সুঘ্রাণ। শৌখিন মদ্যপান লুকনোর জন্য বড্ড বেশি এলাচ খেত রাঙাকাকা, পাছে নীতিবাগীশ দাদাদের কাছে ধরা পড়ে যায়।

দিব্যি রসেবশেই ছিল রাঙাকাকা। আমরাও ধরে নিয়েছিলাম রাঙাকাকা এরকমই থাকবে। ছুটির দিনে খেয়াল চাপলে আমাদের নিয়ে যাবে ফারপো ফ্লুরিজে, দেদার কেক প্যাটিজ খাওয়াবে, গুলগাপ্পি ঝাড়বে এন্তার। এবং শেষে একদিন প্রেমক্লান্ত হয়ে টুপ করে বসে পড়বে বিয়ের পিঁড়িতে।

হিসেবটা মিলল না। তল্পিতল্পা গুছিয়ে রাঙাকাকা একদিন এ দেশ থেকেই ফুড়ুত। সোজা জার্মানি।

দিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন প্রথম রাঙাকাকা এসে যাত্রার কথা ঘোষণা করল। আমি তখন ক্লাস সিক্সে। অফিস থেকে ফিরে সগর্বে জানাল কোম্পানি তাকে দু'বছরের জন্য ফ্র্যাংকফুর্টে পাঠাচ্ছে। পাসপোর্ট ভিসা রেডি হলেই দেশ ছাড়বে রাঙাকাকা।

শুনে বাড়িতে সে কী হইচই। দিল্লি নয়, বোম্বে নয়, সোজা ইউরোপ?

সঙ্গে সঙ্গে মিটিং বসে গেল ভেতরবারান্দায়। বাবা জেঠামশাই কাকামণি তো আছেই, ঠাকুমা সহ গোটা মহিলামহল মজুত। গোল গোল চোখে আমরাও।

জেঠামশায়ের তখনও যেন প্রতীতি জন্মায়নি। সন্দিগ্ধ স্বরে বলল,—তোকে হঠাৎ পাঠাচ্ছে কেন রে গদাই? তোর কী এমন ডিগ্রি আছে? তুই তো অর্ডিনারি সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট।

রাঙাকাকা কাঁধ ঝাঁকাল—ডিগ্রিই কি সব বড়দা? জীবনে রাইজ করতে গেলে আরও কিছু ক্যালিবার লাগে। ঠিক জায়গায় ঠিক লোককে ধরতে হয়। তক্কে তক্কে থাকতে হয়।

কাকামণি বলল,—তার মানে তুই আগে থেকেই ধরাকরা চালাচ্ছিস? কোনওদিন বলিসনি তো?

—ভেবেছিলাম সারপ্রাইজ দেব। বংশে কেউ কখনও বিদেশ যায়নি, ফার্স্ট ম্যান হয়ে চমকে দেব সবাইকে। চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেব গদাই মুখার্জি ফপিশ নয়, তারও এলেম আছে।

বাবা জিজ্ঞেস করল,—ফেরার পর তো প্রোমোশান হবে?

—সে আর বলতে। অন্তত তিন ধাপ। কোম্পানি কি এমনি এমনি গাঁটের কড়ি খরচা করে পাঠাচ্ছে?

—তা বটে, তা বটে।

তিন দাদাই মোটামুটি খুশি। দিব্যি একটা সমীহর বাতাবরণ তৈরি হয়েছে রাঙাকাকাকে ঘিরে। রাঙাকাকার গা দিয়ে যেন জ্যোতি বেরোচ্ছে। মা কাকিমা টুকুস-টুকুস মশকরা জুড়ছে, ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে উপভোগ করছে ছোট দেওর।

আচমকা রসভঙ্গ। ঠাকুমা ভারিক্কি স্বরে বলে উঠল,—যাচ্ছ যাও, বাধা দেব না। তবে যাওয়ার আগে বিয়েটি সেরে যেতে হবে।

রাঙাকাকা আকাশ থেকে পড়ল,—বিয়ে? এখন?

—অবশ্যই। তোমার ভাবগতিক তো চিনি। সেখান থেকে মেম বগলে করে ফিরবে...

—খেপেছ মা? গদাধর মুখার্জি বিয়ে করবে মেম? বেটিরা হেগে ছোঁচায় না।

—তবু বলব, গাঁটছড়া বেঁধে যা। কাঁচাখেকো মেয়েদের দেশ, একা পুরুষমানুষ পেলে ভেড়া বানিয়ে রাখবে।

—বিয়ে করলেও বউ নিয়ে যাওয়া যাবে না মা। ও দেশের আইন খুব কড়া। জোড়ে যাওয়ার ভিসা মিলবে না।

—ওসব ভিসা মিসা আমি বুঝি না। বিয়ে না করে এখান থেকে এক পা'ও নড়তে পারবে না।

—এ তো মহা গেরো! রাঙাকাকা দুম করে খেপে গেল,—নিকুচি করেছে জার্মানির। কালই গিয়ে ক্যানসেল করে দিচ্ছি।

—খবরদার। ও ভুল করিস না গদাই। বাবা জেঠা কোরাসে বেজে উঠল। একযোগে আক্রমণ করল ঠাকুমাকে,—তোমার আবার সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি। অত বাঁধাবাঁধির কী আছে? গদাই তো যাচ্ছে মাত্র দুটো বছরের জন্য।

—দেখতে দেখতে চব্বিশটা মাস কেটে যাবে। মা জেঠিমাও দেওরের দলে,—তদ্দিনে আমরা মেয়েটেয়ে দেখি, ফেরা মাত্র টোপর পরিয়ে দেব।

আরও খানিক দড়ি টানাটানির পর অবশেষে মত দিল ঠাকুমা। হপ্তা

তিনেক পর এক বৈশাখের ভোরে দমদম থেকে জার্মানি উড়ে গেল রাঙাকাকা।

প্রথম প্রথম আমাদের কী মন খারাপ। চোদ্দো জন সদস্য থেকে একজন মাত্র সরে গেছে, তাতেই কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে বাড়িটা। ঠাকুমা তো চান্স পেলেই ফোঁচফোঁচ কেঁদে নিচ্ছে। পিকু পর্যন্ত মিস করছে রাঙাকাকাকে। আকাশে কোনও উড়োজাহাজ দেখলেই সুর করে গেয়ে উঠছে,—এরোপ্লেন এরোপ্লেন, রাঙাকাকাকে দিয়ে যা। এরোপ্লেন এরোপ্লেন, জুজুবুড়িকে নিয়ে যা।

রাঙাকাকারও প্রায় একই হাল। পৌঁছে প্রথম যে চিঠিটা দিল তার ছত্রে ছত্রে শুধুই বিলাপ। বিদেশবিভুঁই-এ এক মুহূর্ত মন টিকছে না, অহরহ মনে পড়ছে বাড়ির কথা, কীভাবে যে ওখানে দু'-দু'টো বছর কাটাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বিতীয় চিঠিতে ওখানে যে ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে থাকছে তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা। ছিমছাম দু'কামরার ফ্ল্যাটে কী আছে আর কী নেই। ফ্রিজ, গিজার, বাথটব, ফায়ার প্লেস, কুকিং গ্যাস, কাপড় কাচার যন্ত্র, এমনকী একটা টিভিও। কাজ থেকে ফিরে ওই টিভির কল্যাণেই যা সময় কাটছে রাঙাকাকার। তবে সুখ নেই। এক মাদ্রাজি সহকর্মী থাকে সঙ্গে, রান্নাবান্না সেই করে। সকাল-সন্ধে ইডলি ধোসা সম্বর খেতে খেতে গদাই মুখার্জির জিভ হেজে গেল। কবে যে আবার দেশে ফিরে ঠাকুমার হাতের মোচার ঘণ্ট খেতে পারবে! তৃতীয় চিঠিতে একটু একটু উঁকি দিল ফ্র্যাংকফুর্ট শহর। ইয়া চওড়া চওড়া রাস্তাঘাট, কোথাও এতটুকু ধুলোময়লা নেই, অফিসপাড়া গগনচুম্বী ইমারতে ঠাসা। পার্ক বাগান ফোয়ারা আছে অজস্র। সন্ধের পর ফ্র্যাংকফুর্ট যখন আলোয় ঝলমল করে, সে নাকি এক অপরূপ দৃশ্য। তবে হ্যাঁ, ঠাটঠমকটুকুই আছে, প্রাণ নেই। নো আড্ডা, নো হইচই, নো অলস সময় যাপন। জার্মানরা একটা ব্যাপারই বোঝে শুধু। কাজ কাজ কাজ। এমন কাজপাগল কাঠখোট্টা দেশে দু'-চার দিনই ভাল, দু'বছরে দম বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে রাঙাকাকার।

মোটামুটি থিতু হওয়ার পর চিঠি আসা কমে এল। সপ্তাহে একটা থেকে পনেরো দিনে একটা, তারপর মাসে একটা। চিঠির ভাষাও বদলে যাচ্ছিল ক্রমশ। ফেরার জন্য আকুলি-বিকুলি আর নেই প্রায়, বরং শুধুই ওদেশের প্রশস্তি। জার্মান গাছপালা কত মনোরম, ইউরোপের আকাশ কত বেশি নীল, ফ্র্যাংকফুর্টের বাতাসে কত বেশি অক্সিজেন...। এয়ারমেল ছাড়াও পিকচার

পোস্টকার্ড আসছে কিছু কিছু। বয়ে আনছে জার্মানির ছবি। মিউনিখ। স্টুটগার্ট। বন্। ব্রেমেন। বার্লিন। স্রোতস্বিনী রাইন। উচ্ছল দানিয়ুব। গম্ভীর আল্পস্। ঘন সবুজ ব্যাভেরিয়ান উপত্যকা। দিগন্ত ছোঁয়া ফুলের বাগান। বরফে ঢাকা পাইনের জঙ্গল। এ ছাড়া ফ্র্যাংকফুর্ট তো আছেই। আস্ত শহরটাকেই লেন্সবন্দি করে রাঙাকাকা পাঠিয়ে দিচ্ছে কলকাতায়। মেপল্ বার্চ উইলোর বাহারে আমরা বিমোহিত।

দু'বছর নয়, কুড়ি মাসের মাথায় হঠাৎই দেশের মাটিতে পা রাখল রাঙাকাকা। কী ব্যাপার, না এক্সমাসে দিন দশেক ছুটি মিলেছে তাই ক'দিন ঘুরতে এল। এও সারপ্রাইজ। এসেই টানা ঘুম লাগাল ঘণ্টাছয়েক। জেটল্যাগ তাড়াচ্ছে।

উঠেই শুরু করল হাঁকডাক,—কই বউদিরা, গেলে কোথায়? জলদি এসো। বাবুল হাবুল টুকু সুকু খুকু তোরাও আয়। ঝটপট, ঝটপট।

নিমেষে রাঙাকাকার ঘর ভিড়ে ভিড়। কৌতূহলে ফুটছে সবাই। পেল্লাই বিদেশি স্যুটকেস খুলে একের পর এক উপহার বার করছে রাঙাকাকা, ম্যাজিশিয়ানের মতো। প্রথম বেরোল তিন শিশি পারফিউম। কাকিমার হাতে দিয়ে বলল,—নাও, তোমরা তিন জায়ে ভাগাভাগি করে নাও। যার যেটা পছন্দ।

কাকিমা ছিপি খুলে শুঁকল একটা শিশি,—আহ, কী সুবাস! কী ফুলের গন্ধ গো?

—হবে লাইলাক-ফাইলাক। রাঙাকাকা বিলিতি কায়দার শ্রাগ করল,—এসব জিনিস এ দেশে পাবে না। যাও বা জুটবে, দু'নম্বরি। বলতে বলতে ডজন খানেক গায়ে মাখার সাবান বার করেছে,—স্মেলটা নাও। একদিন মাখলে তিনদিন বডি ফ্রেশ থাকবে। এ দেশের ঘেমো গন্ধ বাপ বাপ বলে পালাবে।

মা হেসে বলল,—ঘামের গন্ধর আবার এদেশ ওদেশ আছে নাকি?

—ও দেশে ঘামই হয় না। কী ওয়ান্ডারফুল ওয়েদার! এখানকার পচা প্যাচপেচে গরম ওখানে কোথায়?

মুখ চলছে রাঙাকাকার, আর জিনিস বেরোচ্ছে টপাটপ। মনে করে করে প্রত্যেকের জন্যই কিছু না-কিছু এনেছে। দিদি ছোড়দি আর আমার জন্য রিস্টওয়াচ। দাদা আর হাবুলের জন্য পেলিকান পেন, রংদার টিশার্ট। শেভিং

ক্রিম, আফটার শেভ, সেফ্‌টিরেজার, ওডিকোলন, পাখিডাকা দেওয়াল ঘড়ি, তুলোর মতো হালকা ইস্ত্রি, কীই না আবির্ভূত হল স্যুটকেস থেকে। যার যা খুশি বেছে নাও।

রাঙাকাকার পাশে বসে জুলজুল চোখে দেখছিল ঠাকুমা। অধৈর্য হয়ে বলে উঠল,—ও গদাই, আমার জন্য কিছু আনিসনি?

—তিষ্ঠ মাতাশ্রী। তোমারও আছে। স্পেশাল।

—কী রে? কী আছে রে?

—খাঁটি সুইস উলের কার্ডিগান, ইটালিয়ান সিল্কের স্কার্ফ, আর জার্মান মোজা।

লম্বা ঝুলের কলারঅলা কার্ডিগানখানা দেখে ঠাকুমা তো হেসে বাঁচে না,—বুড়ো বয়সে আমি এই সোয়েটার পরব?

—কেন? ও দেশের বুড়িরা তো দিব্যি পরে।

—ওরা আর আমরা? ওরা হল গিয়ে মেমসাহেব।

—তুমিও মেমসাহেব বনে যাও। দেখবে, শীতে আর জবথবু হয়ে থাকতে হবে না।

—আহা, আমাদের এখানে যেন কত ঠাণ্ডা পড়ে!

—তা ঠিক। এই ডিসেম্বরেও তো আমার বেশ গরমই লাগছে।

দাদা আগ্রহ ভরে জিজ্ঞেস করল,—জার্মানিতে এখন টেম্পারেচার কত রাঙাকাকা?

—বরফ পড়ছে রে, বরফ। যেদিকে তাকাও শুধু সাদা আর সাদা। রাঙাকাকাকে কেমন উদাস দেখাল,—পূর্ণিমার রাতে ওদেশের স্নো-ফল যদি দেখতিস! জীবন ধন্য হয়ে যেত।

মুহূর্তের জন্য রাঙাকাকাকে কেমন অচেনা ঠেকল। কেন যে ঠেকল?

তা যাই হোক, সেবার বেশ হইহই করেই কাটল কটা দিন। মা জেঠিমা নিত্যনতুন রান্না করে খাওয়াচ্ছে দেওরকে, ঠাকুমাও হাঁটু কোমরের ব্যথা ভুলে ছোটছেলের জন্য বানাচ্ছে ফুলকপির সিঙাড়া, কড়াইশুঁটির কচুরি, নতুন গুড়ের পায়েস। রাঙাকাকার অনারে ক্রিসমাসের দিন প্রকাণ্ড কেক এল বাড়িতে, নিউ ইয়ারস্ ডে-তে বোম্বেটে সাইজের জয়নগরের মোয়া।

এর মধ্যেই জেঠামশাই একদিন ধরল রাঙাকাকাকে,—হ্যাঁ রে গদাই,

তোর ট্রেনিং শেষ হতে তো আর মাত্র তিন চারটে মাস, তারপর চলে আসছিস তো?

—না বড়দা, এক্ষুনি বোধহয় ফেরা হবে না। কোম্পানি শুনছি আরও এক বছর ট্রেনিং এক্সটেন্ড করবে।

কাকামণি হাসতে হাসতে বলল,—এ খবরটাও দিসনি যে বড়? এটাও কি সারপ্রাইজ?

উত্তর নেই। আবার সেই বিলিতি শ্রাগ।

—আর কত সারপ্রাইজ আছে রে তোর ঝুলিতে?

এবারও রাঙাকাকা নিরুত্তর। বিচিত্র এক হাসি ফুটিয়েছে ঠোঁটে। ভাবটা এমন, দেখতেই পাবে।

সত্যিই দেখাল বটে। মোক্ষম খেল। দশ দিন পর সেই যে উড়ে গিয়ে একটা শুধু পৌঁছসংবাদ, তারপর একেবারে নিশ্চুপ। এক মাস গেল, দু মাস গেল, নো চিঠিপত্র, নো ভিউকার্ড, নাথিং। বেশ চিন্তিতই হয়ে পড়ল সবাই। অসুখবিসুখে পড়ল না তো? বিপদআপদ?

তখনও আমরা জানি না কী সাইজের বিস্ময় অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। কাকামণিকে পাঠানো হল রাঙাকাকাদের কলকাতার অফিসে। আজব এক সংবাদ আনল কাকামণি। গত নভেম্বরেই নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়েছে গদাধর মুখার্জি, কোম্পানির সঙ্গে তার আর কোনও সম্পর্ক নেই। উপরন্তু বিদেশে পাঠানোর শর্ত লঙ্ঘন করার জন্য শিগগিরই তাকে কড়া চিঠি পাঠাচ্ছে অফিস, ক্ষতিপূরণ চেয়ে।

শুনে তো সকলের আক্কেল গুড়ুম। গদাইটার পেটে পেটে এত প্যাঁচ ছিল? মিথ্যে বলে গেল বেমালুম? কিন্তু কেন? ভয় ছিল সত্যি বললে মা দাদারা আটকে দেবে? তাহলে আদৌ এল কেন? ফিরে গিয়ে চুপ মেরে যাওয়ারই বা কী অর্থ?

কড়া একটা চিঠি গেল এখান থেকে। পুরনো কোম্পানি থেকে নতুন অফিসের ঠিকানা নিয়ে এসেছিল কাকামণি, ভেবেচিন্তে সেখানেই পাঠানো হল চিঠি।

এবার জবাব একটা এল বটে। কপটাচারের কোনও কৈফিয়তই নেই, যা আছে তা রীতিমতো রোমহর্ষক। ঠাকুমার আশঙ্কা সত্যি প্রমাণ করে মেম বিয়ে

করছে রাঙাকাকা। পাত্রীর নাম ফ্রিডা স্টেইন। খাঁটি নর্ডিক ব্লাড। থাকে ফ্র্যাংকফুর্টেই। পেশায় স্কুল টিচার। গত সেপ্টেম্বরে জার্মান মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে রাঙাকাকার, ক'মাস মেলামেশা করে রাঙাকাকা বুঝতে পেরেছে ফ্রিডা বিনা তার জীবন বৃথা। কলকাতায় এসে খবরটা জানায়নি, কারণ তখনও নাকি দ্বিধায় ছিল। জার্মানি ফিরেও নাকি ভুগছিল দোলাচলে, এবার সিদ্ধান্ত পাকা। যাই হোক, বাড়ির লোকরা যেন বংশের এই বেপথু ছেলেটাকে নিজগুণে ক্ষমা করে নেয়। যদি তারা চায় তো সম্পর্ক থাকবে, নইলে এখানেই ইতি।

কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে এমন চিঠির? ঠাকুমা শয্যা নিল। বাবা জেঠাদের মুখ থমথমে, দাঁত কিড়মিড় করছে, হাতের সামনে পেলে ভাইকে বুঝি তক্ষুনি ছিঁড়ে খায়। মা জেঠিমাদের মুখেও ছি-ছি। আমরা তত শোকার্ত নই বটে, তবে মর্মাহত। আলোচনার তুফান ওঠে আমাদের মধ্যে। কী লোক রে বাবা, দশ দশটা দিন রইল কলকাতায়, কত গল্প আড্ডা হল, একটি বারের জন্যও প্রেমসমাচার ফাঁস করল না! আসল কারণটা বুঝছিস তো, তখনই বিয়ের ডিসিশান নিয়ে ফেলেছে, এখানে এসে শেষবারের মতো একবার দেখা করে গেল!

বলাই বাহুল্য, এদিক থেকে কোনও উত্তর গেল না।

মাস দেড়েকের মাথায় ফের জার্মান এয়ারমেল। বিয়ে কমপ্লিট, বউয়ের ছবি পাঠিয়েছে রাঙাকাকা। মরি মরি, কী বউয়ের ছিরি! বিলকুল এক মেয়ে দৈত্য, মাথায় রাঙাকাকার চেয়ে না হোক ইঞ্চি তিনেক লম্বা, গোবদা গোবদা হাত পা, চোয়াড়ে মুখ, নাকখানি যেন হুবহু ধনেশ পাখির ঠোঁট, এত মিষ্টি মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে শেষে কিনা একটা ঘোড়ামুখো-ললনাকে পছন্দ হল? যতবার ছবিখানা দেখে ঠাকুমা, হাউমাউ করে কাঁদে।

এবারও এপক্ষ থেকে কোনও সাড়াশব্দ করা হল না। মাস দু-তিন ওপক্ষও চুপচাপ। কালীপুজোর পর আবার হঠাৎ এয়ারমেল। ফ্রিডার নাকি ভারতবর্ষের ব্যাপারে বেজায় আগ্রহ, তাকে নিয়ে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কলকাতা আসছে রাঙাকাকা, তখন একবার মাকে বউ দেখাতে চায়। যদি অবশ্য বাড়ির লোকদের আপত্তি না থাকে। হোটেলেই উঠবে রাঙাকাকা, মা দাদাদের সে কোনওভাবেই বিব্রত করতে চায় না।

ফের মিটিং বসে গেল ভেতরবারান্দায়।

জেঠামশাই বলল,—কী করবে এবার ঠিক করো। ঢুকতে দেবে, কি দেবে না?

বাবা বলল,—মা ডিসাইড করুক। মা যা বলবে তাই হবে।

ঠাকুমা ফোঁচফোঁচ নাক টেনে বলল,—বড় মুখ করে বউ দেখাতে চাইছে, মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে? ওই পালোয়ান বউয়ের কাছে ছেলেটার তাহলে মান থাকবে?

—কিন্তু গদাই যে কাজটা ঠিক করেনি, এটা তো অন্তত সমঝে দেওয়া উচিত।

—সে কি আর সে বুঝছে না? নইলে কি এভাবে লেখে?

কাকামণি বলল,—তাহলে আর কি, আসতে লিখে দাও। আমরাও একটু মেমবউ দেখি।

কাকিমা মুচকি হেসে বলল,—মেমবউ নয়গো, মেমবউমা। তোমার ভাদ্দরবউ।

জেঠিমাও মিটিমিটি হাসছে,—আমারও কিন্তু মেম জা দেখতে ইচ্ছে করছে।

মা বলল,—তাহলে আর হোটেল কেন, আমাদের এখানেই উঠুক।

—খেপেছ? আমাদের পায়খানায় কমোড কোথায়? কমোড ছাড়া মেমসাহেবের চলবে?

—তার ওপর চৌবাচ্চায় চান!

—খাওয়াও তো সেই মাটিতে বসে। মেমসাহেবের পোষাবেই না।

ঠাকুমা বলল,—না না বাপু, হোটেলেই উঠুক। সাহেব মেমসাহেব একটু দূরে দূরে থাকাই ভাল।

ব্যস্, শীর্ষ বৈঠকের অ্যাজেন্ডা বদলে গেল। আলোচনা চলছে মেমসাহেবের সুবিধে অসুবিধে নিয়ে। আপ্যায়ন নিয়ে। মেমসাহেবের আড়ালে চাপা পড়ে গেল ঘরোয়া মান-অভিমান।

ডিসেম্বরের শুরু থেকে বাড়িতে সাজো সাজো রব। পুরনো বাড়িটাকে ঘষেমেজে ঝকঝকে করা হচ্ছে। বাথরুমে শ্যাওলা সাফ করা হল, রান্নাঘরের তেলকালি উঠল, কীটনাশক স্প্রে করে করে তাড়ানো হচ্ছে আরশোলা, বন্ধ

করা হল ইঁদুর ছুঁচো ঢোকার ফাঁকফোকর। শাওয়ার বসল বাথরুমে, নতুন পরদা ঝুলল, বদলানো হল সোফাকভার, ঝলমল করে উঠল সাবেকি বৈঠকখানা। এমনকী একটা বড়সড় ডাইনিং টেবিলও ঢুকে গেল বাড়িতে।

আমরা, ভাইবোনরাও, প্রস্তুত হচ্ছি জোরকদমে। দাদার তখন কলেজের ফাইনাল ইয়ার, দাদার কাছে পাঠ নিচ্ছি সাহেবি এটিকেটের। কোন হাতে কাঁটা ধরতে হয়, কোন হাতে ছুরি, খাওয়া শেষ হলে কীভাবে রাখতে হয় কাঁটাচামচ, পাঁপড় কী করে নিঃশব্দে খাব, মুখে খাবার তোলার সময়ে ঠোঁট কতটা ফাঁক হওয়া উচিত...। নিজেদের মধ্যে কথাও বলছি ইংরিজিতে। জার্মান তো এত তাড়াতাড়ি শেখা যাবে না, অন্তত ইংরিজি বলতে গিয়ে যেন হোঁচট না খাই। মেমকাকিমার দর্শন পাওয়ার জন্য আমাদের সে কী উত্তেজনা।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। মধ্য কলকাতার এক হোটেলে উঠেছিল রাঙাকাকা, বউ নিয়ে বাড়িতে এল সন্ধেবেলা। দৃশ্যটা আজও ভুলিনি। ট্যাক্সি থেকে বউয়ের হাত ধরে নেমে এল স্যুটেডবুটেড রাঙাকাকা, মুখে একটা আলগা গাম্ভীর্য। মেমসাহেবের অবশ্য ঢুকেই একগাল হাসি।

আমরা সার বেঁধে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। আড়ষ্ট হয়ে। মেমকাকিমা রাষ্ট্রীয় অতিথির মতো ঝুঁকে ঝুঁকে করমর্দন শুরু করল। পাশে পাশে হাঁটতে থাকা রাষ্ট্রনায়ক রাঙাকাকা একে একে পরিচয় দিচ্ছিল সকলের। হাবুলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতেই হাবুল স্মার্টলি বলে উঠল,—গুটেন মরগেন। এই একটা জার্মান কথা কোত্থেকে যেন শিখেছিল সে। শুনে মেমসাহেবের সে কী হা হা হাসি। হাসল রাঙাকাকাও, —সন্ধেবেলা গুডমর্নিং বলছিস কি? বল্ গুটেন আভেন।

হাসাহাসিতে পরিবেশ অনেকটাই সহজ হয়ে গেল। এবার ঠাকুমার সঙ্গে আলাপের পালা। শাশুড়ি শুনে বউ আরও বেশি ঝুঁকে পড়েছে,—গ্ল্যাড টু মিট ইউ। গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠাকুমা। চোখ গোল গোল করে বলল,—ওমা, এসব কী বলে রে?

—বলছে তোমায় দেখে খুশি হয়েছে।

—তাই বুঝি? বলে দে আমিও খুশি হয়েছি। বেশ হয়েছে আমার লাল টুকটুকে ছোটবউমা। শুধু গড়নপেটনটা যদি একটু মানুষমানুষ হত।

উত্তরের শেষ অংশটুকু অবশ্য তর্জমা করল না রাঙাকাকা। বলল,—চেহারা দেখে ঘাবড়ে যেও না মা। ওর মনটা কিন্তু খুব নরম। বকাঝকা দিলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে।

সত্যি, ফ্রিডাকাকিমার মধ্যে বেশ একটা সারল্য ছিল। মিথ্যেই সিঁটিয়েছিলাম আমরা। মোটেই তেমন কেতাকানুনের ধার ধারত না ফ্রিডা, যখন তখন জোরে জোরে হাসত, মশলাদার খানা খেয়ে চকামচকাম আওয়াজ করত জিভে। দিদি আর কাকিমা মেমসাহেবকে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছিল। মেমসাহেব কী খুশি! ময়ূরীর মতো, থুড়ি, উটপাখির মতো আঁচল হাতে ছড়িয়ে নেচে বেড়াল বাড়িময়। আঁচলের মর্ম বোঝে না বলে মাঝে মাঝেই খসে পড়া আঁচল কষে পেঁচিয়ে নিচ্ছে কোমরে, ওই অবস্থাতেই ভাসুরদের গিয়ে হাই হুই করছে, কাকামণি হাসছে ঠোঁট চেপে, জ্যাঠামশাই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, বাবা মাথা নামিয়ে চোখ রাখছে বইয়ের পাতায়—সেও এক দৃশ্য। টিপ সিঁদুরে সেজে অবশ্য বেশ দেখাচ্ছিল ফ্রিডাকাকিমাকে। ভাল ইংরিজি জানত না ফ্রিডাকাকিমা, মা জেঠিমারা তো আরও কম, খানিকক্ষণ কথা বলতে গেলেই মাতৃভাষা চালু করে দিত দু পক্ষই, বাংলা আর জার্মানে হাসিমশকরাও চলত দিব্যি। কী করে যে চলত! লুচি বেলার চেষ্টা চালাচ্ছে মেমসাহেব, আরে তোর হচ্ছে না রে বলে বেলুনচাকি কেড়ে নিল জেঠিমা, হেসে লুটিয়ে পড়ল মেমসাহেব, এও তো এক ছবি। ঠাকুমার পাশটিতে লক্ষ্মী বউ সেজে বসে আছে ফ্রিডাকাকিমা, ঠাকুমা তাকে বংশের ইতিহাস শোনাচ্ছে, একটি বর্ণও বোধগম্য হচ্ছে না মেমবউমার, তবু ঘটঘট মাথা দোলাচ্ছে, এও এক ছবি।

মোদ্দা কথা, মেমকাকিকে আমাদের পছন্দই হয়ে গেল। তবে আশাহত করল আমাদের আপনজন। রাঙাকাকা স্বয়ং। কত বদলে গেছে রাঙাকাকা। যে কদিন রইল, সারাক্ষণ শুধু কলকাতার নিন্দে। ওহ্, হোয়াট এ ন্যাস্টি সিটি! হেল্ হেল্, রিয়েল হেল্। এত নোংরা, এত পলিউটেড শহরে কী করে যে বাস করে মানুষ! জার্মানি হলে সমস্ত বাস লরি রাস্তায় ব্যান্ড করে দিত। রাস্তাঘাটেরও কী দশা! ভাঙাচোরা! গর্ত! অসভ্যর মতো জ্যাম! সিটিজেনদের এতটুকু সিভিক সেন্স নেই! ভিখিরি আর হকার দখল করে নিয়েছে ফুটপাথ! ফ্র্যাংকফুর্ট হলে সবকুট্টাকে ধরে ধরে গারদে পুরত!

হয়তো রাঙাকাকা খুব একটা ভুল বলেনি। সত্যি তো কলকাতা দীন থেকে দীনতর হচ্ছিল প্রতিদিন। তবু বড় কানে লাগত। মাত্র আড়াই বছর বিদেশে বাস করে এত পরিবর্তন? নাকি মেম বউ সঙ্গে এনেছে বলে একটু বেশি বেশি করছে? ভাবছে ফ্রিডাকাকিমা নির্ঘাৎ তুলনা করছে ফ্র্যাংকফুর্ট আর কলকাতার? স্বদেশের কুশ্রী রূপ ফ্রিডার সামনে প্রকাশ হওয়ার জন্যই কি ভেতরে ভেতরে কমপ্লেক্সে ভুগছে রাঙাকাকা? নাকি রাঙাকাকা সত্যি সত্যি ঘেন্না করতে শুরু করেছে নিজের দেশকে? কিংবা এ দেশে আর ফেরার ইচ্ছে নেই, তারই প্রস্তুতি চালাচ্ছে মনে মনে?

তা রাঙাকাকা তো চলেও গেল। বছর তিনেক আর এ দেশ মাড়ালও না। চিঠিতে খবর এল একটা ছেলে হয়েছে। ম্যাক্স। ফটোও এল ম্যাক্সের। ফুটফুটে গোলগাল গোরা বাচ্চা, ইউরোপিয়ান ছাঁদের মুখ, কিন্তু চোখ আর চুল কুচকুচে কালো। দেখলাম বটে, তবে ওইটুকুই। তখন আমাদের রাঙাকাকা ফ্রিডাকাকিমা নিয়ে ভাবাভাবির সময় নেই। কলকাতাতে আমাদের সংসারেও তখন ছোটখাটো ভাঙাগড়া চলছে। কাকামণি কাকিমার আবার একটা মেয়ে হল, ছুটকির বয়স এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই কাকা বদলি হয়ে সপরিবারে চলে গেল শিলিগুড়ি। দাদা এম.এ পাস করে চাকরি পেল ব্যাংকে, দিদির বিয়ে হয়ে গেল, ছোড়দি ঢুকেছে কলেজে, আমি বারো ক্লাসের পড়া নিয়ে হিমশিম খাচ্ছি।

তখনই একদিন মারা গেল ঠাকুমা। বয়সও হয়েছিল, নানা ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে গেছিল দেহ।

মারা যাওয়ার আগে ঠাকুমা খুব নাম করেছিল রাঙাকাকার, ছোট ছেলেকে একবার শেষ দেখা দেখার বড় সাধ ছিল। জানানোও হল রাঙাকাকাকে। কিন্তু রাঙাকাকা যখন পৌঁছল, তখন সব শেষ।

সেবার একাই এসেছিল রাঙাকাকা। সঙ্গে ফ্রিডাও না, ম্যাক্সও না। এই দূষিত শহরে ম্যাক্সকে নাকি আনা যায় না, অসুস্থ হয়ে পড়বে ইন্দো-জার্মান শিশু। দেখলাম দেশের প্রতি ঘৃণাটা রাঙাকাকার আরও বেড়েছে, রাস্তায় নাকে রুমাল চেপে হাঁটে। ঠাকুমার মৃত্যুতে যত না ব্যথিত, বুঝি তারচেয়ে বেশি নিশ্চিন্ত। নাড়ির টান কাটল বলে?

মনে মনে রাঙাকাকার একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি পেয়ে যাচ্ছিলাম। স্বচ্ছ হচ্ছিল

চরিত্রটা। আমরা ছোটবেলায় রাঙাকাকাকে যতই আপনজন বলে ভাবি না কেন, রাঙাকাকা আদতে সেই প্রজাতির মানুষ যাদের কাছে নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যটাই আগে। নিশ্চয়ই গদাই মুখার্জির শৈশব থেকে বাসনা ছিল একবার সুযোগ পেলেই টুক করে কেটে পড়বে দেশ থেকে। রক্ষণশীল যৌথ পরিবারে থেকে নিশ্চয়ই মনে মনে ছটফট করেছে। এবং প্রথম চান্সে বাইরে গিয়েই বিকশিত হয়েছে তার আসল রূপ। জার্মানিতে সিটিজেনশিপ পাওয়া বেশ কঠিন, তাই অচিরেই সরল ফ্রিডাকাকিমাটিকে ফাঁসিয়েছে, দেশীয় চাকরির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেছে, বউ বাচ্চা নিয়ে সে এখন পুরোদস্তুর জার্মান। গায়ের চামড়াই যা পাল্টাতে পারবে না, ওইটুকু দুর্ভাগ্য রয়েই যাবে। আর ওইটুকু খামতি কাটানোর জন্যই বুঝি ঘৃণার বহর এত বেশি।

অর্থাৎ আমাদের শৈশব আর কৈশোরের অনেকখানি জুড়ে থাকা রাঙাকাকা এখন পুরোপুরি খরচার খাতায়। তা এই নিয়ে মনোবেদনায় আকুল হওয়ার মতো বয়স আর নেই, সে থাকুক তার মতো, আমরা আমাদের মতোই থাকব।

কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেছে কোটি কোটি কিউসেক জল। রাইন দানিয়ুবও থেমে থাকেনি। দু'দুটো প্রধানমন্ত্রী খুন হল ভারতে, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ঘটল, খসে পড়ল বার্লিনের প্রাচীর, গোটা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে আমেরিকার ডানা, স্ট্যাচু অফ লিবার্টির ভারে কাঁপছে বহু দেশের স্বাধীনতা। কমপিউটার আর ইন্টারনেটের দৌলতে দুনিয়া ক্রমশ বড়সড় গ্রাম।

গরিব গাঁয়ের মানুষ আমি স্কুল পেরিয়ে কলেজ গেছি, কলেজ টপকে ইউনিভার্সিটি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপে পা রাখার মুখে মুখে বিয়েও হয়ে গেল আমার। বর রেলের অফিসার। কাজপাগল। খেপাটে। অফিসই তার ধ্যানজ্ঞান। বিয়ের দু'বছরের মাথায় রিন্টি এল, সাত বছরের মাথায় রাজা। তাদের স্কুল, পড়াশুনো, তাদের পিছনে ছোটা, সংসার, রান্নাবান্না এসব নিয়েই হু হু করে কেটে যায় দিন।

আমাদের মনোহরপুকুরের বাড়ির চেহারাও আর এক নেই। রিটায়ারমেন্টের পর পরই সেরিব্রাল স্ট্রোকে মারা গেল জেঠামশাই। দাদা বিয়ে

করল এক পঞ্জাবি মেয়েকে। বিয়ের বছর খানেকের মধ্যে ছোড়দির ডিভোর্স হয়ে গেছিল, আবার অফিসের এক সহকর্মীকে বিয়ে করে মোটামুটি সুখী সে। হাবুলও ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে এখন ঘোরতর সংসারী। তবে ও বাড়িতে হাঁড়িটি আর এক নেই, মা জেঠিমা এখন পৃথগন্ন। তবে সদ্ভাব আছে যথেষ্ট। চাকরিজীবন শেষ করে তাস নিয়ে মেতেছে বাবা। বাড়ি থাকলে পেশেন্স খেলে, নইলে পাড়ার ক্লাবে গিয়ে ব্রিজ। কাকামণির তো আর কলকাতায় ফেরাই হয়নি। শিলিগুড়ি থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত বদলি হয়ে আসতে পেরেছিল, সেখানেই দোতলা বাড়ি বানিয়েছে একখানা। পিকু শ্বশুরবাড়িতে, ছুটকির সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে।

ঠাকুমার মৃত্যুর পরও বার তিনেক এসেছিল রাঙাকাকা। একবার সঙ্গে ফ্রিডাকাকিমা। ম্যাক্সকে আনেনি, আমরা আশাও করিনি। সত্যি বলতে কি, রাঙাকাকা দেশে এল কি এল না এই ব্যাপারটাই আর আলোড়িত করত না আমাদের। শহরে কত বিদেশিই তো আসে বেড়াতে। তবে হ্যাঁ, দেখাসাক্ষাৎ হলে ভালই লাগত। চলে যাওয়ার পর দ্রুত ধূসর হয়ে যেত রাঙাকাকা।

সেও তো অনেককাল আগের কথা। রিন্টি হওয়ার পর রাঙাকাকা আর হিন্দুকুশ পেরলো কই!

তবে চিঠি আসত। খুবই অনিয়মিত, তবু আসত। চিঠিতে নিজের খবর থাকত না বিশেষ। তোমরা কেমন আছো, আমি ভালো আছি গোছের কয়েকটা লাইন, প্রণাম নিও, আশীর্বাদ ভালবাসা, ব্যাস্।

হালকা চমক এল বছর তিনেক আগে। কাকামণির ছোটবেলার এক বন্ধু ইউরোপ ভ্রমণে গেছিল, ঠিকানা খুঁজে খুঁজে দেখা করেছিল রাঙাকাকার সঙ্গে। তার মুখে যা সব শুনলাম! রাঙাকাকা নাকি পুরো অ্যালকোহলিক হয়ে গেছে, দিনরাত চুর হয়ে থাকে মদে, অফিস-টফিসও যায় না নিয়মিত। ডিভোর্স হয়নি বটে, তবে ফ্রিডা নাকি বহুকাল আগেই ছেড়ে চলে গেছে রাঙাকাকাকে। ম্যাক্সেরও বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সে নাকি মার সঙ্গেই থাকত, এখন স্টুটগার্টে। রাঙাকাকা একা। ভীষণ একা।

বাবা তো শুনেই গুম। অনেক বিদেশবাস হয়েছে, এবার ফিরে আয় বলে চিঠি দিল রাঙাকাকাকে। উত্তর এল না। অক্ষরের সুতোটুকুও ছিঁড়ে ফরদাফাই।

আস্তে আস্তে দূরের মানুষটা আরও দূরের হয়ে গেল।

মানুষর মনের তল পাওয়া সত্যিই বড় কঠিন। যাকে চিনে গেছি বলে ভাবি তাকেও কখনও কখনও এত অচেনা মনে হয়! বাঁধাধরা কোনও ছকে ফেলা কি যায় মানুষকে?

দুর্গাপুজোয় এবার বাপের বাড়িতে ছিলাম কদিন। দিদি ছোড়দিও এসেছিল। দারুণ হুল্লোড় করে কাটল পুজোটা। ট্যাঙোস ট্যাঙোস করে ঠাকুর দেখে বেড়ানো, ফুচকা আলুকাবলি খাওয়া, চুটিয়ে আড্ডা মারা, কী যে করিনি আমরা। সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী চারদিনের জন্য উনুন এক। পুনম বউদি ছোলে বাটোরে বানায়, তো হাবুলের বউ পোলাও। মা বাবা জেঠিমাও মহা আহ্লাদিত, যেন বহুকাল পর আবার হারানো সময়টাকে ছুঁতে পেরেছে।

একাদশীর দিন হঠাৎই এক প্রবল ধাক্কা। কাকভোরে পাড়ার একটি ছেলে এসে ডাকছে—হাবুলদা? ও হাবুলদা? দেখুন তো, এই ভদ্রলোক বোধহয় আপনাদের খুঁজছেন।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরিয়েছে হাবুল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে,—দিদি ছোড়দি ফুলদি, শিগগিরই আয়। দেখে যা কে এসেছে!

বাইরে এসে আমরা তো থ। রাঙাকাকা! কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে? হাড় বের করা শরীর, গাল ঢুকে গেছে ভেতরে, মাথায় চুল প্রায় নেইই, কপালে অজস্র বলিরেখা। রং এখনও টকটকে লাল, কিন্তু সাতান্ন আটান্ন বছরের মানুষটাকে দেখে মনে হয় এক অশীতিপর বৃদ্ধ! চোখ দুটোও কেমন ঘোলাটে, দৃষ্টি যেন স্বাভাবিক নয়!

পাড়ার ছেলেটি বলল,—স্যুটকেস নিয়ে প্যান্ডেলের পিছনে বসে বসে ঢুলছিলেন। কিছুতেই বলতে পারছিলেন না কোত্থেকে এসেছেন, কোথায় যাবেন....শেষে অনেক কষ্টে মনে করে মেসোমশাইয়ের নামটা...

হাবুল ছুটে গিয়ে ধরল রাঙাকাকাকে। হাত ধরে নিয়ে আসছে। টলছে রাঙাকাকা। মদের গন্ধও নেই, এলাচের গন্ধও নেই, তবু পা বেসামাল। কোনওরকমে এনে বসানো হল বৈঠকখানার বড় সোফাটায়। ফ্যালফ্যাল চোখে সবার দিকে তাকাচ্ছে রাঙাকাকা।

বাবা মা জেঠিমাও হুড়মুড়িয়ে ছুটে এসেছে। বাবা গিয়ে বসল পাশে।

কাঁধ চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল,—এই গদাই, তুই হঠাৎ...?

রাঙাকাকা বিড়বিড় করে বলল,—কাল রাত্তিরে প্লেন থেকে নামলাম...ট্যাক্সি ধরে...বাড়ি খুঁজে পাচ্ছিলাম না রে মেজদা।

—সে কী? বাবা প্রায় স্তম্ভিত,—আসছিস জানাসনি কেন? কেউ একজন তাহলে চলে যেত দমদম।

—কে জানাবে? কাকে জানাব?...বাড়িটাই তো ভুলে গেছি।

রীতিমতো অসংলগ্ন কথাবার্তা। সারা রাত রাস্তা রাস্তায় ঘুরেছে নাকি? কতক্ষণ এসে বসে আছে প্যান্ডেলের পিছনে? শরীরের এই অবস্থায় কেউ প্লেনে চেপে পাড়ি দেয়?

দিদির ছোট মেয়েকে দেখে হঠাৎই উজ্জ্বল হয়েছে রাঙাকাকার মুখ। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,—কী রে টুকু, কেমন আছিস?

মিমিকে দিদি বলে ভুল করছে, অথচ দিদি পাশেই দাঁড়িয়ে! ব্যাপারটা তো সুবিধের নয়!

পরিস্থিতিটা আন্দাজ করে দাদা গার্জেনের ঢঙে বলল,—এই, সবাই এখন হটো তো। বুঝছনা মানুষটা এগজস্ট করে গেছে, ব্রেন কাজ করছে না। একটা স্লিপিং পিল দিচ্ছি, ঘুমোক খানিকক্ষণ। ওঠার পর দেখা যাবে।

প্রায় ঘণ্টা সাত আট টানা ঘুমোল রাঙাকাকা। মড়ার মতো। যেন বহুকালের অনিদ্রা পুষিয়ে নিচ্ছে। তবে জেগে উঠেও পুরোপুরি স্বাভাবিক হল না। আমাদের যেন চিনতেই পারছে না, আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা বলে ধরে নিচ্ছে। আমাকে তো বেশ কয়েকবার মেজবউদি বলে ডাকল। মা জেঠিমাকেও দেখছে পিটপিট করে, যেন চিনেও চিনছে না। কেন এল হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না, তাকিয়ে থাকে কেমন ঘোর লাগা চোখে।

সন্ধেবেলা ডাক্তার ডাকা হল। ওষুধটোষুধও পড়ল কিছু। পরদিন রক্ত পরীক্ষার পর জানা গেল ব্লাডসুগার অসম্ভব হাই। অথচ কী আশ্চর্য, রাঙাকাকার কাছে কোনও সুগারের ওষুধ নেই।

তিন চার দিনের মধ্যে অনেকটা স্বাভাবিক হল রাঙাকাকা। হাঁটছে চলছে, কথাবার্তাও বলছে ঠিকঠাক। বাবার সঙ্গে গল্প করছে, মা জেঠিমার সঙ্গে ফস্টিনস্টি হচ্ছে, শুধু নিজের কথা কিছু বলতে নারাজ। আমরাও কেউ আর বেশি চাপাচাপি করলাম না। মানুষের কষ্টের জায়গায় খোঁচাখুঁচি করে কী লাভ!

দিদি ছোড়দি চলে গেছে। আমাকেও ফিরতে হবে। চলে আসার আগে ঢুকলাম রাঙাকাকার ঘরে। গিয়ে দেখি কী কাণ্ড, খাটের ওপর রাজাকে বসিয়ে ব্রহ্মা আর শিবের জুডো লড়ার গল্প শোনাচ্ছে রাঙাকাকা!

অবাক হয়ে বললাম,—তোমার এখনও গল্পটা মনে আছে?

—হুম। রাঙাকাকা মাথা দোলাল,—তোকে একটা ছড়া শিখিয়েছিলাম, সেটা কি স্মরণে আছে তোর?

—কোনটা বলো তো?

—সেই যে, তোর চেহারার ডেসক্রিপশান। টিপ কপালি, চোখ ছোট, দাঁত উঁচু, মাথা হেঁড়ে রে...!

—ইশ, আমি মোটেই ওরকম দেখতে ছিলাম না!

—ছিলি না কী রে? এখনও তো আছিস। রাঙাকাকা হাসছে,—তোর বরকে একদিনও দেখলাম না তো?

—সে ভীষণ বিজি। তার দর্শন পেতে গেলে আমার বাড়ি যেতে হবে। ...কবে আসবে বলো?

—এবার তো হবে না রে।

—কেন? তুমি তো এখন আছ কদিন?

রাঙাকাকা হুঁ হ্যাঁ কিছু বলল না। চোখটা কেমন ছলছল করছে। মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্য দিকে। বলল,—দেখি।

পরের সপ্তাহেই ফ্র্যাংকফুর্ট ফিরে গেল রাঙাকাকা। সবাই থাকার জন্য জোরাজুরি করেছিল, শোনেনি। ওখানে নাকি দরকারি কাজ আছে।

মাস খানেক পরে শেষ খবরটা এল। ফ্রিডাকাকিমাই ফোন করেছিল। রাঙাকাকা মারা গেছে। নিজের অ্যাপার্টমেন্টেই মরে পড়ে ছিল, পচা গন্ধ পেয়ে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেয়। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে স্ট্রোক। হার্ট অ্যাটাক।

মরে যাবে বুঝতে পেরেছিল বলেই কি শেষ বারের মতো এসেছিল রাঙাকাকা? কিন্তু কেন এসেছিল? চলেই বা গেল কেন? জানি না।

কত দূর পর্যন্ত প্রোথিত থাকে মানুষের শিকড়? কতবছর সময় লাগে তাকে উপড়ে ফেলতে? জানি না।

উত্তরটা খুঁজছি।

মুহূর্ত

সিটের নীচে মালপত্র ঢোকাচ্ছিল সুকান্ত। ঠেলে ঠেলে। জায়গার তুলনায় আমার সুটকেসটা একটু বড়ই হয়ে গেছে, ভেতরে যাচ্ছে না ঠিক মতো। খানিকটা বেরিয়েই রইল শেষ পর্যন্ত।

হাল ছেড়ে দিয়ে সুকান্ত হাত ঝাড়ছে,—নাহ্, তোমার মুখখানা মনে হচ্ছে সারারাত বেরিয়েই থাকবে।

সামনের বার্থে এক প্রবীণ দম্পতি। সম্ভবত উত্তরপ্রদেশীয়। বৃদ্ধা পা তুলে বাবু হয়ে বসেছে, দু হাঁটুর ফাঁকে লাঠি চেপে বৃদ্ধ ঈষৎ জবুথুবু। দুজনেই শঙ্কিত মুখে দেখছিল সুকান্তর ধস্তাধস্তি। বৃদ্ধটি বলে উঠল,—রহনে দিজিয়ে না। ইয়ে টু টায়ার কা ক্যুপ হ্যায়, অউর কোই তো নেহি আয়েগা।

হিন্দিভাষী বৃদ্ধ সুকান্তর রসিকতা বিন্দুমাত্র বোঝে নি। হেসে ফেললাম। সুকান্তও হাসছে। রগুড়ে গলায় বলল, তোমরা মেয়েরা পারোও বটে। যাচ্ছ তো মেরে কেটে সাত দিনের জন্যে, তাতেও সঙ্গে একটা গন্ধমাদন?

—একা গেলে হয়তো নিতাম না। বইবার লোক যখন জুটেই গেল...

—বাহ্ বাহ্, বর আমায় কুরিয়ার ঠাউরেছে, আর বউ কুলি! এই না হলে কপাল!

—কপালের এখনও দেখেছটা কী? ওই পাহাড় মাথায় করে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে তবে তোমার ছুটি। টের পাবে, ঝক্কিটা কাঁধে নিয়ে কী ভুল করেছ!

—কী করব বলো, তোমায় একা ছাড়তে হচ্ছিল বলে তোমার বরের মুখে চোখে যা টেনশান দেখলাম।

আমার জন্য অতীনের দুশ্চিন্তা? হাসব, না কাঁদব? তবে হ্যাঁ, লোক দেখানো ব্যাপার স্যাপারগুলো অতীন বেশ ভালই পারে। কী চোস্ত ডায়ালগ! তুই কলকাতা যখন যাচ্ছিসই, শুক্রবার না গিয়ে শনিবার যা। জয়া বিয়েবাড়ি যাচ্ছে, সঙ্গে কিছু গয়নাগাঁটিও থাকবে...বুঝিসই তো, দিনকাল ভাল নয়...তুই সঙ্গে থাকলে একটু কনফিডেন্স পাই আর কী! দ্যাখ্ না তোর ট্র্যাভেল এজেন্টকে বলে, টিকিটগুলো বদলানো যায় কিনা!

অতীনের ফাঁকিটা কোথায় আমি তো বুঝি! উদ্বেগ যদি খাঁটি হত, আমার একা যাওয়ার টিকিট কি কেটে আনতে পারত? টুসুর বিয়েতে পায়ের ধুলো দেওয়ার জন্য ছোটমাসি তো কম বার ফোন করেনি অতীনকে, এই জুলাই অগাস্ট মাসে অফিসে কাজের চাপও তেমন থাকে না। পাঁচ সাত দিনের জন্যও কি ছুটি নেওয়া যেত না?

যাক গে। মরুক গে। লেবু চটকালে তেতোই হবে। মুখে হাসি ধরে রেখে বললাম,—কিন্তু বন্ধুকৃত্য করতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়লে তো? কলকাতায় শনিবারের কাজটা তোমার পণ্ড হল!

—আরে দূর, অফিস ক্যান ওয়েট। মহারানিকে এমন সঙ্গ দেওয়ার সুযোগ তো বার বার আসে না।

—ভাল। ফাইফরমাস খেটে রাতটা কাটাও।

—ইট্স মাই প্লেজার, ম্যাম।

—হুম্?

পা গুটিয়ে বসলাম সিটে। মিনিট পনেরো হল ছেড়েছে ট্রেন। পাঁচটার রাজধানী প্রায় ছ'টা বাজিয়ে। আজ নাকি আপ ট্রেন দেরিতে ঢুকেছিল, পরিণামে ডাউনও লেট। কদিন ধরেই রাজধানীর নাকি এই দশা, আসা যাওয়ার টাইমের কোনও ঠিকঠিকানা নেই। পরশুই অতীনের এক কলিগ

কলকাতা থেকে ফিরল, সাড়ে দশটার গাড়ি সেদিন ইন করেছিল নাকি প্রায় তিনটেয়। কাল যে কখন হাওড়া ব্রিজের দর্শন মিলবে কে জানে!

ট্রেন কর্মচারীরা এসে গেছে বেডরোল দিতে। চাদর বালিশ কম্বল তোয়ালে গুনে গুনে সাজিয়ে রাখল ওপরের বার্থে। প্রায় পিছন পিছন জলও হাজির। বোতল হাতে নিয়েই তেষ্টা পেল অল্প অল্প। সুকান্তকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম,—কাজ শুরু করো। এটা খোলো।

দীঘল আঙুলের মোচড়ে পলকে উন্মোচিত হয়েছে ছিপি। গলায় এক ঢোক গিলেই উহুহু করে উঠলাম, বাপ রে, কী ঠাণ্ডা!

—খুউব? সুকান্ত বোতলে হাত রাখল,—যাহ্, ঠিকই তো আছে।

—আমার চলবে না। খেলেই গলাব্যথা। ...প্যান্ট্রিকারে বললে একটু এমনি জল পাওয়া যাবে না?

কথাটুকু খসতে যা দেরি, উঠে পড়ল সুকান্ত। প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে। ছোট্ট একটা ব্রিজ পার হল ট্রেন, ঝনঝন কেঁপে উঠল বগি। ঝাঁকুনি খেয়ে সুকান্ত টলে গেছিল, কামরার দেওয়াল ধরে সামলাল নিজেকে।

খারাপই লাগল। এই ধরনের বায়নাক্কার কোনও মানে হয়? একা থাকলে কী করতাম? সঙ্গে অতীন থাকলেও এসব আবদার চলত কি? থোড়াই উঠত অতীন। হয় ভান করত অন্যমনস্কতার। নয়তো উপদেশ ঝাড়ত—ধৈর্য ধরো, ঠাণ্ডা জল একটু পরে আর তত ঠাণ্ডা থাকবে না। নিজে সে অবশ্য ধৈর্যশীল পুরুষই বটে। ঠোঁট থেকে ছোঁড়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে হুকুম তামিল না হল তো গোটা ফ্ল্যাট একেবারে মাত মাত। টুবলু পর্যন্ত বিরক্ত হয় আজকাল। বাপি তুমি কথায় কথায় এত চেল্লাও কেন বলো তো? ইটস নট ফেয়ার, ইটস নট ফেয়ার।

সামনের বৃদ্ধা গায়ে কম্বল টেনে আধশোওয়া। ট্রেনের এসি এখনও জোরদার হয়নি, তাতেই বুড়ি কম্পমান। বয়স হলেও মুখখানি এখনও বেশ ঢলঢলে। নাকে ঝিকঝিক করছে নাকছাবি। হিরে? চোখ পিটপিট করে আমাকে জরিপ করছে মহিলা। পুট করে প্রশ্ন ছুঁড়ল,—আপলোগ কাঁহা যায়েঙ্গে?

—কলকাত্তা। আপলোগ?

—ধানবাদ। ...আপলোগ কেয়া কলকাত্তাকে রহনেওয়ালে হ্যায়?

—পহলে থে। আভি নেহি। আভি দিল্লিমে হি...

—ঘুমনে যা রহে হ্যাঁয়?

একের পর এক প্রশ্নবাণ হেনে চলেছে বুড়ি। কেন যাচ্ছি, কবে ফিরব, আমার ছেলেমেয়ে কটি, কোন ক্লাসে পড়ে ছেলে, সে কেন সঙ্গে যাচ্ছে না... এমন অসংখ্য কৌতূহল। বুড়ির ছেলে থাকে ধানবাদে, দুই মেয়ের পর তার একটি ছেলে হয়েছে, নাতির মুখ দেখার জন্য বুড়ো বুড়ি ব্যাকুল, এ সংবাদও জানাতে ভুলল না।

ভ্যাজর ভ্যাজরের মাঝেই সুকান্তর প্রত্যাবর্তন। হাতে একটা ছোট্ট ফ্লাস্ক। বলল, রাজধানীর ব্যাপারই আলাদা। নো অর্ডিনারি ওয়াটার। হয় হট, নয় কোল্ড।

হেসে বললাম—নো প্রবলেম। মিক্স করে খাচ্ছি।

—মিশিয়ে দেব?

—থাক, নিজেই মিশিয়ে নিচ্ছি। অত খাতিরে আমার অভ্যেস নেই।

বিচিত্র মুখভঙ্গি করল সুকান্ত। পাশে বসে গলা নামিয়ে বলল,—আমার বন্ধুর বদনাম করছ?

—সুনাম বদনাম কিছুই করি নি। বলছিলাম বেশি আদরযত্ন আমার সয় না।

—বুঝেছি। অতীনের ওপর খুব চটে আছ।

মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। জল ঢালছি ফ্লাস্কের ঢাকনায়। অতীনের ওপর চটা কি আমার শোভা পায়? নাকি সে অধিকার আমার আছে? আমার রাগ অভিমানকে এখন কতটুকু আমল দেয় অতীন? সে হল গিয়ে কাজের মানুষ। আমি তো এখন তার ডোরম্যাট। প্রয়োজন হলে পা মুছবে, মেজাজমর্জি বিগড়ে থাকলে সরিয়ে দেবে লাথি মেরে। এই যে আজ স্টেশনে তুলে দিতে পর্যন্ত এল না, এও তো হজম করতে হবে মুখ বুজে। কেমন অবলীলায় সকালে টাই বাঁধতে বাঁধতে বলে দিল, কলকাতা গিয়ে আত্মহারা হয়ে পোড়ো না! পৌঁছে একটা ফোন কোরো কিন্তু! বউ পুরনো হলে বুঝি এরকমই হয়। টেকেন ফর গ্রান্টেড। আছে, ঘর-সংসার সামলাচ্ছে, সারাদিন শ্বশুরশাশুড়ির হ্যাপা পোয়াচ্ছে, রাঁধছে বাড়ছে, ছেলেকে মানুষ করছে, ছেলের হোমটাস্ক নিয়ে চুল ছিঁড়ছে...। বিনিময়ে খাওয়া পরা, উইকএন্ডে কখনও সখনও হোটেলে চাইনিজ মোগলাই, বিবাহবার্ষিকীতে একখানা করে দামী শাড়ি কিংবা

গয়না...এর বেশি আর কী চাও, অ্যাঁ?

ঈষদুষ্ণ জল খেলাম অনেকটা তবু যেন তেষ্টা মিটল না পুরোপুরি। ভেতরটা শুকনোই হয়ে আছে। এই ভাব সহজে কাটবে না, আমি জানি।

চা স্ন্যাকস এসে গেল। ঢাউস সিঙাড়া, লাড্ডু আর লজেন্স সমেত ট্রেখানা এগিয়ে দিল সুকান্ত, নাও, সেবা করো।

নাক কুঁচকে বললাম,—আমি আর এখন এসব কিছু খাব না। সাড়ে ছ'টা বাজে, ওই সিঙাড়া গিললেই আমার অম্বল বাঁধা।

—আমার কিন্তু জোর খিদে পেয়েছে।

—খাও। তুমি তো স্ট্রেট অফিস থেকে এসেছ। স্টেশনেও অতক্ষণ বসে থাকতে হল...।

ট্রে থেকে সিঙাড়া তুলে কামড় বসাল সুকান্ত। চিবোতে চিবোতে বলল, তোমার মাসতুতো বোনের বিয়েটা যেন কবে?

—পরশু।

—আর ফেরা তো নেক্সট শনিবার, তাই না?

—হ্যাঁ। তখন অবশ্য একাই ফিরব। গয়নাগাঁটি নিয়েই। উইদাউট পাহারাদার।

শ্লেষটা সুকান্ত যেন ঠিক ধরতে পারল না। কিংবা পারল, মুখে কোনও অভিব্যক্তি ফোটাল না। চা ঢালতে ঢালতে বলল, টুবলুটাকে সঙ্গে আনলে পারতে। বিয়ে বাড়িতে কদিন হল্লাগুল্লা করত, তোমারও কোনও প্রবলেম থাকত না...

—মাথা খারাপ! সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ওর ফার্স্ট টার্মিনাল। এখন আর নিচু ক্লাসে নেই, এইট চলছে...এ সময়ে সাত দিন স্কুল কামাই করানো যায়?

বললাম বটে, তবে যুক্তি পুরোপুরি নিখাদ নয়। টুবলুকে নিয়ে আসাই যেত। একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলে স্কুলেও কোনও সমস্যা হত না। টুবলুই রাজি নয়। সেও তো তার বাবারই ছেলে, এখনই তার মতামত যথেষ্ট দৃঢ়, নিজের বৃত্তটি ছেড়ে মার সঙ্গে বিয়েবাড়ি যাওয়া তার পোষাবেই না।

আলগা ভাবে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লাম, তুমি কোথায় গিয়ে উঠছ? টালিগঞ্জ?

—নাহ্, এবার আর ভায়ের বাড়িতে নয়। ওদের ফ্ল্যাটে স্পেস কম, অসুবিধে হয়। প্রায় মাসেই তো এখন কলকাতা ছুটছি, প্রত্যেক বার ওদের

গিয়ে জ্বালাতে ভাল লাগে না। সুকান্ত চায়ে লম্বা চুমুক দিল, এবার হোটেল। দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে মস্তিতে থাকব। খাও, পিও, যখন খুশি ফেরো....ফাইন।

—ছেলের সঙ্গে দেখা করবে না?

আকস্মিক প্রশ্নটায় সুকান্ত যেন থমকে গেল সামান্য। পলকা একটা ছায়া পড়েছে মুখে। একটু চুপ থেকে বলল, দেখি। মনে হয় হবে না।

—কেন?

—জানোই তো, মনীষা চায় না আমি রাজার সঙ্গে যোগাযোগ রাখি। নানান বাহানায় ঘুরিয়ে দেয়।

—আশ্চর্য, তোমার ছেলে, তুমি তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে না? এ তো মনীষার ভারী অন্যায়।

—ন্যায় অন্যায় বলে দুনিয়ায় ধ্রুব কিছু আছে নাকি ম্যাডাম? একজনের চোখে যেটা অন্যায়, অন্যজনের কাছে সেটাই হয়তো ন্যায়। মনীষা যে আমার সঙ্গে রাজার দেখা হওয়াটা চায় না, তার পিছনে নিশ্চয়ই মনীষারও কিছু যুক্তি আছে, এবং সেটাই ওর কাছে ন্যায়। প্লাস, কাস্টডির মামলায় মনীষা জিতেছিল, সেটাও ওর একটা বড় জোর।

—তবু তুমি যে রাজার বাবা, এ তো মনীষা অস্বীকার করতে পারে না?

—পিতৃত্বও রিলেটিভ ব্যাপার ম্যাডাম। ছেলে যদি আমাকে বাবা ভাবে, আমি বাবা। না ভাবলেই টোটাল আউটসাইডার। তার ওপর ছেলে তো, ওরও মার ওপর একটা আলাদা উইকনেস আছে। আমি সেখানে ইনট্রুড করি কোন ভরসায়?

সুকান্তর স্বরে গাঢ় বিষণ্ণতা। রাগ হচ্ছিল মনীষার ওপর। তোদের মধ্যে যা হয়েছে হয়েছে, তার জন্য বাপ ছেলের সম্পর্কও মুছে দিবি? সুকান্তই বা কেমন বাবা? কোর্টে গিয়ে নালিশ ঠোকে না কেন? ছেলেকে চোখের দেখা দেখার রাইটটাও কেন ছেড়ে দেবে?

বললাম না কিছু। কারুর ক্ষতস্থানে বেশি খোঁচাখুঁচির দরকার কী!

সুকান্তকে তো কম দিন ধরে চিনি না, অতীনের অনেক দিনের পুরনো বন্ধু, সুকান্তর সঙ্গে মনীষার সম্পর্ক ছেঁড়াছিঁড়ির তিক্ততার কথাও অজানা নয়, ওই অপ্রিয় প্রসঙ্গ সরিয়ে রাখাই তো ভাল।

চুপচাপ চা শেষ করে নামিয়ে রাখলাম ফ্লাস্ক। পাশে পড়ে থাকা

ব্রিফকেসখানা খুলে একটা ম্যাগাজিন বার করেছে সুকান্ত। এলোমেলো ওলটাল একটুক্ষণ। তারপর রেখে দিয়ে বসে আছে ঝুম হয়ে। আবার টানল বইটা। ফের দেখছে এ পাতা সে পাতা।

ভাল গতি নিয়েছে ট্রেন। এসিটাও বেশ চড়া হয়েছে এতক্ষণে। শীত শীত করছিল। ঝুঁকে সিটের তলা থেকে কিটসব্যাগটা টানলাম। শাল চাই। এক্ষুণি। যা বিচ্ছিরি ধাত আমার, ঠাণ্ডা লেগে গেলে আর রক্ষে নেই।

শাল গায়ে জড়িয়ে চোখ রেখেছি জানলায়। ঘন সবুজ কাচের ওপারে মরে এসেছে দিন, ঘরবাড়ি মাঠঘাট সবই কেমন আবছা এখন। কাচের ভেতর দিয়ে শেষ বিকেলের আলো কী ভীষণ ম্রিয়মাণ লাগে। আকাশটাকে মনে হয় মেঘলা মেঘলা। হঠাৎ হঠাৎ আসছে স্টেশন, পড়ছে জনপদ, দুর্দম দাপটে তাদের পেরিয়ে যাচ্ছে রাজধানী। মাড়িয়ে যাচ্ছে। তীব্র হুইসল বাজিয়ে বিপরীতমুখী একটা ট্রেন বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল পাশ দিয়ে। কে বেশি জোরে গেল? এই ট্রেনটা? না ওই ট্রেনটা?

কানের কাছে সুকান্তর গলা, কী ভাবছ ম্যাডাম?

বিড়বিড় করে বললাম,—উফ্ কী স্পিড!

—স্পিডই তো জীবন ম্যাডাম। সুকান্ত আবার ঝলমল করছে,—যে কটা দিন বাঁচবে, উদ্দাম গতিতে ছোটো। গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে তো গেলে।

—লেকচার মেরো না। হেসে ফেললাম,—একা একা ছোটা যায়?

—ছুটতে জানলেই যায়।

—তারপর মুখ থুবড়ে পড়লে?

—গন। ফিনিশড। দু সপ্তাহ লোকে প্যানপান করবে, দু মাস গলায় মালা ঝুলবে, তারপর ইউ আর নো হোয়্যার। এই ট্রেনটার কথাই ধরো না। এক্ষুনি যদি কোথাও আছড়ে পড়ে...

—অ্যাই, ভয় দেখিয়ো না তো।

—আরে, না। সুকান্ত হা হা হেসে উঠল,—আমি থাকতে অ্যাক্সিডেন্ট? নো চান্স।

—তুমি কি অ্যাক্সিডেন্ট প্রুফ নাকি?

-বলতে পারো। বাংলায় যাকে বলে যমের অরুচি, আমি হচ্ছি তাই।

অন্তত বার চারেক তা প্রমাণ হয়ে গেছে।

—কী রকম?

—রকেট বাসে শিলিগুড়ি যাওয়ার টিকিট বুক করেও শেষ মুহূর্তে রিচ করতে পারিনি। বাসটা ডালখোলায় অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল। চা খাব বলে একটা ই-এম-ইউ লোকাল ছেড়ে দিয়েছিলাম, ট্রেন দমদম ঢোকার মুখে ডিরেলড। মুম্বাই-এর ফ্লাইট ধরব বলে সেদিন এয়ারপোর্টে যাচ্ছি, সাউথ দিল্লির বিটকেল জ্যামে ফেঁসে গেলাম। ওই প্লেনটাই ক্রাশ করল। আটষট্টিজন ডেড। মনে আছে প্লেন অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা?

—ওটাতে তোমার যাওয়ার কথা ছিল? বলোনি তো কখনও?

—দুঃখের কাহিনী আর কী শোনাব?

—দুঃখের কাহিনী? এগুলো তো সুসংবাদ।

—মোটেই না। মৃত্যু আমার ভাগ্যে নেই। আমি শুধু ছুটছি। কেন ছুটছি জানি না, কোথায় পৌঁছব জানি না, ছোটাই সার।

—এবার একটু জিরোও। আবার থিতু হও।

আমার চোখে সরাসরি চোখ রাখল সুকান্ত। দেখছে কী যেন। দৃষ্টিটা যেন স্বাভাবিক নয়, সামান্য ঘোলাটে। কয়েক সেকেন্ড পরেই চোখ সরিয়ে নিল। উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম,—চললে কোথায়?

—যাই, মাথায় একটু ধোঁয়া দিয়ে আসি।

এবার যেন সুকান্তর যাওয়াটা অন্য রকম। সিট থেকে ঝুঁকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। মাথা নিচু করে হাঁটছে। যেন খানিকটা দূরমনস্ক। এক মধ্যবয়সী মহিলা বাথরুম থেকে আসছিল, সরে দাঁড়িয়ে তাকে রাস্তা করে দিল। আবার এগোচ্ছে মন্থর পায়ে। সুকান্ত কি আজ একটু আপসেট আছে? আমাদের ময়ূরবিহারের ফ্ল্যাটে মাঝেসাঝেই আসে সুকান্ত, মাসে বার দু'তিন তো বটেই। দারুণ হইহল্লা করে। পলিটিক্স নিয়ে জোর তর্ক চলে অতীনের সঙ্গে, টুবলুকে ক্রিকেট নিয়ে খেপায় অবিরাম। সুকান্তর হাহা হিহিতে গমগম করে গোটা ফ্ল্যাট। প্রাণবন্ত সুকান্তকে অতীনের বাবা মারও বেশ পছন্দ। ঘরে ঢুকে তাঁদের খোঁজখবর নিচ্ছে, দু'দণ্ড বসে গল্প করছে...। আর আমার পিছনে তো লেগেই আছে সারাক্ষণ। এই বিস্বাদ রান্নাটা কোথথেকে শিখলে, অ্যাঁ? টিভি দেখে

রেসিপি লেখার সময়ে নির্ঘাৎ ভুল টুকেছ! ঘরের ভেতর এত গাছ রেখেছ কেন? বাড়িটাকে জঙ্গল বানাতে চাও? টবের আড়ালে তোমরা কর্তাগিন্নি এর পর থেকে বাঘের কসটিউম পরে বসে থেকো! লোক ঢুকবে, আর হালুম বলে গ্রিট করবে! সেই ফুর্তিবাজ সুকান্ত আজ যেন একটু মনমরা। ঠাট্টাইয়ার্কি করছে, আবার যেন সিরিয়াসও হয়ে যাচ্ছে দুম করে। কলকাতা যাচ্ছে বলে কি মনীষা, রাজাকে মনে পড়ছে? প্রায় বছর ছ'সাত হল ছেলে নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে মনীষা। এখনও বোধহয় বেচারা মনীষাকে ভুলতে পারেনি।

সওয়া সাতটা বাজে। কামরায় স্যুপ বিতরণ শুরু হয়ে গেছে। এই তো চা স্ন্যাকস্ দিল, এত তাড়াতাড়ি স্যুপ? কেটারিং সার্ভিস টাইম মেক আপ করছে?

প্রকাণ্ড কেটলি হাতে আমাদের ক্যুপে পৌঁছেছে লোকটা,—ম্যাডাম, স্যুপ?

আমি ওই ট্যালটেলে জিনিসটি খাব না। সুকান্ত খাবে কি? রাখব একটা? খানিক দোনামোনা করে ভরে নিলাম কাগজের গ্লাস। ব্রেডস্টিকও রাখলাম। সঙ্গে নুন গোলমরিচ। বুড়িও দেখি আমার দলে। লালচে তরল খাওয়ানোর জন্য বুড়িকে সাধাসাধি করছে বুড়ো। নাক সিঁটকে জোরে জোরে মাথা নাড়াচ্ছে বুড়ি। দিল্লি থেকেই সাইড বার্থের পরদা টানা ছিল। বাচ্চা নিয়ে অল্পবয়সী একটা বউ আছে সেখানে, সঙ্গে এক গুঁফো স্বামী। স্যুপ নেওয়ার জন্য পরদাটা একটু সরিয়েছিল গুঁফো, বাচ্চাটা বিকট সুরে কেঁদে উঠতেই কার্টেন ক্লোজড। বাচ্চা বোধহয় মায়ের দুধ খাবে আবার।

ধূমপান সেরে ফিরল সুকান্ত। স্যুপ দেখে মুখ ভেটকাল, খেয়েও নিল এক চুমুকে। সিটে হেলান দিয়ে বসল পা ছড়িয়ে। বৃদ্ধর সঙ্গে গায়ে পড়ে টুকটাক কথা বলছে। দিল্লিতে এবার বর্ষা সেভাবে এল না, অথচ বিহারে কেমন বন্যা চলছে, এই সব হাবিজাবি।

হঠাৎ ঘুরে তাকিয়ে বলল,—একটা কথা মনে করিয়ে দিয়ো তো।

সুকান্তর ম্যাগাজিনটাতেই চোখ বোলাচ্ছিলাম। মুখ তুলে বললাম,—কী?

—খাবার দিতে এলে আর এক রাউন্ড গরম জল চেয়ে নেব।

নিতান্ত সাধারণ একটা কথা, তবু শুনতে বড় ভাল লাগল। হেসে বললাম,—তোমার বন্ধু শিওর তোমাকে একটা প্রাইজ দেবে।

—কেন?

—তার বউ-এর এত যত্ন করছ।

—ফিরে গিয়ে সার্টিফিকেটটা ভাল করে দিয়ো কিন্তু।

—দেব।

—বরকে এখনই বলতে পারো। আমার সঙ্গে মোবাইল আছে।

—থাক।

—আহা, শরমাচ্ছ কেন? বলোই না একটু বরের সঙ্গে কথা। এখনও নেটওয়ার্ক আছে, কখন চলে যায়! ...এই তো, আমিই উঠে গিয়ে একটা দরকারি ফোন সেরে নিলাম।

—আমার দরকার নেই।

—নিদেনপক্ষে টুবলুকে একটা এস-এম-এস করো।

—বললাম তো, প্রয়োজন নেই। আমাকে ছাড়া ওরা একটু হাত পা মেলে আছে, কেন মিছিমিছি ডিসটার্ব করব?

—হুম। বুঝলাম।

—কী বুঝলে?

—তুমিই এখন একটু মুক্ত বিহঙ্গ হতে চাও।

—চাই-ই যদি, কার কী?

—কিচ্ছু না। মেলে দাও ডানা।

সত্যি যদি তাই পারতাম! যদি কোনও উপায় থাকত সত্যি সত্যি!

ছোট্ট শ্বাস ফেলে বললাম,—বাজে কথা ছাড়ো। কাজের কথা বলো। তোমার অফিসের কী খবর? কী একটা ট্রান্সফার ফান্সফার হওয়ার চান্স আছে বলছিলে সেদিন?

—হুম। আমার ব্যাম্বু তৈরি হচ্ছে। বোধহয় এই কোম্পানির অন্ন আমার উঠল।

—মানে?

—ইস্টার্ন জোনে ব্যবসা বাড়ছে। কোম্পানি প্ল্যান করছে কলকাতা ডিভিশানটা আরও বড় করার। এখন অবশ্য পরিকল্পনার স্তরেও নেই, মোটামুটি ফাইনালাইজ হয়ে গেছে। আমাকেই বোধহয় প্রোমোশন দিয়ে কলকাতায় জুতে দেওয়া হবে।

—বাহ্, ভাল তো। গুড নিউজ।

—অফকোর্স নট। কলকাতায় আমি আর পাকাপাকি ভাবে ফিরবই না।

চাকরি ছেড়ে দেব সেও ভি আচ্ছা।

—ওমা, কেন?

—আমার ইচ্ছে। যে শহরে মনীষা বাস করে সে শহরে আমি কিছুতেই থাকব না।

কথাটা ঝাং করে লাগল কানে। মনীষা আর সুকান্ত না প্রেম করে বিয়ে করেছিল? এক সময়ের গভীর নৈকট্য এমন ভয়ংকর ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়? নাকি নৈকট্য ছিল বলেই ঘৃণা এত তীব্র? আজ মনীষার ওপর সুকান্ত যতই ক্ষিপ্ত থাকুক, ছাড়াছাড়ির জন্য মনীষা কি একাই দায়ী? সুকান্ত কি ধোওয়া তুলসীপাতা? সুকান্ত মনীষা দুজনেই আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল। মনীষা অভিযোগ করত, সুকান্ত ছন্নছাড়া, বড্ড বেশি বেপরোয়া, দায়িত্বজ্ঞানহীন, এবং রাগল তো চণ্ডাল। সুকান্ত বলত, মনীষার মতো আত্মসুখী মেয়ে সে জীবনে দ্বিতীয়টা দেখেনি। হয়তো দুজনের অনুযোগেই খানিকটা সত্যি আছে, খানিক মিথ্যেও। তবু বিচ্ছেদটা ঘটে যাওয়ার এত বছর পরেও ঘেন্নাটাকে জিইয়ে রাখার কী অর্থ? এখন তো ঘৃণা ভালবাসা কিছুই থাকা উচিত নয়। তবে কি ভালবাসাটা আছে? ঘৃণা হয়ে? ফারমেন্টেড প্রেম?

জানলার পাশে সরে গিয়ে আবার চোখ রেখেছি পুরু কাচে। বাইরে নিকষ আঁধার ছাড়া কিছুই এখন দৃশ্যমান নয়। তবু তার মাঝেও হঠাৎ হঠাৎ দেখা যায় এক আধটা আলোর ফুটকি। আবার তারা মিলিয়েও যায়। মোটা কাচে ভেসে ওঠে নিজেরই প্রতিবিম্ব। স্পষ্ট নয়, তবে আমিই। ঝাপসা ঝাপসা। বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে আসছে। কেমন একটা যেন দমবন্ধ ভাব। উঠে বাথরুমে গেলাম। বেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাইরের প্যাসেজটায়। আরাম লাগছে। এখানে বেশ টাটকা বাতাস, কোনও কৃত্রিম শীতলতা নেই। শ্বাস নিলাম জোরে জোরে। ফুসফুসে খানিকটা অক্সিজেন গেল। আঃ, স্বস্তি।

সিটে ফিরতে না ফিরতেই কামরা জুড়ে এলোপাথাড়ি ব্যস্ততা। নৈশাহারের। প্যানট্রি কারের কর্মীরা হানটান করছে, যাত্রীদের সামনে খানা নামাচ্ছে ঝপাঝপ। ঈষৎ ঝিমিয়ে আসা যাত্রীরাও নড়ে চড়ে বসেছে।

মিনিট কুড়ির মধ্যে ভোজনপর্ব শেষ। পটাপট আলো নিবছে, টপাটপ উইকেট পড়ছে। বুড়িকে বিছানা করে দিয়ে ওপরে উঠে গেল বুড়ো। তাদের সুবিধের জন্য ভাল করে পর্দা টেনে দিল সুকান্ত, নেবাল উজ্জ্বল বাতিটা।

এখন ক্যুপে নীলচে আলোছায়া।

একটুক্ষণ পাশাপাশি বসে থেকে সুকান্ত নিজেকে বদলে এল পাজামা পাঞ্জাবিতে। বলল,—ম্যাডাম, এবার তোমার বিছানাটা করে দিই?

—এখনই শোবে?

—ভূতের মতো বসে থেকেই বা কী করব?

—তাও তো বটে। যাও, শুয়ে পড়ো।

—তুমি?

—শুচ্ছি। একটু পরে।

—চাদর পেতে দিই?

—থাক, পেতে নেব।

—আর একটু গরম জল দেখব?

—চলে যাবে। রাতটা আর লাগবে না।

বার্থে নিজের শয্যা পেতেও দু-চার মিনিট বসে বসে উশখুশ করল সুকান্ত। কিছু বুঝি বলতে চায়। বলল না, চলে গেছে ওপরে।

গোটা কামরা আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে ঘুমে। অদৃশ্য নিদালির জাদুমায়ায়। বুড়ো বুড়ি তো রীতিমত গভীর নিদ্রায়। প্রবল বিক্রমে ছুটছে ট্রেন। শব্দ বাজাচ্ছে ঝমরঝম। দেখতে দেখতে কানপুর এল। চলেও গেল। একটু বুঝি সাড়া জেগেছিল কামরায়, আবার চারপাশ নিঝুম। হিম হিম ভাব বাড়ছে ক্রমশ। কম্বল গলা পর্যন্ত টেনে মাথা রেখেছি বালিশে। মস্তিষ্কের কোষে পাক খাচ্ছে তালবেতাল চিন্তা। টুবলু ঠিকঠাক খেল তো? মুরগির ঝোলটা বড্ড পাতলা হয়েছিল, টুবলুর মনঃপূত হবে না। দিন দিন বাবার কার্বনকপি হচ্ছে ছেলে, খাওয়া নিয়ে অজস্র ফ্যাকড়া। শাশুড়ির ব্যথার ট্যাবলেট টেবিলের নীচের ড্রয়ারে রাখা আছে, খুঁজে পাবেন তো? কটা দিন নিজের ওষুধ নিজেকেই নিয়ে খেতে হবে। শ্বশুরমশাই চোখে ভাল দেখেন না, ছেলেও নিশ্চয়ই হেল্প করবে না মাকে!

অতীন কী করছে এখন? শুয়ে পড়েছে কি? নাকি ফাইল ঘাঁটছে অফিসের? টের পাচ্ছে কি আমার অনস্তিত্ব?

বুকের চাপ ভাবটা ফিরে এল হঠাৎ। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, যেন কেউ চেপে ধরছে নাক। মুখ দিয়ে বাতাস টানার চেষ্টা করলাম। লাভ হচ্ছে

না, দমবন্ধ ভাব বেড়েই চলেছে। ঠাণ্ডা ক্যুপেও ঘামছি অল্প অল্প। উঠে বসলাম। ব্যাগ হাতড়াচ্ছি। সর্বনাশ, ওষুধটা নিইনি তো! কম্বল ফেলে, পরদা সরিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এসেছি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরার বাইরে। হাঁপাচ্ছি।

তখনই পিঠে হাতের ছোঁয়া। সুকান্ত।

—কী হয়েছে জয়া?

হাতের ইশারায় বোঝালাম অবস্থাটা।

—হাঁপানি আছে তোমার?

—জানি না। মাঝে মাঝে হয় এরকম। সিজন চেঞ্জের সময়...কিংবা এসিতে...

—ওষুধ খাও না?

—খেলে একটু কমে। আনতে ভুলে গেছি।

—তো এখন কী করবে? সারা রাত বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাবে?

তাজা বাতাসে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছে ফুসফুস। বললাম,—আর একটু দাঁড়াই।...তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো।

সুকান্ত নড়ল না। অন্যমনস্ক হাতে পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট বার করে ঠোঁটে ঝুলিয়েছে, পরক্ষণে রেখে দিল। চোখ সরু করে নিরীক্ষণ করছে আমায়।

অস্বস্তি হচ্ছিল। তাড়া লাগালাম, —কী হল, যাও।

—তোমায় একা ফেলে? সুকান্ত ভারী অদ্ভুত হাসল।

—একা জেগে কষ্ট পাওয়ার অভ্যেস আমার আছে। আমার জন্য তুমি শুধু শুধু ঘুম নষ্ট করবে কেন?

—আমি তো ঘুমোইনি। জেগেইছিলাম। সুকান্ত একটা শ্বাস ফেলল, —একা একা জেগে কষ্ট পাওয়ার অভ্যেস আমারও আছে, জয়া।

শেষ কথাটুকু প্যাসেজের ছোট্ট পরিসরে ছড়িয়ে গেল যেন। পাক খাচ্ছে। ঘুরে ঘুরে ছুঁয়ে যাচ্ছে আমায়। নিজেকে সহজ করার জন্য হেসে উঠলাম, —তবে যে বড় শুতে গেলে?

সুকান্ত জবাব দিল না। ট্রেনটা হঠাৎ খুব বেশি দুলতে শুরু করেছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলাম, হাত বাড়িয়ে ধরে নিল আমায়। ধরেই আছে। বলল, —তোমার হাতটা কী ঠাণ্ডা!

সুকান্তর স্পর্শে একটা উত্তাপ চারিয়ে যাচ্ছিল শরীরে। রক্তের কণারা ছুটছে মাতালের মতো। কত দিন অতীন এভাবে হাত ধরেনি আমার?

অনুচ্চ স্বরে বললাম, —ঘুম আসে না তো স্লিপিং পিল খেতে পারো।

—দেখেছি খেয়ে। লাভ হয় না। উল্টে সকালে অসুবিধে হয়।

আস্তে করে হাত ছাড়িয়ে নিলাম। বললাম,—চলো।

—কমেছে আনইজিনেসটা?

—হুঁ।

ক্যুপে ফিরে আধশোওয়া হলাম। বালিশ পিঠের দিকে দাঁড় করিয়ে দিল সুকান্ত। বলল, —আমার পিলোটাও দেব?

—দাও।

শুধু বালিশ নয়, নিজের কম্বল চাদরও ভাঁজ করে পিঠে দিয়ে দিল সুকান্ত, কোমর অবধি টেনে দিল চাদরটাকে। ঝুঁকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মাথায়। ফিসফিস করে বলল, —চোখ বোজো।

বাধ্য মেয়ের মতো বন্ধ করেছি চোখ। সুকান্তর নিঃশ্বাস পড়ছে আমার মুখে। গাঢ় উষ্ণ শ্বাস। শীতল কামরায় বসে একটু একটু করে পুড়েই গেলাম আমি।

সুকান্ত কি আমাকে চুমু খেল? নাকি আমি সুকান্তকে?

জানি না।

অতীন কি জেগে উঠল হঠাৎ? শূন্য বিছানায় খুঁজল আমাকে?

জানি না।

অতীনের কি মনে পড়ল মনীষাকে?

জানি না।

বাইরে কি চাঁদ উঠেছে এখন? ঘন কাচ ভেদ করে জ্যোৎস্না কি ঢুকে পড়ল কামরায়?

জানি না।

কিচ্ছু জানতে চাই না। দুটো একা মানুষ একটা মুহূর্ত কুড়িয়ে পেয়েছে হঠাৎ। হয়তো বা একটু পরে হারিয়েও যাবে মুহূর্তটা। তবু ক্ষণিকের তরে যদি তাকে ছুঁয়ে থাকি, ক্ষতি কী?

হারাণের বাঁচা মরা

নাম হারাণচন্দ্র দাস। বয়স বছর ছাব্বিশ। পাতলা অথচ একরোখা চেহারা। সামান্য লম্বাটে মুখ। গায়ের রঙ ফ্যাকাসে কালো। মাথাভর্তি একরাশ কালো কোঁকড়া চুল।

হারাণ ঢাকুরিয়ার বাজারে মাছ বিক্রি করে। থাকে সতের নম্বর বস্তির একেবারে শেষের ঘরটায়। ঘরে তার কচি বউ আর বছর দেড়েকের ছেলে। হারাণ নেশা করে। বউকে পেটায়, সোহাগ করে। আবার লাইনের ধারে আশার ঘরে গিয়ে ফুর্তিফার্তাও করে। ফ্রন্টস্টলের সিনেমা টিকিটে পর্দার একেবারে মুখোমুখি বসে হিন্দি সিনেমা দেখে। পর্দায় আধা উলঙ্গ মেয়ে মানুষ কিম্বা জব্বর মারপিট দেখলে পয়সাতো ছোঁড়ে, সিটি বাজায়। মন মেজাজ কখনও তার লক্কা পায়রা কখনও খেপা ষাঁড়।

লোকে বলে হারাণের দিলটা খুব বড়। কারোর দুঃখ কষ্ট দেখলে তার মেজাজ বিগড়ে যায়। বন্ধু-বান্ধবদের জন্য সে জান পর্যন্ত দিতে পারে।

হারাণ খুব ধার্মিকও। ফি হপ্তায় বাজারের মোড়ের শনি মন্দিরে পুজো

দেয়। বছর বছর বাঁক নিয়ে তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল চড়িয়ে আসে।

হারাণের বাজারে বেশ কিছু দেনা। ফড়েদের কাছে প্রায়ই তার টাকা বাকি পড়ে।

গত বছরের মতো এবারও হারাণের ইচ্ছে ছিল শ্রাবণ মাসে বাবার মাথায় জল ঢালতে যাওয়ার। যাব যাব করেও হয়ে উঠল না। তার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। বাপ মারা যাওয়ার পর থেকে এই ব্যবসা হারাণের। সেই সতেরো বছর বয়সে সে কারবার হাতে নিয়েছে। এতদিনের কাজে কোনোদিন সামান্য একটুর জন্যও অসাবধান হয়নি হারাণ। সেদিন হল। সন্ধের বাজারে, জাবদা বঁটিতে কেজি দেড়েকের একখানা ইলিশ দু ভাগ করতে গিয়ে হাত একেবারে ফালা।

এমনিতেই সেদিন দুপুরের পর থেকে হারাণের মন মেজাজ বেজায় খিঁচড়ে ছিল। তার ওপর কাজের সময়ে এই বিপত্তি। বিশ্রী একটা খিস্তি মেরে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটা আঙুলটা সে চেপে ধরল আঁশ কাদা ভর্তি পাটাতনের গায়ে।

সামনে তখন গোটা তিনেক খদ্দের দাঁড়িয়ে। হারাণের কাণ্ড কারখানা দেখে শিউরে উঠল তারা,

—আহা করিস কি হারাণ? ওভাবে নোংরায় আঙুল চেপে ধরতে আছে?

হারাণ দাঁতে দাঁত চেপে বলল,—কিছু হবে না বাবু। ও শালার রক্তর হারামিপনা আমি এক্ষুনি বার করছি।

রক্ত কিন্তু কোনও ধমকেই ঘাবড়াল না। টকটকে তাজা লাল রক্ত। চঞ্চল শিশুর মত খিল্‌খিল্ হাসিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল আঙুলের ডগায়।

ডাক্তারখানায় যেতেই হল হারাণকে। কম্পাউন্ডার আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বলল, আজকেই এ.টি.এস নিতে হবে।

শুনে হারাণের তেজী বুক গুড় গুড় করে উঠল। আতঙ্কে ছটফট করল সে। বার বার বলল,—না-না ছুঁচ ফোটাতে লাগবে না। ভারি তো কাটা।

কারুর উপদেশই শুনল না হারাণ। টগবগে তেজী যুবক, যে নিজের শরীর থেকে অত রক্ত বেরিয়ে গেলেও এক ফোঁটা ঘাবড়ায় না, শরীরে ছুঁচ ফোটানর ভয়ে সে ভীষণ কাতর হয়ে পড়ল।

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে ঘরে ফিরল না হারাণ। ঘর সংসারে তার ঘেন্না ধরে গেছে। বিশেষ করে দুপুরের পর থেকে মন একেবারে গুম্ মেরে আছে।

সকালের বাজারে আজ প্রচুর ইলিশের চালান এসেছিল। ডায়মণ্ড-হারবারের গঙ্গায় কোটালের পর ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়েছে। দেখে লোভ সামলাতে পারেনি হারাণ। আহা, কী গতর একেকখানার। ভদ্দর লোকেদের বাড়ির ডবকা ছুঁড়িগুলির মত চকচকে পেছল গা। ইয়া চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা পেটি। চিক্‌চিকে রুপোলি রঙ যেন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। রাজবংশী আগের কিছু টাকা পায়। নগদ ছাড়া কিছুতেই ছাড়ছিল না। তাকে অনেক পড়িয়ে টড়িয়ে শেষমেষ চার পিস মাল তুলেছিল হারাণ। সকালের বিক্রি বাট্টাও মন্দ হয় নি। আমোদের ঝোঁকে সে নিজের জন্য একটা মাঝারি গোছের মাছ আলাদা সরিয়ে রেখেছিল। বাকি মাছ ভালমতো বরফ চাপা দিয়ে, গলা ছেড়ে হিন্দি গানের কলি গাইতে গাইতে ঘরে ফিরছিল হারাণ। হাতে দুলছে রুপোলি ইলিশের থলি। কি গন্ধ! কি স্বাদ! কাঁচা ইলিশের ঘ্রাণ বরাবরই বড় প্রিয় হারাণের। ঝাঁঝাল আঁশটে গন্ধে কেমন নেশা নেশা ভাব। খুব তৃপ্তি করে দুপুরের খাওয়াটা খাবে ভেবেছিল হারাণ।

পথে বিশুর সঙ্গে দেখা। দারুন জেল্লা মারা জামা গায়ে। হারাণের পিঠে থাবড়া মেরে বলেছিল,—দূর শালা, এখন ঘরে যাবি কি? ক্যানিং-এর সুবল, আজ হেবি রস এনেছে। চল্ মেরে আসি।

লুঙ্গির খুঁটে তখন গজগজ করছে নোট। তবু হারাণ দুবার চিন্তা করেছিল। কাল শালার রাজবংশীকে কিছু টাকা শুধতেই হবে।

বিশু হিন্দি সিনেমার হিরোদের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল,—ছোড় ইয়ার। ও হারামি তো আমার কাছেও বহুৎ পয়সা পায়। শালা চষমখোরের বাচ্চা। কাল এলে শতখানেক ঠেকিয়ে দিবি।

বস্তির একটা বাচ্চা ছেলের হাত দিয়ে ঘরে মাছটা পাঠিয়ে হারাণ বিশুর সঙ্গ নেয় অতঃপর। দুপুরের আধখানা বাচ্চুর ঝুপড়িতে কাটিয়ে, বিকেলের মুখে নেশায় চুর হারাণ যখন ঘরে ফেরে, তখন সুমতি ঘরের চৌকিতে বসে ছেলেকে দুধ দিচ্ছে। হারাণ বাইরের দালানে দাঁড়িয়ে চেঁচায়,—

—অ্যাই, আমার মাছ কোথায়?

সুমতির শরীরটা সকাল থেকেই বেজায় আই ঢাই করছিল। কোলেরটা এখনও বছর দেড়েকের হয়নি, আরেকটা এসে গেছে পেটে। প্রথমটা হওয়ার সময়ই শরীরের ওপর বড় ধকল গেছে। তার শ্যামলা রঙ-এ কিছুদিন আগেও তেলতেল ভাব ছিল। এখন গোটা শরীর একেবারে ফ্যাকাশে, শুকনো চেহারায় হাড়গুলো শুধু কটকট করে চেয়ে আছে। ঘন কালো চোখের নীচে কয়েক পোঁচ কালি। দুর্বল শরীরে, ঘাড় ঘুরিয়ে একবার হারাণকে দেখে নিয়ে সে পেছন ঘুরে বসেছিল।

হারাণ ঘরের খাটো দরজা ধরে তখন ঘন ঘন দুলছে। পরনের লুঙ্গি আর চেকশার্ট কাদায় কাদা। আধবোজা চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে একরাশ এলোমেলো চুল। কিছুক্ষণ দোলার পর সে আবার জড়ানো গলায় চিৎকার করে,

—অ্যাই, আমার মাছ কোথায়?

সুমতি কোল থেকে ঘুমন্ত ছেলেকে নামিয়ে একটু ঝাঁঝাল গলায় বলে,—আমি কি জানি তোমার মাছ কোথায়?

হারাণ দরজা টপকে ঘরে ঢোকে—তোকে যে একটা অতবড় ইলিশ পাঠিয়ে দিলাম।

—ইসরে। অত বড় একটা ইলিশ পাঠিয়ে দিলাম। সঙ্গে তেল কেনার পয়সা পাঠিয়েছিলে?

—চোপ। হারাণ গর্জে ওঠে—তেল কিনে আনিস নি কেন?

সুমতিও একই গলায় বলে,—পয়সা দিয়ে আমায় তুমি সাজিয়ে রেখেছ কিনা।

হারাণের সব সহ্য হয়। শুধু মেয়েমানুষের চোপা সে একদম বরদাস্ত করতে পারে না। আগে মেয়েমানুষটা তবু ভয়ডর মান্যিগন্যি করত, এখন দিন দিন বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। চৌকি থেকে হাতপাখাটা তুলে নিয়ে হারাণ বেশ ক'ঘা বসিয়ে দিয়েছিল বউ এর পিঠে। অন্যান্য দিন মার খেয়ে সুমতি গলা ছেড়ে কাঁদে। হারাণও তখন নতুন করে পেটানোর উৎসাহ পায়। আজ দু-চার ঘা খাওয়ার পরই মেয়েমানুষটা কেমন থম্ মেরে গেল। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গঁ-গঁ শব্দ তুলছে শুধু। হারাণের মেজাজ তাতে আরও বিগড়ে যায়। ছেলেটা কাঁচাঘুম ভেঙে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। হারাণের অত সাধের নেশা একটু

একটু করে ছুটে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর সে আবার হুঙ্কার ছেড়েছিল,—এই হারামজাদী ওঠ্ খেতে দে।

সুমতি তবু গড়িয়েই আছে। কষে একটা লাথি কষাতে গিয়েও হারাণ থমকে যায়। বউটার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলার মতো কি যেন বেরোচ্ছে না! পোয়াতি মানুষ। কিছু হয়ে টয়ে গেল না তো? হঠাৎ হারাণের কেমন মায়া হয় সুমতির ওপর। জল এনে বউ-এর মুখ চোখে ছিটোয়। বাতাস করে। কোলপাঁজা করে চৌকিতে উঠিয়ে এনে শুইয়ে দেয়। সুমতি চোখ খুললে ভারি নরম গলায় ডাকে,

—কি রে খুব লেগেছে?

একথায় সুমতি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। হারাণ যত ভাল কথা বলে ততো তার কান্না বাড়ে। শেষমেষ হারাণ ধুত্তোর বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সকালের আমুদে মেজাজ তখন থেকে ভিজে একেবারে স্যাঁতসেঁতে। বিকেলে বাজার বসার সময় হয়ে এসেছে। হারাণের কিছুই ভাল লাগছিল না। এদিকে মাছ নিয়ে এবেলা না বসলেও নয়। ইলিশ বড় অভিমানী জাত। কাল সকাল অবধি বরফ চাপা রাখাটা ঠিক হবে না।

তখনই এই রক্তারক্তি।

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে হারাণ সোজা চলে গেল আশার ঘরে। আশা তাকে দেখে ঠোঁট টিপে হাসল, কি গো, আজ এমন অসময়ে?

—এলাম। ঘরে মালটাল কিছু আছে? হারাণ আশার বিছানায় টান টান শুল।

আশার ঘরে হারাণের আসা-যাওয়া অনেক দিনের। তার ওপর আশার কেমন একটা টানও আছে। হারাণকে দেখেই সে বোঝে বাবুর মন মেজাজ আজ ঠিক নেই। মাথার কাছে বসে সে হারাণের চুলে হাত বোলায়, খিলখিল করে হাসে। কি গো আজ এত মাথা গরম যে?

হারাণ পাশ ফিরে শুল। আঙুলের ডগাটা বেশ টাটাতে শুরু করেছে। আশা মোটা কাচের গ্লাসে সস্তা দামের মদ ঢালছে। লাইনে নামার পর থেকে তাকে ঘরেই এসব রাখতে হয়। তার স্বামীটা অন্য একটা মেয়েমানুষকে নিয়ে ভেগেছে—কাজকর্ম করে খাওয়া যেত দুজনে মিলে। কিন্তু কপাল যার মন্দ,

তার কি সুখ সয়! আশার গতরখানি বড় সুন্দর। স্বামী ভাগবার পর হারাণদের মত লোকেরা ছেঁকে ধরতে শুরু করল তাকে। শেষমেষ আশা দেখল এভাবে গতরটাকে খাটালেই পয়সা আসে বেশি। সাধ আহ্লাদ মেটানো যায়। পেটেরও জোগাড় হয়।

—তোমার আঙুলে কি হল গো? আশা হারাণের গা ঘেঁষে বসে আদুরে গলায় প্রশ্ন করল।

হারাণ ঢকঢক মদ গিলছে। অনেকক্ষণ পর ভারি রঙ্গের হাসি হাসল,—তুই কামড়ে দিয়েছিলি, মনে নেই?

—আহা, আমি কখন কামড়ালাম? আশা ঢলে পড়ল হারাণের বুকে।

—কামড়াসই তো। সব সময় কামড়াস। হারাণও আশাকে জড়িয়ে ধরল।

কিন্তু এ খেলাও আজ বেশিক্ষণ ভাল লাগল না হারাণের। হঠাৎ উঠে পড়ে জামাকাপড় ঠিক করছে,

—চল নাইট শো-এ সিনেমা দেখি আসি।

—মাইরি নিয়ে যাবে? নতুন ধরনের প্রস্তাবে আশার চোখ জ্বলজ্বল।

গভীর রাতে হারাণ যখন বাড়ি ফিরল তখন তার আঙুল বেশ টাটিয়ে উঠেছে। ডাক্তারখানা থেকে ব্যথা কমাবার ওষুধ দিয়েছিল। তাই খেয়ে সে ঘুমন্ত সুমতির পাশে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকাল থেকে হারাণের ধুম জ্বর। দুদিন পরেও জ্বর কমে না দেখে সুমতি তাকে জোর করে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল সঙ্গে বিশু। বুড়ো আঙুলের মাথা একেবারে পেকে ফুলে গেঁজিয়ে উঠেছে। ডাক্তারবাবু ইনজেক্শন নিতে বললে, আবারও হারাণ আগের মত ছটফট করে।

—পায়ে পড়ি ডাক্তারবাবু। যত ওষুধ দ্যান খাব, ছুঁচ ফোটাবেন না।

বিশু বলল,—পাগলামি করিস না হারাণ। ইনজেকশন নিয়ে নে চোখ বুজে।

হারাণ গোঁ ধরে, মরতে হয় মরব। তাতে আমি ভয় পাই না। তবু শরীরে ছুঁচ ফোটাতে দেব না।

সেদিনই রাত থেকে হারাণের চোয়াল আটকে আসতে থাকে। হাতে পায়ে খিঁচ ধরে। জিভ গোটাতে শুরু করে।

হাসপাতালে ভর্তি হল হারাণ। সুমতি রোগা শরীরে ছোটাছুটি করে মরছে। ছোটে, হাঁপায়, কাঁদে। মানুষটা মরে গেলে তার কি গতি হবে?

শেষ পর্যন্ত হারাণ মরেই গেল। পাঁচদিন পাঁচরাত একটানা লড়াই চালাতে চালাতে এক সময় হার মানল শরীর। শোকে পাগল সুমতি মাথা খুঁড়ে মরল।

রাত বাড়ছে। হারাণের শোকে হাট-বাজার দোকান-পাট সব বন্ধ। শ্মশান থেকে ফিরে বিশুর মন টিকছিল না। হারাণটা এভাবে বেঘোরে অক্কা পেল? বড় বন্ধু ছিল বিশুর। চোখমুখ থমথমে বিশু সন্ধের পর আর ঘরে থাকতে পারল না। বেরিয়ে এল।

সন্ধেবাজারটা রাস্তার ওপর। বিশু হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে এসে দাঁড়ল। গোটা এলাকা একেবারে থমথম করছে। রাস্তায় লোকজনও বেশি নেই। লোডশেডিং। রাস্তার দুধারে দাঁড়ানো ল্যাম্পপোস্টগুলোকে একপা ওয়ালা ঢ্যাঙা ভূতের মতো লাগছে। অন্যদিন দোকানিদের আলোতেই পথঘাট ঝলমল করে। আজ সেখানে চাপ চাপ জমাট অন্ধকার। এদিকে ওদিকে শালপাতা কলাপাতা। ঝুড়ির টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সামনের সাইনবোর্ডের গায়ে চকে লেখা—মাছ ব্যাবসায়ী হারাণ চন্দ্র দাসের অকাল মৃত্যুতে সন্ধ্যা বাজার আজ বন্ধ।

লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিশুর দু'চোখ ফেটে জল এসে গেল। হঠাৎ পিঠের ওপর একটা নরম হাতের ছোঁয়ায় বিশু চমকে ফিরে তাকাল। আশা। ছ্যাবলা মেয়েটা আজ একটুকুও রঙচঙ মাখেনি। মুখ শুকনো খড়ি ওঠা। চোখের কোণে শুকনো জলের দাগ।

আশা বিশুর জামাটা পেছন থেকে খামচে ধরে—চলো।

বিশু ফ্যালফ্যাল করে তাকাল,—কোথায়?

—আমার ঘরে। আশা ফিসফিস করে বলল। চোখের কোণে চিক চিক্ করছে জলের আভাস।

হাতে হাত রেখে এগোচ্ছে দুজনে। বন্ধ সবজির দোকানগুলোর দিক থেকে ভেসে আসছে গানের আওয়াজ।

কিছু দোকানী এক জায়গায় জড়ো হয়ে বসে জুয়া খেলছে। ট্রানজিস্টারে হিন্দি সুর বাজছে। কে যেন সিটি দিয়ে উঠল।

বিশুরা মাছের দোকানের দিকে এসে পড়েছে হাঁটতে হাঁটতে। বিশু আশার হাত ধরে অদ্ভুত ঘোরের ভেতর হেঁটে চলেছে। ওদের বসার তক্তাগুলো এখন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো।

—ও বাবা গো ওটা কি? আশা আঁতকে উঠে হঠাৎ জড়িয়ে ধরেছে বিশুকে।

বিশুও ছিটকে সরে এল কয়েক পা। হারাণের বসার জায়গায় শূন্য অন্ধকারের বুকে এক জোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে।

আশা ভয়ে আঁকড়ে ধরে আছে বিশুকে। বিশু সাহস করে একটু এগোয়! ...না। তেমন কিছু না। বিশু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বড় করে। অন্ধকারে কালো কুকুরটার শরীর ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। নেড়ি কুকুরটা সামনের দুটো পা দুমড়ে তক্তার ওপর বসে আছে। বিশু আশার পিঠে হাত রাখল,

—আরে ভয় নেই। ওটা একটা ঘেয়ো কুকুর, আয় চলে আয়।

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আচমকা কুকুরটা তীক্ষ্ণ স্বরে কেঁদে উঠেছে। বড় করুণ আর অসহায় সে কান্না। সেই আর্ত চিৎকারে বিশু আশা দুজনেরই বুক খান খান হয়ে গেল।

...হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল ওরাও।

খুরশিদ

বছর দশ বারো আগের কথা। কিংবা তার একটু বেশিই। সাল তারিখ অতশত মনে নেই, তবে সময়টা ছিল শীতের শুরু। বোধহয় ভাইফোঁটার এক দু সপ্তাহ পরেই হবে। কী একটা কাজে যেন গিয়েছি রানিকুঠি, দেখি দিদি জামাইবাবুর ফ্ল্যাট আলো করে বসে এক কাশ্মীরি তরুণ।

হ্যাঁ, কাশ্মীরি যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এক নজরেই ঠাহর করা যায়। দিব্যি দ্যুতিময় চেহারা। তেমন লম্বাচওড়া নয় বটে, তবে রীতিমতো রূপবান। টকটকে রঙ, ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ নাক, নীল চোখ—যেন পারস্যের রাজকুমার। শীতকালটায় এমন চেহারার রাজপুত্রদের হামেশাই শালের গাঁঠরি কাঁধে কলকাতার যত্রতত্র দেখা যায়।

বোঁচকা পড়ে আছে মেঝেতে, কার্পেট জুড়ে রঙবেরঙের শাল। দিদি ঝুঁকে শালগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। উল্টোদিকের সোফায় হেলান দিয়ে জামাইবাবু। ভুরু কুঁচকে জরিপ করছিল দিদির কার্যকলাপ। অসীমদা একেবারে টাকা-আনা-পাই হিসেব করা মানুষ, দিদি কিছু কিনব বললেই কাঁটা হয়ে যায়।

আমাকে দেখামাত্র অসীমদার কপালের ভাঁজ উধাও। একগাল হেসে বলল,—এই তো, শাল কেনার আসল খরিদ্দার এসে গেছে। বলেই শালওয়ালাকে ডাক,—এই যে ভাই...এই...কী যেন নাম বললে তোমার?

—জি খুরশিদ, বাবুজি। খুরশিদ আলম।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, খুরশিদ। উর্দুতে খুরশিদ মানেটা কী যেন?

—জি সুরজ। সান্।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সুয্যিমশাই...তা শোনো সুয্যিমশাই, ওই দিদিকে ছেড়ে এবার এই দিদিকে শাল দেখাও। এ হল আসলি রইস। খুদ কামাতি হ্যায়। সংসারমে কুছ নেহি দেনা পড়তা। সব পয়সা শাড়িমে উড়াতা হ্যায়। পছন্দ করাতে পারলে ধড়াধ্ধড় তোমার পাঁচ সাতখানা শাল নেমে যাবে।

অসীমদার এ ধরনের রসিকতা আমার একটুও ভাল লাগে না। অসীমদার বদ্ধমূল ধারণা, চাকরি করাটা আমার নেহাতই শখ। কিছুতেই বুঝতে চায় না আজকালকার দিনে হাত পা ছড়িয়ে মনের মতো করে বাঁচতে চাইলে একার রোজগারে কুলিয়ে ওঠা কঠিন। কিংবা হয়তো বোঝে। হয়তো বা মনে মনে কিঞ্চিৎ খেদও আছে। তার এম-এ পাশ করা বউটি তো কস্মিনকালেও চাকরি বাকরির ধার মাড়াল না।

অন্য দিন হলে আমিও হয়তো পাল্টা হুল ফোটাতাম, সেদিন অবশ্য চটি নি। সত্যি সত্যি একটা দুটো শাল কেনার কথা তখন ঘুরছিল মাথায়। বিশেষ করে দীপকের জন্য একটা তো বটেই। বেশ কিছুদিন ধরে দীপকের গজগজ শুনতে হচ্ছে, তার একমাত্র শালখানা নাকি খসকুটে মার্কা হয়ে গেছে, আমি নাকি দেখেও দেখি না, ওই শাল গায়ে জড়িয়ে কোনও ভদ্রসমাজে নাকি বেরোনো যায় না। শুধুমাত্র একটা দেখনবাহার শালের অভাবেই দীপককে আজকাল শীতকালে নেমন্তন্নবাড়িতে প্যান্টশার্ট পরে যেতে হয়, হেন তেন।

আলগা ভাবে জিজ্ঞেস করলাম,—তোমার কাছে জেন্টস শাল আছে ভাই?

এমন একটা প্রশ্নর জন্যই বুঝি অপেক্ষা করছিল খুরশিদ। অসীমদার কথা শুনে ততক্ষণে সে ধরেই নিয়েছে নির্ঘাৎ আমি এক লোভনীয় কাস্টমার। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে একটা বিনয়ী নমস্কার,—জরুর হ্যায় দিদি। আইয়ে না দিদি, দেখিয়ে না, লেডিজ জেন্টস্ যা আপনার পসন্দ...

বসেই পড়লাম দিদির পাশটিতে। ঝোলা ঘেঁটে একের পর এক শীতবস্ত্র বার করে চলেছে খুরশিদ। খুলছে। মেলে ধরছে সামনে। কোনওটা বা জড়াচ্ছে নিজের গায়ে, বসে দাঁড়িয়ে পোজ্ দিচ্ছে নানা রকম। তাল মিলিয়ে চলছে প্রতিটি শালের গুণকীর্তন। রঙের। কারুকাজের। পশমের উৎকর্ষতার। কোন শালটির পিছনে কতদিনের মেহনত আছে তাও শোনাচ্ছে সবিস্তারে।

বেশ লাগছিল খুরশিদকে। শালওয়ালা আগেও দেখেছি। বিয়ের আগেই তো আমাদের বাড়িতে এক মধ্যবয়সী কাশ্মীরি আসত মাঝে মাঝে। খুব ভদ্র ছিল লোকটা, তবে বড্ড গম্ভীর। কথা বলত ভীষণ কম, তাও অতি নিচু গলায়, এবং মেপে জুপে। খুরশিদ মোটেই সেরকম নীরস নয়। সে বেশ প্রাণবন্ত। হাসিখুশি। কেজো সেল্‌সম্যানশিপের ফাঁকে ফাঁকে মেয়েদের জিনিস পছন্দ করা নিয়ে সরস মন্তব্য করছে টুকটাক। বাংলার সঙ্গে হিন্দি উর্দু কাশ্মীরি ইংরিজি মিশিয়ে। অসীমদার বিচিত্র রাষ্ট্রভাষাও সে উপভোগ করছে খুব। কাঁড়িখানেক শাল দেখার পরেও একটিও চোখে ধরল না বলে সে আদৌ বিরক্ত নয়, বরং আমাকে মনোমত জিনিস না দিতে পারার জন্য নিজেই লজ্জা প্রকাশ করল বার বার।

দিদিকে একটা শাল বেচে সেদিনের মতো তল্পিতল্পা গোটাল খুরশিদ। তবে আমার ঠিকানাটা নিয়ে নিল। সে নাকি আমাকে শাল পছন্দ করিয়েই ছাড়বে।

এবং বাড়ি খুঁজে খুঁজে পরের রবিবারই খুরশিদ হাজির। সেদিন একটা নয়, ভাড়া করা কুলির কাঁধে আরও একটি বোঝা। শাল ছাড়াও হরেক কিসিমের সম্ভার রয়েছে তাতে। কাশ্মীরি কাজ করা বেডকভার, নামদা, চিনন সিল্কের শাড়ি...ব্যবসা ব্যাপারটা ছোকরা ভালই বোঝে, আগের দিনই কথায় কথায় শুনে নিয়েছিল আমার মেয়ে সদ্য কলেজে ভর্তি হয়েছে, মনে করে তার জন্য ফিরহনও এনেছে খান কতক।

বলতে গেলে সেদিন থেকেই খুরশিদের সঙ্গে আমাদের ভাল মতো পরিচয়।

সেদিনই জেনে গেলাম খোদ শ্রীনগরেই বাড়ি আছে খুরশিদদের। পারিবারিক অবস্থা খুব দীনহীন নয়, বাপ জ্যাঠার পুরুষানুক্রমিক কারবার, এই শাল টালেরই। দোকানও আছে একটা শ্রীনগরে। বাপ মা জ্যাঠা জেঠি ভাই

বোন মিলিয়ে তাদের সংসারটিও বেশ বড়সড়। জিজাজি হঠাৎ মারা যাওয়ার পর দিদি ফিরে এসেছে, ভাগ্নে ভাগ্নিরাও মানুষ হচ্ছে তাদের পরিবারে। বছরে এই সময়টা শ্রীনগর ছেড়ে বেরিয়ে পড়াটা খুরশিদদের বংশানুক্রমিক অভ্যেস। বাপ জ্যাঠারাও শাল কাঁধে পাড়ি জমাত একসময়ে, কেউ দিল্লি, কেউ মুম্বাই, কেউ কলকাতা। এখন পালা পরের প্রজন্মের। তারা চরকি খায় এশহর ও শহর। কলকাতায় এই নিয়ে পঞ্চম বার এল খুরশিদ, এখনও নাকি এই বিশাল শহরটা তার ঠিক মতো সড়গড় হয় নি। তবে আর পাঁচটা কাশ্মীরির তুলনায় বাংলাটা সে ভালই রপ্ত করে নিয়েছে। অন্তত খুরশিদের তাই ধারণা।

দীপক জিজ্ঞেস করল,—পাঁচ বার এসেছ মানে? তোমার বয়স কত?

খুরশিদ বলল, জি থারটিওয়ান।

—বলো কী? তোমাকে দেখে তো কুড়ি বাইশের বেশি মনেই হয় না।

খুরশিদ লজ্জা পেল একটু,—কী যে বলেন বাবু? জানেন, আমার আট সালকা এক লেড়কা আছে। আফরোজ। লাস্ট ইয়ার এক লেড়কি ভি হল।

আমি ঠাট্টা করে বললাম,—কী করে এমন বাচ্চা বাচ্চা চেহারা রেখেছ বলো তো?

—ইয়ে হামারা কাশ্মীরকা জাদু আছে দিদি। কাশ্মীরে সহজে কারুর উমর বাড়ে না। কাশ্মীর জন্নত হ্যায়, জন্নত।

গল্পগুজবের ফাঁকে ফাঁকে ভালই বাণিজ্য করে ফেলল খুরশিদ। দু দুখানা শাল, একটা ফিরহন্, আর একখানা চিনন শাড়ি। একটা নামদাও প্রায় গছিয়ে ফেলেছিল, কোনওক্রমে কাটাল দীপক। ইনস্টলমেন্টই হোক আর যাই হোক, টাকা তো দিতে হবে! তাছাড়া আগের বছরই মির্জাপুরি গাল্‌চে এসেছে বাড়িতে, ফালতু ফালতু অপচয় করবই বা কেন!

তা, সে বছর কিস্তির টাকা নিতে আরও বার তিনেক আনাগোনা করল খুরশিদ। আমি তো চিরকালই গপ্পে, সেলস্‌ম্যান সেলস্‌গার্লদের সঙ্গে আমার দিব্যি জমে যায়। তুলনামূলক ভাবে দীপক আর বুবলি যথেষ্ট নাক উঁচু। চুজি। তাদেরও কিন্তু খুরশিদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। ওই জন্নত কাশ্মীর সম্পর্কে বাপ মেয়ে দুজনেরই অশেষ কৌতূহল। অজস্র ধরনের প্রশ্নবাণ হেনে যায় তারা, প্রফুল্ল মুখে জবাব দেয় খুরশিদ।

—আপ কেয়া ডাল লেক কে পাস হি রহতে হ্যাঁয়, খুরশিদভাই?

—নেহি বহিন, পাস নেহি। লেকিন নজদিক।

—পুরো ডাল লেক শীতকালে জমে বরফ হয়ে যায়, তাই না?

—বেশক্। বিলকুল সফেদ ময়দান বনে যায়। বচ্চেলোগ তো উসকি উপর সাইকেল ভি চালায়। খেলকুদ ভি করে।

—হ্যাঁ রে বুবলি। শীতকালে ডাল লেকের ওপর নাকি মোটরগাড়িও চলে। একবার তো জহরলাল নেহরু জিপ নিয়ে ঘুরেছিলেন। কী হে খুরশিদ, ঠিক বলছি?

—একদম ঠিক। কচ্চে উমর মে দেখেছি শেখসাহাব ভি ঘুমতেন লেকে। পয়দল।

—শেখসাহেব মানে শেখ আবদুল্লাহ্?

—জি বাবুজি।

—ওর পার্টিরই তো গভর্নমেন্ট এখন?

—জি।

—তোমাদের ওখানে পলিটিকাল সিচুয়েশন এখন কেমন? খুব গণ্ডগোল হচ্ছে, তাই না?

—হচ্ছে কোথাও কোথাও। তেমন খাস কিছু না। পলিটিকাল ঝামেলা কোথায় না হচ্ছে বাবুজি? দিল্লি-মে হচ্ছে, মুম্বই-মে হচ্ছে, আপনাদের বাঙাল মুলুকমে ভি...। দুড়ুম দুড়ুম কাজিয়া বাধে, বোম উম্ ফাটে, দোকানপাট বন্ধ থাকে...আবার সব খুলেও যায়। কাশ্মীরমে ভি ওইসাই।

—কিন্তু হঠাৎ শুরু হল কেন অশান্তি? অ্যাদ্দিন তো সব ঠিকঠাকই চলছিল?

—কৌন জানে বাবুজি? যাদের কামকাজ থাকে না তারাই জাদা হল্লাবাজি করে।

—লোকজন যাচ্ছে এখন কাশ্মীরে?

—জরুর যাচ্ছে। বহুৎ যাচ্ছে। এই শাল ভি তো সব হাউসবোট ফুল ছিল।

—হাউসবোটে থাকাটা দারুণ থ্রিলিং। কাশ্মীর যদি যাই আমরা কিন্তু হাউসবোটে থাকব বাবা।

—আরে, চলে আও না বহিন। আমার ফুফার হাউসবোট আছে, আমি

সব ইন্তেজাম করে দেব। খুব মজা আসবে। শিকারা চড়ে ঘুরবে, নাগিনা লেকে চলে যাবে। আগর দিল চাহে তো নাগিনা লেকে ভি থাকতে পারো। ওই সাইডটা মোর বিউটিফুল।

—বাহ্। চল্ রে বুবলি, ঘুরেই আসি। কখন যাবি? সামারে? না উইন্টারে?

—উইন্টারে হরগিস্ যাবেন না বাবুজি। কোথায় ঘুরবেন তখন? সারা ভ্যালিই তো তখন বরফের নীচে। আমাদের শ্রীনগরেই তো কম্ সে কম্ চার পাঁচ ফুট বরফ থাকে। তাছাড়া ঠিক সে কুছু দেখতেও তো পাবেন না। সারে কে সারে সফেদ।

—বলছ? তাহলে কাশ্মীর যাওয়ার বেস্ট টাইম কোনটা? মে-জুন?

—সামার-মে ট্যুরিস্ট লোগ আসে বেশি। লেকিন আমাকে যদি পুছেন তো বলব সেপ্টেম্বরে আসুন। কাশ্মীরকি খুবসুরতি তখন লা-জবাব। কিত্না ফুল, কিত্না কালার, পীর পাঞ্জাল কা বরফভি তখন মনে হয় কাচ্চা সোনা।

কাশ্মীরের গল্প শোনানোর সুযোগ পেলে খুরশিদ আর থামতই না। ঝলমল করে উঠত তার চোখ দুটো। কত ভাবেই যে বর্ণনা করত তার জন্নতের রূপ। বসন্ত সমাগমে কী রকম ধীরে ধীরে সরে যায় বরফ, কী ভাবে একটু একটু করে উঁকি দেয় নবীন পাতারা, রুক্ষ ডালপালায় সবুজের ছোঁয়া লাগে, ফিকে সবুজ কেমন করে গাঢ় হয় ক্রমশ, আঙুর আপেল আখরোটে ভরে ওঠে বাগিচা, জাফরান ক্ষেত সুবাসিত হয়, বাতাস কী ভাবে নেচে বেড়ায় উইলোর ঝাড়ে, বার্চ পাইন পপ্লারের বনে, চিনারের পাতা কাঁপে ঝিরঝির, পাহাড়ের ঢালে ফুটে ওঠে অগুন্তি রঙা গোলাপ...

মার্চ থেকে নভেম্বরের বর্ণনা শুনতে শুনতে বুবলি বিমোহিত। আমরাও। নাহ্, হিমাচল প্রদেশ, ইউ-পি, সিকিম, ভুটান অনেক হয়েছে, এবার একবার ভূস্বর্গে যেতেই হয়। শ্রীনগর গুলমার্গ সোনমার্গ পহেলগাঁও...। সিন্ধু ঝিলম লিদ্দার...।

আমাদের চোখে স্বপ্নের শুরমা মাখিয়ে দিয়ে খুরশিদ দেশে ফিরে গেল সেবার। মার্চের গোড়ায়।

দুই

কথায় বলে, ম্যান প্রপোজেস, গড ডিসপোজেস। সে বছর কাশ্মীর যাওয়ার ফুরসতই পেলাম না। মে জুনেও নয়, সেপ্টেম্বর অক্টোবরেও না।

দীপকের একটা প্রোমোশন হল সেবার। অফিসে দায়িত্ব বেড়ে গেল চতুর্গুণ। প্রতি সপ্তাহেই ট্যুরে যেতে হচ্ছে। ভুবনেশ্বর পাটনা রাঁচি গৌহাটি শিলিগুড়ি...। কাশ্মীর যেতে গেলে অন্তত দিন পনেরো কুড়ি টানা ছুটি চাই। আমার সরকারি চাকরি, আর্নড লিভের অসুবিধে নেই, কিন্তু দীপকের পক্ষে ছুটি শব্দটা উচ্চারণ করাই মুশকিল।

তা শীতের মুখে মুখে কাশ্মীরই ফের এসে গেল কলকাতায়। সঙ্গে আখরোট কিসমিস মেওয়া। শাল ফিরহন্ ছড়িয়ে বসার আগেই অনুযোগ জুড়ল,—আপনারা তো এলেন না দিদি? আমি কিন্তু আপনাদের ইন্তেজার করছিলাম।

মনে আফশোস থাকলেও হেসে বললাম,—যাব যাব। এ বছর হয়নি তো কী আছে, সামনের বছর যাব। নয় তো পরের বছর। কাশ্মীর তো পালাচ্ছে না।

—উও তো ঠিক হ্যায়। ফির ভি, এবার ঘুরে এলেই আচ্ছা হত।

—কেন? এবার কী স্পেশালিটি ছিল?

—ফুফাজিকে বলে এক বড়িয়া হাউসবোট ফিট করে রেখেছিলাম। পুরনো বোট, মগর অলগ ইজ্জৎ আছে।

—কী রকম?

—আপলোগ কাশ্মীর কি কলি জরুর দেখেছেন? শাম্মী কাপুর? শর্মিলা টেগোর?

—হ্যাঁ। তো?

—শর্মিলা টেগোর তিন রোজ ওই হাউসবোটে ছিলেন।

হেসে ফেললাম। নিচু গলায় দীপককে বললাম,—কী গপ্পো ঝাড়ছে গো? ওর ফুফার হাউসবোটে শর্মিলা ঠাকুর?

—পুরো ঢপ। দীপকও গলা নামিয়েছে,—ওরা এসব বলে খুব আনন্দ পায়।

—তাই না তাই। কোন্ কালের ছবি, এখন হয়তো সেই হাউসবোটের কোনও অস্তিত্ব নেই।

আমাদের চাপা স্বর সঠিক অনুধাবন করতে পারছিল না খুরশিদ। চোখ পিটপিট করে বলল, —ইস্ বার ভি কিতনা শুটিং চল্ রহা থা। ডাল লেকমে, নাশিমবাগমে...অনিল কাপুর শ্রীদেবী সানি দেওল গুলশন গ্রোভার...

—ফিল্মের কথা ছাড়ো। ঠোঁট টিপে বললাম,—তোমার ঘর গেরস্থালির কথা বলো। সব ঠিকঠাক ছিল তো?

—অ্যাইসে তো ঠিক হি হ্যায়। সিরিফ্ আমার নানিজি মরে গেলেন।

—তোমার মা'র মা?

—হাঁ দিদি। আফশোস। শ' সাল পুরা হোতে ছে-মাহিনা আর বাকি ছিল।

—তা হলে তো বয়স হয়েছিল?

—আমাদের কাশ্মীরে শ' সাল বাঁচা তো এমন কিছু জাদা নয় দিদি। মেরা নানাজি তো সেনচুরি করকেই গয়েঁ।

—হুম্। তোমার মা ভাল আছেন তো?

—হাঁ দিদি।

—বিবি?

—ঠিক হ্যায়। ঘরকা কাজকামমে বিজি আছে।

—আর ছেলে মেয়ে?

—আফরোজ ইবার ফোর্থ ক্লাসে উঠল। বহুৎ শয়তান হয়েছে। পড়াইমে দিলচস্পি নেহি, খালি খেলা করবে।

—কী খেলে? ফুটবল? ক্রিকেট? না ডান্ডাগুলি?

—কিরিকেট। কপিলদেবকা বহুৎ ফ্যান হ্যায়।

দীপক দুম করে জিজ্ঞেস করে বসল,—শুধু কপিলদেবের ফ্যান? ইমরান, আক্রামের ভক্ত নয়?

একটু বুঝি হোঁচট খেয়ে গেল খুরশিদ। পরক্ষণে ঘাড় নেড়ে বলল,—হাঁ হাঁ, ওদেরও ফ্যান। যে প্লেয়ার জোর জোর বল করে আর ঠাঁইঠুঁই ব্যাট

চালায়, হামার আফরোজ তাকেই জাদা পসন্দ করে।

দীপকের প্রশ্নের সুর যেন বিদ্রূপ ঘেঁষা। যেন খুরশিদকে একটু অপ্রস্তুত করার চেষ্টা করল দীপক। খুরশিদকে যেন বাজিয়ে দেখতে চাইল কাশ্মীরিদের মধ্যে কতটা পাকিস্তানপ্রীতি ঘাপটি মেরে আছে।

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিলাম আমি। বললাম,—আর তোমার মেয়ে কার ভক্ত? তোমার?

—জরুর। ও তো বাপ কি বেটি। ঘরে থাকলে হামাকে এক মিনিট ছোড়ে না।

সামান্য বুঝি আনমনা দেখাল খুরশিদকে। হাসছে, কিন্তু দূরমনস্ক চোখে ফুটে উঠেছে পিতৃত্বের চিরন্তন মায়া। স্মিত মুখেই বলল,—শাহিন তার দাদাজির ভি বহুৎ ফ্যান আছে। দাদাজি দুকান গেলেও সাথ সাথ যেতে চাইবে।

বুবলির ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। দীপক যতক্ষণ বাড়ি আছে, ফেভিকলের মতো তার গায়ে সেঁটে আছে আর দীপক না থাকলে দীপকের বাবা। শ্বশুরমশাই বিকেলে ক্লাবে তাস খেলতে যাবেন, সেখানেও বুবলির যাওয়া চাই।

সে বছর শুধু গল্পগাছাই হল, শাল টাল তেমন রাখা হল না। কলকাতায় শীত কোথায় যে বছর বছর শাল কিনব! তাও খুরশিদের উপরোধে একখানা নাম্‌দা নিতেই হল। সাদার ওপর লাল নীল হলুদ সবুজে জংলা লতাপাতা। ইরানি কাজ। চেনাজানা কয়েকজনের ঠিকানাও দিলাম খুরশিদকে। আমার সুবাদে আর কোথাও বাণিজ্য করে নিতে পারে তো করুক।

খুরশিদের সঙ্গে এভাবেই একটু একটু করে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছিল। ছুটির সকালে এদিকে এলেই আমাদের বাড়ি চলে আসত, চা-টা খেত, বকবক করত খানিক। কত হাবিজাবি গল্প যে করত! ওদের কাশ্মীরে নাকি ঋতুচক্রের দুটো মাত্র ভাগ! এক, যখন চিনারগাছে পাতা আছে। দুই, যখন চিনারগাছে পাতা নেই। চিনারের পাতার রঙই নাকি ওদের বলে দেয় এবার মুলুক ছাড়ার সময় ঘনিয়ে এল। চিনার পাতা ঝরে গেলেই ঘুমিয়ে পড়ে গোটা উপত্যকা, আবার জাগে যখন নতুন পাতা আসে। গুটিগুটি পায়ে তখনই ঘরে ফেরে খুরশিদরা। আশ্চর্য, যে চিনারগাছ কাশ্মীরিদের নয়নের মণি, তা নাকি আদৌ

কাশ্মীরের নয়। মুঘল বাদশা আকবর নাকি ইরানদেশ থেকে এ গাছের চারা এনেছিলেন। আরও বহু জায়গায় নাকি বসানোর চেষ্টা করেছিলেন চিনার গাছ, কিন্তু কাশ্মীর ছাড়া আর কোথাও নাকি এ গাছ বাঁচে নি।

আরও একটা প্রিয় বিষয় ছিল খুরশিদের। গোলাপ। ইরান ছাড়া আর কোথাও নাকি কাশ্মীরের মতো গোলাপ ফোটে না। দুনিয়ায় বসরাই গোলাপের পরেই কাশ্মীরি গোলাপের স্থান।

খুরশিদের কল্যাণে আর কত কী যে জেনে ফেললাম আমরা। পৃথিবীর সব চেয়ে মিঠা শবনম নাকি কাশ্মীরের মাটিতেই ঝরে পড়ে। আসলি চিনন শাড়ি নাকি একটা কাঠবাদামের খোলার মধ্যে অবলীলায় পুরে ফেলা যায়। কোন্ এক দুষ্প্রাপ্য ছাগলের ঝরে পড়া লোমে তৈরি পশমিনা শাল নাকি সাইবেরিয়ান ফারকোটকেও উষ্ণতায় হার মানায়।

শুনতে শুনতে ছটফট করি সেই স্বপ্নের উপত্যকায় যাওয়ার জন্য। চোখের সামনে ছবির মতো দেখতে পাই ভোরের কুয়াশা মাখা ডাল হ্রদ, শিকারায় চড়ে ফুল বেচতে এসেছে হুরিপরির মতো কাশ্মীরি বালিকা, ফুলে ফুলে বর্ণময় শালিমার, নিশাতবাগ, চশমেশাহি...

তিন

কাশ্মীর আমাদের যাওয়া হল না।

প্রতি বছরই কোনও না কোনও বাধা পড়ে যায়। হয় বুবলির পরীক্ষা, নয় দীপকের অফিস। এক বছর আমার শরীর খারাপ, তো কোনও বছর উটকো সাংসারিক সমস্যা।

ওদিকে কাশ্মীরের অবস্থাও দ্রুত বদলাচ্ছিল। কাগজ পড়ে, টিভি খুলে শিউরে উঠি। আজ এখানে বোমা বিস্ফোরণ, কাল ওখানে জঙ্গি সন্ত্রাস...। কোনও দিন দশজন মরছে, কোনও দিন বিশজন, রোজ কিছু না কিছু গণ্ডগোল লেগেই আছে। ক্রমশ অস্থির থেকে অস্থিরতর হয়ে উঠছে জন্নত।

তার মধ্যেও খুরশিদ আসছিল প্রতি বছর। একটু একটু করে মুখের হাসিটা তার নিবে আসছিল, তবুও। গোলমালের কথা উঠলে আগের মতো

উড়িয়ে দিতে পারে না বটে, তবে জোর গলায় বলে, এমনটা নাকি বেশি দিন চলতে পারে না, আবার আগের মতো হয়ে যাবে কাশ্মীর।

আমারও এরকমটাই ভাবতে ভাল লাগত। দীপক অবশ্য বলত অন্য কথা। তার ধারণা কাশ্মীর একটা অসম্ভব স্পর্শকাতর স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট, কোনও বিগ পাওয়ারই চায় না ওখানে শান্তি আসুক। কাশ্মীরের আগুন সহজে নিববে না।

সে বছর খুরশিদ হঠাৎ অসময়ে আবির্ভূত হল কলকাতায়। পুজোর আগে। আমি বেজায় অবাক। বললাম,—কী গো, তোমার চিনার গাছের পাতারা কি এবার তাড়াতাড়ি হলুদ হয়ে গেল? নাকি খিলানমার্গে সেপ্টেম্বরেই বরফ পড়ছে?

খুরশিদকে রীতিমত বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। শুকনো মুখে বলল,—নেহি দিদি। বরফ গিরছে নসিব কা উপর।

—নতুন করে আবার কী হল?

—বহুৎ প্রবলেমে পড়ে গেছি দিদি। বিজনেসের হাল খুব খারাপ। টাউন জুড়ে পুলিশ মিলিটারি, হপ্তায় দো দিন তিন দিন স্ট্রাইক...বেচাকেনা বিলকুল হচ্ছে না। দুকান বন্ধ রাখলে পুলিশ মিলিটারি শাসায়, খুলা রাখলে জান লিয়ে টানাটানি। কেয়া করেঁ কুছ্ সমঝমে নেহি আতা।

—তাই চলে এলে?

—কী করব থেকে? ট্যুরিস্ট ভি তো নেই। ফুফাজি-কা কারবার ভি চৌপাট, হাউসবোট সুনা পড়ে আছে। দো ফরেনার এসেছিল, এক হপ্তে-কা অন্দর তারাও ভাগল। হয়রান হয়ে ফুফালোগ মহুরা চলে গেল, গাঁওমে। খুরশিদ ফোঁস করে শ্বাস ফেলল,—হামলোগকা ফ্যামিলি-কা হালত্ ভি ঠিক নেহি। তাউজিরা সব সেপ্রেট হয়ে গেল।

—সে কী?

—হাঁ দিদি, ক্রাইসিস কা টাইম-মে শায়দ অ্যাইসা হি হোতা হ্যায়। পেট ঠাণ্ডা আছে তো দিমাক ভি ঠাণ্ডা, নেহি তো খুন কা রিস্তা ভি খতম। তাউজি কা লেড়কালোগ অলগ্ বিজনেস শুরু করে দিল। টিম্বারকা। ঘরমে পার্টিশান উঠে গেছে।

—ওহ্ হো, এ তো সত্যিই খুব খারাপ খবর।

—আব্বাজান তো বহুৎ আপসেট হয়ে গেছেন। বড়াভাইকো ইত্না ইজ্জৎ করতে থেঁ...।

—কী করবে বলো, সংসারের এরকমই নিয়ম। বিপদের সময়ে সবাই স্বার্থ দেখে, কে আর শ্রদ্ধা ভক্তির তোয়াক্কা করে!

একটুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থেকে ধীরে ধীরে গাঁঠরি খুলছে খুরশিদ। সামান্য অস্বস্তিতেই পড়ে গেলাম। পুজোর মুখে আবার এখন কেনাকাটা?

মিনতির ভঙ্গিতে বললাম,—এখন শাল টাল আর বের করো না খুরশিদ। যা প্যাচপেচে গরম, ভেবেই আতংক হচ্ছে।

—শল আনি নি দিদি। শল হ্যয়া কাঁহা? কারখানা তো বন্ধ।

—তো কী এনেছ? সেই তোমার লুধিয়ানার সোয়েটার কম্বল?

—ও ভি নেহি দিদি। ও চিজ ভি এখন কলকাত্তামে চলবে কেন? খুরশিদ ম্লান হাসল,—ইখানে জান পহেচান তো আছে, মহাজন লোগদের কাছ থেকে কুছ শাড়ি কাপড়া তুলে নিলাম। পুজোর টাইমে আপনারা বহুৎ চিজ খরিদ করেন, হামার কাছ থেকে ভি দু চার পিস্ লিয়ে লিন।

ভারী মায়া হল খুরশিদের ওপর। বেচারার চেহারাটাও কেমন ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে। ঔজ্জ্বল্য কমে আসা মুখে কালচে ছায়া, ঠেলে উঠছে গালের হনু, চোখ দীপ্তিহীন।

বললাম,—ঠিক আছে, কী এনেছ দেখি।

শাড়িগুলো বার করতেই নাক কুঁচকে গেল। সবই প্রায় সিন্থেটিক। সস্তার। এই সব শাড়ি বেচতে এসেছে খুরশিদ? হায় রে, পারস্যের রাজকুমারের এই অধঃপতন?

খুরশিদ কমলা রঙের একখানা কাপড় এগিয়ে দিল,—এঠো আপ রাখ্ লিজিয়ে দিদি। আপনাকে বহুৎ মানাবে।

ইশ্ এই ক্যাটকেটে রঙের শাড়ি পরব আমি? হাতে করে এশাড়ি কাউকে দেওয়াও যাবে না।

জিজ্ঞেস করলাম,—আর কিছু নেই? অন্য টাইপের? সিল্ক টিল্ক?

—ম্যাহেঙ্গা কাপড়া তুলতে পারি নি দিদি। জাদা ক্যাশ ছিল না। হামলোগকো তো উধার দেনে মে...। খুরশিদ হঠাৎ চুপ করে গেল। একটু পরে গলা নামিয়ে বলল,—বিবিকে নিয়ে এসেছি দিদি। ডক্টর দিখানে। উসকা

ভি তো খরচা আছে।

চমকিত হলাম,—তোমার বউ এসেছে? আগে বলবে তো?

খুরশিদের মুখে অপ্রস্তুত হাসি,—উন্‌কা পেটমে একটো দর্দ্ হচ্ছে। ভাবলাম কলকাত্তার ডক্টর দেখিয়ে দিই। বাচ্চেলোগ ভি আয়া। উধার তো স্কুল উল সব বন্‌ধ পড়া হ্যায়, সোচলাম ও লোগ ভি সাথ সাথ চলুক।

—ও মা, ফুল ব্যাটেলিয়ান নিয়ে এসেছ? আগে বলবে তো। কোথায় উঠেছে ওরা?

—চাঁদনি চউককে বগলমে। ছে মাহিনেকে লিয়ে এক কামরা কিরায়াপে নিয়ে নিলাম।

—খুব ভাল করেছ। একদিন নিয়ে এসো সবাইকে। দেখি ওদের।

—জরুর আনব দিদি। হামার বিবি আপনার কথা বহুৎ শুনেছে। তবে উয়ো তো ঘরসে জাদা নিকলতি নেহি। লোজ্জা পায়।

—তো কী আছে? দিদির কাছে আসবে...

—বিলকুল সহি। দো চার দিন যেতে দিন, নয়া শহরমে জরা অ্যাডজাস্ট করে নিক...

খুরশিদের বিবির অনারে রেখেই দিলাম একটা শাড়ি, হাল্‌কা রঙের। গড়িয়াহাটে সাড়ে তিনশোয় পেতাম, খুরশিদ একটু বেশিই নিল। দরাদরি করলাম না। যাক গে, বেচারা চাপে আছে, না হয় দু পয়সা বেশি লাভ করল।

ছুটির সকালে আড্ডা মারতে বেরিয়েছিল দীপক। ফিরতেই তাকে শোনালাম খুরশিদ সমাচার। দীপক শুনে তেমন প্রীত হল না, সন্দিগ্ধ স্বরে বলল,—কাশ্মীরিদের এরকম অডটাইমে কলকাতা আসাটা খুব নর্মাল ঘটনা নয়। স্পেশালি বউবাচ্চা নিয়ে চলে আসাটা।

—আহা, ও তো বউকে ডাক্তার দেখাতে এনেছে।

—স্টিল...শুনেছ কখনও কাশ্মীরি শালওয়ালা বউ নিয়ে এসেছে? আই থিংক সামথিং ইজ রং।

—কী রং?

—অনেক কিছু হতে পারে। চোখ কান খোলা রাখো না? দেখতে পাও না, কাশ্মীরে এখন ঘরে ঘরে এক্সট্রিমিস্ট?

—কী পাগলের মতো যা তা বলছ? আমাদের খুরশিদ এক্সট্রিমিস্ট? ওঁর

সঙ্গে এতকাল কথা বলেও বোঝনি ও একজন ফ্যামিলিম্যান?

উগ্রপন্থীরা কি আকাশ থেকে নামে? তাদেরও ফ্যামিলি থাকে। বাপ মা ভাই বোন বউ বাচ্চা...। খুরশিদ নিজে ইনভলভড্ না হলেও তার কানেকশন থাকতে পারে।

—যাহ্ আমি বিশ্বাস করি না।

—কোরো না। বাট বি প্র্যাকটিকাল। বি র‍্যাশনাল। সত্যি করে বলো তো খুরশিদকে তুমি কতটুকু চেনো? বছরে পাঁচ সাতটা দিন আসে, কিছু ধসায়, কিছু মিষ্টি গপ্প শোনায়, ব্যস। ওর ফ্যামিলি সম্পর্কে ও যা বলেছে তুমি সেইটুকুই জানো। এমন হওয়া কি নেহাতই অসম্ভব, ওদের ফ্যামিলির কেউ জঙ্গিদলে নাম লিখিয়েছে? পুলিশ হয়তো বাড়িশুদ্ধ সবাইকে হুড়কো দিচ্ছিল, তাই হয়তো পিঠ বাঁচাতে...?

এবার যেন অত জোর করে না বলতে পারলাম না। আপনা আপনি মাথা দুলে গেল,—তা অবশ্য ঠিক। তবে...।

—তবে টবে নয়। কে বলতে পারে খুরশিদের ছেলেটাই উগ্রপন্থী দলে ভেড়ে নি?

—ধ্যাৎ, দিস ইজ টু মাচ। খুরশিদের ছেলে কতটুকুনি? হার্ডলি বারো কি তেরো।

—ওই বয়সের ছেলেরাই বেশি গালিবল্ হয়। তাদের তাতিয়ে দেওয়াটাও সোজা। খবরে দ্যাখো না, কত বাচ্চা বাচ্চা ছেলে গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে?

অস্বীকার করার উপায় নেই। এই তো কদিন আগে একদল সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়ল কাশ্মীরে, তাদের মধ্যে দেবশিশুর মতো দেখতে কয়েকটা কিশোরও তো ছিল। কী সব ভয়ংকর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে তাদের কাছ থেকে। মর্টার গ্রেনেড কার্তুজ রাইফেল রকেটলঞ্চার...

দীপক আজকাল ধূমপান প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। হঠাৎ ফস করে অসময়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলল। বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলল,—শোনো, খুরশিদ তোমায় যতই দিদি দিদি করুক, ভুলে যেও না ও কাশ্মীরি। এবং ওদের মদত আছে বলেই জঙ্গিরা জো পেয়ে গেছে। ...খুরশিদ কেমন, তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা করে আমাদের লাভ নেই। তবে ওর সঙ্গে বেশি মাখামাখি করাটা

বোধহয় আর ঠিক নয়।

—আহা, মাখামাখিটা কী করি? অ্যাদ্দিন ধরে বাড়িতে আসছে, হেসে দু চারটে কথা বলি। তার বেশি তো কিছু নয়।

—ওইটুকুই ঠিক আছে। অভদ্র হওয়ার দরকার নেই। তবে বি ফরমাল। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে এলে বেশি আহ্লাদ কোরো না। অবশ্য আদৌ যদি নিয়ে আসে।

—আনবে না কেন? না আনার কী আছে?

—দ্যাখো কী করে। ওরা তো খুব পরদা টরদা মানে। পর্দানশিন বউকে হুট করে একটা হিন্দুর বাড়িতে এনে হাজির করবে...আই ডাউট। আর ছেলেটার যদি কোনও ব্ল্যাক স্পট টট থাকে তো হয়েই গেল। রাস্তায় ঘাটে ওকে থোড়াই বেশি বার করবে!

কিছুতেই মন থেকে মানতে পারছিলাম না কথাগুলো। আবার একটা কূট সংশয় ঘোরাফেরাও করছিল মনে। একসঙ্গে দুটো স্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। একটা স্বর চেঁচিয়ে বলছিল, অসম্ভব অসম্ভব। অন্য স্বর মৃদু ভাবে বিনবিন করছিল, হতে পারে, হতে পারে, হতেও তো পারে।

খুরশিদ বউ বাচ্চা নিয়ে এল না।

সে বছর আর দর্শনই মিলল না খুরশিদের।

চার

শুধু সেবার নয়, খুরশিদ পরের বছরও গরহাজির। তার পরের বছরও।

ইতিমধ্যে বাড়িতে একটা বড়সড় অনুষ্ঠান লেগে গেল। বুবলির বিয়ে।

কলেজের এক সহপাঠীর সঙ্গে অনেক দিন ধরে ভাবসাব চলছিল বুবলির। মৈনাক। বেশ ঝকমকে ছেলে। আমাদেরও মৈনাককে খুব পছন্দ। তবে আজকালকার ছেলেমেয়েরা কেরিয়ার আর ভবিষ্যত নিরাপত্তা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। মৈনাক মনের মতো একটা চাকরি পায় নি বলে ওদের বিয়ের ফুলটা ফুটি ফুটি করেও ফুটছিল না। চেন্নাইতে একটা বহুজাতিক

কোম্পানীতে অফার পেয়ে তবে ছাদনাতলায় যেতে রাজি হল মৈনাক।

তা বিয়ে কি যে সে ব্যাপার, বিয়ে মানে মহাযজ্ঞ। ঘুরে ঘুরে মার্কেটিং করো রে, গয়না গড়াতে দাও রে, ফার্নিচারের অর্ডার দিতে ছোটো, বিয়েবাড়ি বুক করো, কেটারিং, ডেকরেটার, গাড়ির আয়োজন, নেমন্তন্নর লিস্ট, এবং চরকির মতো ঘুরে ঘুরে আমন্ত্রণ জানিয়ে বেড়ানো। কাজের সঙ্গে সঙ্গে টেনশনও চলে অবিরাম। কোথাও কোনও গোল পাকাবে না তো? ভাল মতন উৎরোবে তো বিয়েটা?

খুরশিদের কথা তখন আর আমাদের মাথাতেই ছিল না। থাকার কথাও নয়। সে আর এমন কী ইম্পর্ট্যান্ট ব্যক্তি? তবে কাশ্মীরে অশান্তি চলছেই, উত্তরোত্তর বাড়ছে বই কমছে না। শ্রীনগরের কোনও কোনও খবর ক্বচিৎ কখনও স্মরণে এনে দেয় খুরশিদের মুখ। পুলিশ মিলিটারির পাশাপাশি জঙ্গি আর সাধারণ মানুষও মারা যাচ্ছে প্রায়ই, কাগজে সেভাবে হতাহতের তালিকাও বেরোয় না। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, ওই সব মৃতদেহের ভিড়ে খুরশিদ নেই তো? বুকটা একটু খচখচও করে কখনও সখনও। খুরশিদকে কি চিনতে ভুল করেছিলাম?

বুবলির বিয়েটা হল অঘ্রানের গোড়ায়। অনুষ্ঠান চোকার পর দুম করে হঠাৎ সব ফাঁকা হয়ে গেল। অফিস যাই, বাড়ি আসি, ফিরে স্বামী স্ত্রী মুখোমুখি বসে থাকি ফ্ল্যাটে। বুবলি যে আমাদের কতখানি ছিল টের পাই প্রতি মুহূর্তে। খাবারে স্বাদ পাই না, বই উল্টোতে ভাল লাগে না, অকারণে টিভির চ্যানেল ঘোরাই...একটা বিশ্রী শূন্যতা যেন গ্রাস করে ফেলছিল আমাদের।

মন ভাল করার জন্যে দুজনে কদিন বেড়িয়ে এলাম। পুরী থেকে। বলা যায় সে আমাদের দ্বিতীয় মধুযামিনী। বালুকাবেলায় বসে ঢেউ গোনা আর স্মৃতি রোমন্থন—এছাড়া আর কীই বা করার থাকে আমাদের মতো হঠাৎ একলা হয়ে যাওয়া মধ্যবয়সী দম্পতির?

তাও খানিকটা তরতাজা হলাম বৈকি। ফিরে এসে আবার শুরু হল দিনগত পাপক্ষয় একটু একটু করে ফিরছি পুরনো বৃত্তে। অফিসের। বন্ধু-বান্ধবদের। আত্মীয়স্বজনের।

তখনই হঠাৎ একদিন খুরশিদের উদয়।

দারুণ চমকেছি। যতটা না খুরশিদকে দেখে তার চেয়ে বেশি খুরশিদের

চেহারার পরিবর্তনে। অনেকটা বয়স বেড়ে গেছে খুরশিদের, যুবক যুবক সেই ভাবটাই আর নেই। মাত্র দু বছরে এত বুড়ো হয়ে যায় মানুষ? জন্নতের বাসিন্দারাও?

খানিকটা থতমত খেয়েই দাঁড়িয়ে ছিলাম। চটকা ভাঙল খুরশিদের হাসিতে। গাল ছড়ানো হাসি, অনেকটা সেই পুরনো ঢঙের।

ঘাড় ঝুঁকিয়ে খুরশিদ বলল, —নমস্তে দিদি। কেমন আছেন?

—চলছে একরকম। এসো এসো, ভেতরে এসো।

দীপক অন্দরে দাড়ি কামাচ্ছিল। ড্রয়িংরুমে এসে সেও অবাক। বলল,—কী ব্যাপার, কোথায় ছিলে এতদিন?

মাঘের গোড়ায় শীতটা হঠাৎ কমে গেছে। মৃদু মৃদু ঘামছিল খুরশিদ। কাঁধের বোঝা নামিয়ে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে বলল,—ঘরেই ছিলাম বাবুজি। তবিয়ত ঠিক ছিল না, তাই পিছলে দো সাল আসতে পারি নি।

—কী হয়েছিল?

—বুখার, খাঁসি, হাতে পায়ে জোর পেতাম না...

—টিবি?

খুরশিদ মাথা নামাল,—হাঁ বাবুজি। ওই রকমই।

—তো বেরিয়েছ যে আবার?

—আভি ঠিক আছি। ফিট...আপলোগ কাঁহা থে বাবুজি? আমি একবার ফিরে গেছি।

—একটু বাইরে গেছিলাম। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল তো, মন ভাল লাগছিল না।

—বহিনের শাদি হয়ে গেল? খুরশিদের চোখে নিখাদ বিস্ময়,—সচ্? কব?

—এই তো, দু মাস পোরে নি। বুবলি এখন বরের সঙ্গে চেন্নাইতে।

—ইশ, জরা আগে এলে ভাল হত। বহিনের শাদি দেখতে পারতাম।

—হ্যাঁ, বুবলিও তোমার কথা বলছিল।

নেহাতই ভদ্রতা করে বলা। শুনে ভারী খুশি হল খুরশিদ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করছে বুবলির শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে। আগের মতো উচ্ছ্বাস নেই বটে, তবে আন্তরিকতাটা আছে। দেখে আমার প্রাথমিক আড়ষ্টতাটা কেটে যাচ্ছিল।

মনের মধ্যে পুষে রাখা প্রশ্নটা করেই ফেললাম,—সেবার তুমি কোথায় ভ্যানিশ করে গেলে বলো তো? বিবি বাচ্চা নিয়ে আসবে বলেছিলে...?

—গুস্তাকি মাফ করবেন দিদি। শ্রীনগরসে অচানক বুরা খবর এল, আব্বাজানের স্ট্রোক হয়েছে।

—তাই বলো। দীপকের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিলাম,—এখন কেমন আছেন তিনি?

—নেই। ইন্তেকাল হয়ে গেল। স্ট্রোক্‌কা দুসরা দিনই।

—ও। ...বাড়ির আর সবাই...?

—আছে। আব্বাজানকে গুজর যানে কে বাদ আম্মিকে হাল বি কুচ খাস নেহি। টেনশান সবকো খা যা রহা হ্যায়।

—তোমার বিবির সেই ট্রিটমেন্ট হল?

—ঠিকসে আর হল কই দিদি! ওখানেই হাকিমজিকা দাওয়াই চলছে। কেয়া করে, তকদিরমে যো লিখা হ্যায় ওহি হোগা। নেহি তো আব্বাজান ওরকম চলে যাবেনই বা কেন? আমিও কেন বিমারিতে পড়ে যাব?

দীপক সোফায় বসেছে। বলল,—তোমাদের ওখানকার গণ্ডগোল থামারও তো কোনও লক্ষণ নেই!

—না বাবুজি। ইস্ হালমে হি সব কুছ চালাতে হবে।

—বিজনেসের অবস্থা কেমন এখন? একই?

—থোড়া বেহতর হুয়া। ফ্যাক্টরিমে থোড়া বহুৎ কাম হচ্ছে। আদমি কিতনা দিন ভুখা থাকবে বাবুজি? মেরা লেড়কা ভি এখন কামে লেগে গেছে। দুকানমে। মেরা ছোটা ভাইকে সাথ।

কথা প্রসঙ্গে নিজের বাড়ির কিছু শুভ সংবাদও দিল খুরশিদ। তার ভায়ের বউয়ের একটা ছেলে হয়েছে, ছোট বোনের বিয়ের ঠিক হয়েছে জম্মুতে, পাত্র সরকারি চাকরি করে, এই বসন্তেই শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে নাজনিন।

কী আশ্চর্য! যেখানে সারাক্ষণ গোলাগুলি চলছে, বাতাসে অহরহ বারুদের ঘ্রাণ, সেখানেও জীবন থেমে নেই! জন্ম মৃত্যু বিয়ে সুখ অসুখ সবই তো চলছে! আপন লয়ে! নিজস্ব ছন্দে!

গল্প শোনাতে শোনাতেই খুরশিদ কাজে নেমে পড়েছে। বলল,—এবার

আপনাকে একটা শল দিখাই?

মনে মনে বললাম, শাল তো গাদা জমে গেছে, আর নিয়ে কী করব?

মুখে বললাম,—কী রকম শাল এনেছ?

খুঁজে খুঁজে তলার দিক থেকে খুরশিদ একখানা চন্দনরঙা শাল বার করল। চন্দনরঙেরই সুতো দিয়ে অলওভার কাজ। বলল,—ইস চিজ কো দেখিয়ে। একদম আনকমন। আমার দিদি নিজের হাতে বানিয়েছেন। বহুৎ মেহনত হয়েছে।

শালখানা সুন্দর তো বটেই, হাত বুলিয়ে বুঝলাম যথেষ্ট মহার্ঘও। তবু জিজ্ঞেস করলাম,—দাম কত?

—দাম নিয়ে আপনি ভাববেন না দিদি। রেখে দিন।

—তবু শুনি দামটা?

—অন্য কাস্টমার হলে তিন হাজার। আপনি যা খুশি দেবেন।

—সর্বনাশ, এত টাকা দামের শাল দিয়ে আমার কী হবে?

—গায়ে ওড়াবেন। আমার এক দিদি বানিয়েছে, ঔর এক দিদি পরবে।

বেশি আপত্তি করার সুযোগই দিল না খুরশিদ। শালখানা প্রায় জোর করে গুছিয়ে রেখে দিল পাশে।

খুরশিদ চলে যাওয়ার পর দীপক মিটিমিটি হাসছে,—কী, গ্যাস খেয়ে ক্ষুদিরাম বনে গেলে তো?

—মানে? আমি চোখ কুঁচকোলাম।

—কলকাতার শীতে তিন হাজার টাকা দামের শাল তুমি কোথায় পরবে?

—পরব না। আলমারিতে সাজিয়ে রাখব। বুবলিকে দিয়ে দেব। বলেই বাঁকা সুরে প্রশ্ন ছুঁড়লাম,—খুরশিদ সম্পর্কে তোমার ভুলটা ভেঙেছে তো? বুঝলে, তোমার মন্তব্যগুলো কত অসার ছিল?

দীপক উত্তর দিল না। শুধু আলগা ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল।

পাঁচ

মাসখানেকও বোধহয় কাটে নি, হঠাৎই এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

সে বছর শীতটা গিয়েও আবার ফিরে এসেছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে বাতাস বইছিল কনকনে, হাঁড় কাঁপানো। লেপকম্বল আবার পাড়তে হয়েছিল লফ্‌ট থেকে। বাসে ট্রামে অফিসে রাস্তায় সর্বত্র বেখাপ্পা আবহাওয়ার আলোচনা।

সন্ধেবেলা সেদিন তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছিল দীপক। আমি ঢোকার পর পরই দুজনে শাল মুড়ি দিয়ে মৌজ করে কফি খাচ্ছি, তখনই দরজায় বেল।

খুরশিদ।

বিকেল সন্ধের দিকে কখনওই আসে না খুরশিদ। অবাক হয়ে বললাম, —তুমি?

হাঁপাচ্ছিল খুরশিদ। মুখ থমথম করছে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,—আমি ঘর চলে যাচ্ছি দিদি। আভি। রাতকি গাড়িমে।

খুরশিদের পোশাক আশাকও আজ অন্যরকম। প্যান্টশার্টের বদলে শিলওয়ার কুর্তা, কাঁধে গাঁঠরির বদলে কিটস ব্যাগ, এবং হাতে একটি স্যুটকেস।

আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম,—আজই ফিরছ মানে? হঠাৎ কোনও খবরটবর এসেছে নাকি?

—নেহি দিদি। লেকিন আমি আর একদিনও থাকব না। আর বিজনেস করব না এখানে।

দীপকের চোখ কুঁচকে গেল,—কেন? হলটা কী?

—কেয়া কহুঁ বাবুজি, আপনারাই হামাদের থাকতে দিচ্ছেন না।

—মানে?

খুরশিদ উত্তেজিত স্বরে বলল,—কাল রাতকো অচানক পুলিশ এসে ডেরায় হামলা করল। সাত আদমিকে তুলে নিয়ে গেল। কিতনেবার বললাম

আমরা বহুৎ সাল সে কলকাত্তা আসছি, আমাদের বহুৎ সারে কাস্টমার আছে, শুনলই না। পিটল আমাদের। কৌন এক মকবুল নামকা টেররিস্ট কলকাত্তামে আয়া হ্যায়, আমরা নাকি তাকে ছুপিয়ে রেখেছি...। আপলোক হি বোলিয়ে, অ্যাইসা সোচনা কেয়া সহি হ্যায়?

—আহা, এত এক্সসাইটেড হচ্ছ কেন? দীপক খুরশিদকে শান্ত করতে চাইল,—এ তো পুলিশের ভুল। পুলিশরা আকছার এরকম ভুল করে। ছেড়েও তো দিয়েছে!

—তো? সব মিটে গেল? আপ সোচ ভি নেহি সকেঙ্গে কিতনা বুরা বুরা গালি দিয়া। কাশ্মীরমে ভি ইতনা গালি নেহি শুননা পড়তা। হামলোগ্ হিন্দুস্তানকে গন্দা করে দিচ্ছি...লাথ মারকে হামলোগকো হিন্দুস্তানসে নিকাল দেনা চাহিয়ে...!

—আরে দূর দূর, ওসব গায়ে মেখো না। দেখছ তো এখনকার সিচুয়েশান। তোমাদের কাশ্মীরে পাকিস্তানের চর টর থাকে তো, তাই আর কি...। ...এবার চিনে গেল। আর প্রবলেম হবে না।

—নেহি বাবুজি। আমি পহেলে বলি নি, হর বার অ্যাইসা হোতা হ্যায়। পুলিশ পকড়তি নেহি, লেকিন ডেরামে এসে পুছতাছ করে যায়। নাম পতা সব উনকো দেনা পড়তা কিঁউ অ্যাইসা হোগা বাবুজি? আমরা কি ইন্ডিয়ান নেহি? আপনে হি দেশ মে বিজনেস করতে পারব না? খুরশিদের গলা থেকে তীব্র উষ্মা ঝরে পড়ছে। চোখে গনগন করছে ক্ষোভ। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল,—ইয়ে বহুৎ গলৎ বাত হ্যায় বাবুজি। অ্যাইসা নেহি হোনা চাহিয়ে।

দীপক ফস করে বলে বসল,—পুলিশকে শুধু দোষ দিলে তো হবে না ভাই। পুলিশকে তো তার ডিউটি করতেই হবে। তাছাড়া তোমাদেরও তো দোষ কম নেই। আই মিন কাশ্মীরিদের।

—হামলোগকা কেয়া কসুর বাবুজি? কাশ্মীরি হলেই এক্সট্রিমিস্ট বনে গেল?

—ঠিক তা নয়। ...তবে তোমরাও তো এ দেশটাকে ঠিক আপন ভাবতে পারো না।

এ ধরনের কথা শোনার জন্য খুরশিদ বুঝি আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তার ফর্সা মুখ আরও লাল হয়ে গেছে। আহত মুখে বলল,—এ আপনি কী

বললেন বাবুজী? আপনারা আমার আপনালোগ নয়?

—আহা হা, তা বলছি না। আমি বলতে চাইছি তোমরা তো ইন্ডিয়াকে কখনও...

—দেশ কি সির্ফ মিট্টিসে বনতা হ্যায় বাবুজি? দেশ তো আদমি সে হি বনতা হ্যায়। ফিলিংস্‌সে বনতা হ্যায়। আপনারা যদি আমার আপনা হন, তো দেশ কেন আপনা হবে না?

সোজা সরল যুক্তি। দীপক ঝপ করে জবাব দিতে পারল না। একটু আমতা আমতা করে বলল,—তাহলে আর তোমাদের ওখানে এত প্রবলেম হচ্ছে কেন?

—ও তো নেতালোগকা মর্জিকা খেল্ হ্যায় বাবুজি। হামলোগ আম আদমি। হামলোগ তো স্রিফ পুতলি হ্যায়, পুতলি। খুরশিদের স্বর ভারী হয়ে এল,—শুনিয়ে বাবুজি, কাশ্মীর ইন্ডিয়ামে রহে, ইয়া পাকিস্তানমে, উসমে হামলোগকা কোই ফরক নেই পড়েগা। কাশ্মীর আলগ কান্ট্রি বনে গেলেই বা আমজন্‌তার একস্ট্রা কী ফায়দা হবে? হামলোগ তো য্যাইসে কি ত্যাইসে হি রহেঙ্গে। কাম করো, রোটি কামাও, বাচ্চা পালো, ঘর চালাও...। ডিসটার্বেন্স হলে হামলোককা হি জাদা নুকসান হবে বাবুজি। ...নেহি বাবুজি, আম আদমি কভি ভি মারদাঙ্গা নেহি চাহতা। হামলোগকা শান্তি চাহিয়ে। হামলোগ জিনা চাহতে হ্যাঁয়।

দীপক এবার একেবারে স্পিকটি নট্। আমি স্থির চোখে খুরশিদকে দেখছিলাম। তার মুখমণ্ডলের ক্রোধ বদলে গেছে বিষণ্ণতায়। মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খুরশিদ শালওয়ালা।

খুরশিদ বিড়বিড় করে বলে উঠল,—এক বাত কহুঁ বাবুজি? গোলাপফুল পেড় মে হি জাদা আচ্ছি লাগতি হ্যায়। ফির ভি সবলোগ্ গুলাবকো তোড়কে আপনে কব্জেমে রাখনা চাহতা হ্যায়। ইস্‌মে গুলাবকা কিতনি তকলিফ্ হোতি হ্যায়, কোই সোচতা হ্যায় কেয়া?

ঘরের বাতাস যেন আরও ভারী হয়ে গেল সহসা। অস্ফুটে বললাম,—তোমার মনের অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি খুরশিদ। তবু বলি, একটু ভাবো। দুম করে এভাবে বিজনেস ফেলে চলে যেও না।

—নেহি দিদি। কাফি হো গিয়া। পুলিশের কথা বাদ দিন, আপনারাও

তো আমাদের বিশ্‌ওয়াস করতে পারেন না। ঘরকা রুখাসুখা রোটি ইস অপ্‌মানসে বেহতর হ্যায়।

নাহ্‌, মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, অবিশ্বাসের একটা শিকড় তো সত্যিই আমাদের মধ্যে চারিয়ে আছে। আজন্মলালিত কিছু সংস্কারও।

তবু বললাম,—তোমার এখানে এত টাকা পড়ে রইল...?

—যিতনা হো সকে আজ কালেক্ট করে নিয়েছি। সবকোইকো পতা ভি দিয়ে দিলাম, যদি দিল চায় পাঠিয়ে দেবে।

—আমার টাকাটাও তাহলে নিয়ে নাও।

—নেহি দিদি। আভি রহনে দিজিয়ে। অনেকক্ষণ পর খুরশিদ ভাঙা ভাঙা হাসল,—আপনি যখন কাশ্মীর আসবেন তখন নিয়ে নেব।

—যাহ্‌, তা হয় নাকি? জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, যদি কোনও দিন কাশ্মীর যাওয়া না হয়?

—তো কী আছে! জানব, আমার দিদির কাছে আমার রুপিয়া রাখা আছে।

কিছুতেই টাকাটা নেওয়াতে পারলাম না খুরশিদকে। খুদা হাফিজ বলে চলে গেল খুরশিদ।

আমি বসে রইলাম স্থাণুবৎ। কেমন যেন অবশ অবশ লাগছিল নিজেকে। আষ্টেপৃষ্ঠে শাল জড়িয়েও শীত শীত করছিল।

ছয়

কদিন আগে কাশ্মীরে একটা যুদ্ধ হয়ে গেল। কারগিল্‌ ওয়ার। গোটা উপত্যকায় অশান্তি এখন চরমে। সৈন্যসামন্তের বুটের আওয়াজে পীরপাঞ্জাল কাঁপছে থরথর।

এমন পরিস্থিতিতে কাশ্মীর যাওয়ার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

কাশ্মীর যাওয়া আর বোধহয় হবেও না আমাদের। সব কিছু শান্ত হয়ে গেলেও। গত বছর মে মাসে চাকরি থেকে রিটায়ার করল দীপক। আজীবন অফিসপাগল মানুষ ছিল, দম করে কর্মজীবনের অবসানটা ধাতে সয় নি। মাস

দুয়েকের মাথায় হঠাৎ একদিন স্ট্রোক। সেরিব্রাল অ্যাটাক। তেমন ভয়ংকর কিছু ঘটে নি বটে, তবে চলাফেরা খুব নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে দীপকের। সঙ্গে সঙ্গে আমারও। কাশ্মীর তো দূরস্থান, চেন্নাইতে বুবলির কাছে যাওয়ার কথা ভাবলেও নার্ভাস লাগে।

তবে কাশ্মীর এখনও টানে আমাদের। বরফঢাকা পীরপাঞ্জাল নয়, সোনমার্গ গুলমার্গ পহেলগাঁওয়ের নিসর্গ নয়, বাদশাহি গোলাপ বাগান নয়, লিদ্দার ঝিলমসিন্ধু নয়, চিনারগাছের পাতারাও নয়। টানে একটা অভিমানী মুখ। এক বিষণ্ণ চলে যাওয়া।

খুরশিদের টাকাটা আজও পাঠানো হয় নি। পাঠাতে পারি নি। যদি খুরশিদ কিছু মনে করে? যদি খুরশিদ আবার আঘাত পায়?

দেনাটা রয়েই গেল।

কার কাছে দেনা? খুরশিদ? না কাশ্মীর?

ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি

দুপুরবেলা অফিসে বসে একটা ক্লেম নিয়ে নাড়াঘাঁটা করছি, হঠাৎ অয়নের ফোন,—অ্যাই রাতুল, কী করছিস?

সামান্য অবাকই হলাম। অয়ন তো অফিসে বড় একটা ফোন করে না? ওর ফোনাফুনির সময় তো রাত দশটার পর। বাড়ি টু বাড়ি। হল কী আজ?

হালকা ভাবেই বললাম,—অফিসে লোকে যা করে। কাজ।

—খুব বিজি?

—তা আছি একটু। কেন রে?

—চট করে গড়িয়াহাটে চলে আসতে পারবি? অয়নের স্বর উত্তেজিত শোনাল,—এই ধর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে?

—কী ব্যাপার?

—বিয়ে করছি। আজই। তোকে সাক্ষী দিতে হবে।

—কীইই? কী করছিস?

—বিয়ে। শাদি। আই মিন ম্যারেজ। রেজিস্ট্রি করে।

—রেজিস্ট্রি কেন? নীলাঞ্জনার সঙ্গে তো তোর...

—নীলাঞ্জনা নয়। সোমঋতা। চলে আয় চটপট। রেজিস্টারকে বলেছি সাড়ে চারটের মধ্যে পৌঁছব। বাই দা বাই, ঈশিতাকেও আসতে বল।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলানোর চেষ্টা করলাম, —ঈশিতাকে এখন কোথায় পাব?

—দ্যাখ না চেষ্টা করে। ওকেও ট্যাক্সিতে তুলে আন। আমি ভাড়া দিয়ে দেব।

—ভাড়াটা ফ্যাক্টর নয়। দেখি।

—দেরি করিস না প্লিজ। আমরা গড়িয়াহাট মোড়ে ওয়েট করছি।

বলেই ফোন রেখে দিয়েছে অয়ন। ধন্দ মাখা মুখে বসে রইলাম একটুক্ষণ। কেসটা কী হল? অয়নের সঙ্গে না সোমঋতার কাটাকুটি হয়ে গিয়েছিল? নন্দন চত্বরে বিশ্রী ঝগড়া হল দুজনের, মুখ দেখাদেখি বন্ধ, অয়ন সোমঋতার নাম শুনলে দাঁত কিড়মিড় করে, সোমঋতার সামনে অয়নের কথা তুললে নাকের পাটা ফুলতে থাকে সোমঋতার...! তারপর অয়নই নিজে থেকে গত মাসে জানাল বাড়িতে ওর জন্য পাত্রী ঠিক করেছে, মেয়েটার নাম নীলাঞ্জনা, অয়নের নাকি খুব পছন্দও হয়েছে নীলাঞ্জনাকে! অঘ্রানে না ফাল্গুনে কবে বিয়ে হবে তাই নিয়ে নাকি কথাও চলছে দু'বাড়িতে! এর মধ্যে সোমঋতা আবার পিকচারে এল কোথ্‌থেকে?

ঈশিতাকে ফোন করব কী করব না, মনে মনে ভাবলাম একটু। আগে নিউজপেপারে ফ্রি লান্সিং করত ঈশিতা, আমাদের বিয়েটা হয়ে যাওয়ার পর পরই একটা বাংলা টিভি চ্যানেলে কাজ জুটিয়ে ফেলেছে। এখন সে সর্বক্ষণ বাইট নিয়ে বেড়ায়। এই টালায় থাকে, তো এই টালিগঞ্জ। ফুলফ্লেজেড গেছোদিদি। ঠিক এই মুহূর্তে ঈশিতা যে কোথায়! ধরা অবশ্য কঠিন নয়, ঈশিতার ব্যাগে মোবাইল আছে। কিন্তু কাজ ছেড়ে সে এখন আসতে পারবে কি? আবার এমন একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনার খবর না জানালেও তো চটে যাবে।

দোনামোনা করে লাগালাম ফোন, —অ্যাই, তুমি এখন কোন্ মুলুকে?

—ট্যাংরায়। ঈশিতার স্বর যথারীতি ব্যস্ত, —ট্যানারি মালিকদের ইন্টারভিউ নিচ্ছি। দারুণ দারুণ সব নিউজ। যা দুর্দান্ত স্টোরি হবে না!

—এ দিকে যে আর একটা স্টোরি তৈরি হতে চলেছে। অয়ন আজ বিয়ে করছে।

—তাই? বলো কি?

—গেস্ করো তো পাত্রী কে?

দু এক সেকেন্ড থমকে থেকে ঈশিতা বলল, —কে? সোমঋতা?

—আইব্বাস্, কী করে বুঝলে?

—স্ট্রেঞ্জ কিছু না হলে তুমি প্রশ্নটা করতে? ...তা সেই নীলাঞ্জনা কোথায় গেল?

—ভোগে। আমি তো মাথামুণ্ডু কিছু বুঝছি না। এই তো সেদিনও নীলাঞ্জনাকে নিয়ে ডিনার করতে গিয়েছিল।

—আমাকেও তো বলছিল নীলাঞ্জনার বাবার সঙ্গে সামনের শনিবার বেরোবে। স্যুটের মাপ দিতে।

—কী যে করে পাগলটা! ...যাক গে যাক, পুরোনো প্রেমটা তাহলে রিভাইভ করল। তুমি আসতে পারবে? তোমাকে যেতে বলছে।

—কখন?

—চারটে। গড়িয়াহাট।

—চারটে? আচ্ছা দেখি। ...আমার অবশ্য দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে প্যাক-আপ হয়ে যাবে। তবে একবার অফিসে ফেরার দরকার ছিল...। ঠিক আছে, প্রসূনদাকে বলে ম্যানেজ করছি।

ফোন নামিয়ে ঝটপট হেস্তনেস্ত করে ফেললাম ক্লেমটার। চিকিৎসা-খরচের বিল ভাউচার তো মোটামুটি ঠিকই আছে। ফেভারেবল্ নোট দিয়ে দেওয়াই যায়। একটাই যা ঝামেলা, পাঁচ বছরের ইনসিওরেন্সে ভদ্রলোকের এটা ফোর্থ ক্লেম। মরুক গে যাক, সেটাও নয় লিখে দিই নোটে। এরপর হুড়কো দিতে হলে ম্যানেজার দিক।

ফাইল যথাস্থানে পাঠিয়ে বেরিয়ে পড়লাম অফিস থেকে। নেব, কী নেব না করতে করতে ট্যাক্সিও নিয়েছি একটা। অয়ন কেতা মেরে ভাড়া দেবে বলল বটে, তবে আদৌ কী ঠেকাবে বলা মুশকিল। যা বিটকেল রকমের হিসেবি। একবার আমরা পাঁচজন মিলে ধাবায় খেতে গিয়েছিলাম। সোমঋতা ঈশিতাও ছিল। বিল হল দুশো সাঁইত্রিশ। সোমঋতার পয়সা তো দিলই না

অয়ন, বিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিজের রুটি তড়কার সাতাশ টাকা গুনে বার করে দিল। কাউমাউ করছিল প্রীতম, তাকে অয়নের সাফ জবাব—যে যার নিজেরটা দাও। তোমরা পরোটা কাবাব খেয়েছ, তোমাদের বেশি ধসবে। আজ যদি ব্যাটা ট্যাক্সিভাড়া অফারও করে, ঈশিতা আলাদা যাচ্ছে তো, নির্ঘাৎ অর্ধেক দেবে।

আমার আগে গড়িয়াহাট মোড়ে পৌঁছে গেছে ঈশিতা। অয়ন আর সোমঋতাও অপেক্ষা করছিল। সোমঋতা শাড়ি পরেছে আজ। অয়ন চোস্ত্ পাঞ্জাবি। দারুণ কাজ পাঞ্জাবিটায়। নতুন? কাঁধে একটা ঝোলা ব্যাগও আছে অয়নের। বিয়ের ড্রেস এক্ষুনি কিনে প্যান্টশার্ট ঝোলায় চালান করেছে নাকি? অয়ন সব পারে।

আমাকে দেখে অয়ন তড়িঘড়ি এগিয়ে এল। ট্যাক্সিমিটারের দিকে তাকালই না। নীচু গলায় বলল—অ্যাই, আজ কিন্তু একদম নীলাঞ্জনার নাম তুলিস না।

চোখ সরু করে বললাম, —ব্যাপার কী রে? তোরা আবার মিলে গেলি যে বড়?

—দূর, ওসব নীলাঞ্জনা ফিলাঞ্জনা চলে না। একটা কোল্ডড্রিংকস্ কিনলেও ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে থাকে কখন আমি পার্স থেকে টাকা বার করি...

—শুধু এই কারণে নীলাঞ্জনা আউট?

—তা নয়...সোমঋতাও ফোন করে খুব কান্নাকাটি করছিল। আমায় ছাড়া ও থাকতে পারবে না...। আমিও ভেবে দেখলাম সোমঋতার সঙ্গে আমি মোট একশো ছেচল্লিশ দিন ঘুরেছি, আমাদের পরিচয়ও পাক্কা পাঁচ বছর সাত মাসের। তুলনায় নীলাঞ্জনা তো নাথিং। ন্যাচারালি আমার ওপর সোমঋতারই বেশি রাইট।

—তোর বাড়িতে জানে?

—রাত্তিরে জেনে যাবে। বাবা মানলেও মানতে পারে, মা নো চান্স। আফটার অল মা'র পছন্দর পাত্রীকে ডিচ্ করলাম...

—তাহলে তো খুব অশান্তি হবে বাড়িতে?

—হলে হবে। সামনের মাসের মধ্যে একটা ফ্ল্যাট দেখে নেব, তারপর

টাটা করে বেরিয়ে আসব।

ঈশিতা দূর থেকে চেঁচাচ্ছে,—অ্যাই, তোমরা ওখানে কী গুজগুজ করছ? এসো। চলো।

বললাম, —দাঁড়াও, আগে দুটো মালা কিনে আনি। অয়ন সোমঋতার বিয়ে বলে কথা!

বিয়েটা নির্বিঘ্নেই চুকে গেল। ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশান অফিসে আগে থেকে নোটিস দেওয়া ছিল না, ম্যারেজ রেজিস্টারটি এক বয়স্কা অবিবাহিতা মহিলা, তিনি একটু গাঁইগুঁই করছিলেন, সবাই মিলে পটানো গেল তাঁকে। খরচাপাতি কিঞ্চিৎ বেশি হল, এই যা। পুরো টাকাটা অবশ্য অয়নই দিল আজ, সোমঋতার সঙ্গে ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি করল না। বিয়ের দিন সব ছেলেই বুঝি একটু বেশি উদার হয়ে যায়। আমি তো ফুলশয্যার দিন প্ল্যাটিনামের ওপর হিরে বসানো আংটি দিয়েছিলাম ঈশিতাকে। নিজের পয়সায়।

আইনি গাঁটছড়ার সাক্ষী থাকতে সোমঋতার দিদি জামাইবাবুও এসেছিল রেজিষ্ট্রি অফিসে। সোমঋতাও এখনও খবরটা বাড়িতে জানায়নি। সম্ভবত না আঁচানো পর্যন্ত অয়নকে বিশ্বাস নেই, তাই। বার্তাটা পারমিতাদি আর শৈবালদাই আজ বয়ে নিয়ে যাবে বাড়িতে।

মালা দুখানা ঝোলায় ভরে দলবল মিলে সোজা পার্ক স্ট্রিট। দামি রেস্তোঁরায় জব্বর ট্রিট দিল অয়ন। শৈবালদা বিল মেটাতে চাইল, কিন্তু অয়ন তাতে রাজি নয়। অন্তত একটি দিন সে বুঝি সব কৃপণতার ঊর্ধ্বে উঠতে চায়।

দেখে বেশ লাগছিল। চেনা অয়ন আজ যেন একেবারে অন্যরকম। হিসেবি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের খোলস ঝেড়ে ফেলেছে, ঠোঁটে লাজুক লাজুক হাসি, কারণে অকারণে আঙুল ছুঁচ্ছে সোমঋতার, আচমকা হেসেও উঠছে পিলে চমকানো নাদে। অয়ন অসম্ভব রূপবান, তার তুলনায় সোমঋতা নিতান্তই সাদামাটা, সেই কারণে একটু যেন কমপ্লেক্স আছে সোমঋতার। সেই সোমঋতাও আজ বিয়ের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ভারী অপরূপা এক রাজকন্যা এখন। নতুন কনের মতো চোরা চোখে দেখছে অয়নকে, তুচ্ছ রসিকতাতেই লাল আভা ফুটছে তার গালে। কে বলবে ক'মাস আগে এই

অয়ন সোমঋতাই প্রকাশ্যে চুলোচুলি করেছিল! প্রতিজ্ঞা করেছিল এ জীবনে কেউ কারুর মুখ দেখবে না!

বাড়ি এসে ঈশিতাকে বললাম,—অয়ন সোমঋতা কিন্তু জোর সারপ্রাইজ দিল!

ঈশিতা বলল,—সত্যি, আমি ভাবতেই পারিনি সোমঋতা গলবে।

—সোমঋতা কোথায়, গলল তো অয়ন। সোমঋতা তো আগেই ভেঙে গেছিল, অয়নকে ফোন করে রোজ কান্নাকাটি করত।

—কে তোমায় বলল এ কথা? অয়ন? ঈশিতা মুচকি হাসল, —ব্যাটা ঢপ দিয়েছে। সোমঋতার মুখে আমি ডিটেলে শুনে নিয়েছি।

—কী শুনেছ?

—লাস্ট দশ দিন ধরে অয়ন রোজ সকাল বিকেল ফোন করেছে সোমঋতাকে। দু'দিন ন্যাশানাল লাইব্রেরির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সোমঋতাকে ধরবে বলে। ও তো রীতিমত ভয় দেখিয়েছে সোমঋতাকে। বলেছে এক্ষুণি বিয়ে না করলে ও সুইসাইড করবে। সোমঋতা বলেছিল, দাঁড়াও আগে বাবা মাকে বলি, তুমিও তো একটা ঝঞ্ঝাট পাকিয়ে বসে আছ, বিয়ের দিন পর্যন্ত ফাইনাল, সেটার আগে ফয়সালা করো বাড়িতে, তদ্দিনে আমিও আমার পিএইচডির কাজটা একটু এগিয়ে নিই...। অয়ন নাকি বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদেছে। এক্ষুনি বিয়ে করতে হবে। এক্ষুনি।

হতে পারে। এরকমটা করা অয়নের পক্ষেই সম্ভব। ও হল ভাঙবে তবু মচকাবে না টাইপ। অন্তত বন্ধুদের সামনে। ও যে আদৌ সোমঋতার প্রেমে পড়েছে, এ কথা আমাদের কাছে স্বীকার করতে ওর দেড় বছর টাইম লেগেছিল। তাও রীতিমতো গোয়েন্দাগিরি করে অন্তত চারবার ওদের একত্রে ধরে ফেলার পর। তাছাড়া অয়নের মেল ইগোটিও যথেষ্ট টনটনে।

তবু কেন যেন অয়নেরই পক্ষ নিলাম। ঘাড় বেঁকিয়ে বললাম, —সোমঋতা সত্যি বলেছে তাই বা ধরে নিচ্ছ কেন? সোমঋতাই অয়নের জন্য বেশি ফিদা ছিল, আমি জানি।

—অয়নও কিছু কম মজনু ছিল না। মনে আছে সেবার সোমঋতা বাড়ির সঙ্গে সিকিম বেড়াতে গেল, তিন দিনেই বিরহে কাতর হয়ে অয়ন ছুটল গ্যাংটক?

—তারপর লাস্ট চারমাস পুরো কাটঅফ করেও তো ছিল!

—সে তো সোমঋতাও ছিল। ভুলেও অয়নের নাম করত না।

—ওদের টাইপটাই বোধহয় এরকম।

—যা বলেছ। কভি খুশি কভি গম।

—কিম্বা কভি হাঁ তো কভি না।

দুজনেই হেসে ফেললাম। তবে প্রার্থনাও করলাম, এবার থেকে যেন ওদের খুশির পাল্লাটাই ভারী হয়।

বেশ জমিয়েই সংসার পাতল সোমঋতা অয়ন। চমৎকার এক ফ্ল্যাট ভাড়া নিল যাদবপুরে। তিনতলার ওপর। পুব দক্ষিণ খোলা। অঢেল হাওয়া। অঢেল আলো। অঢেল প্রেম।

অয়নের মা মেনে না নিলেও সোমঋতার বাড়ি থেকে কণামাত্র আপত্তি হয়নি। বরং তাঁরা একটা ছোটখাটো অনুষ্ঠানও করে ফেললেন। জম্পেশ করে খেয়েও এলাম আমরা। মেয়ে জামাইকে সোমঋতার বাবা মা দিয়েছেনও প্রচুর। গয়নাগাঁটি, খাট, আলমারি থেকে শুরু করে ফ্রিজ ওয়াশিং মেশিন পর্যন্ত। যৌতুক দিয়েই ফ্ল্যাটটা সাজিয়ে ফেলেছে সোমঋতা। ছুটির দিনে আমরা যাই মাঝে মাঝে, দেখে আসি ওদের ঘরকন্না। শুনি অয়নের বাবা নাকি প্রায়ই আসছেন ছেলে ছেলের বউকে দেখতে। অয়নের মায়েরও নাকি মন গলছে একটু একটু। সোমঋতা তাঁর সঙ্গে দেখাও করে এসেছে বার কয়েক।

অর্থাৎ সব কিছুই ভালর দিকে।

কিন্তু অয়ন এক্কেবারে সুবোধ বালকটি হয়ে সংসার করবে তা কি হয়! বিয়ের মাস আষ্টেকের মাথাতেই একটি ছন্দপতন।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে সবে শার্টপ্যান্ট বদলাচ্ছি, দুম করে অয়নের আবির্ভাব। এসেই সোফায় ধপাস। মাথা ঝাঁকাচ্ছে, —ধুস, সোমঋতাকে বিয়ে করাটা আমার উচিত হয়নি। ব্লান্ডার করে ফেলেছি।

থতমত মুখে বললাম, —হলটা কী? ফের ঝগড়া সোমঋতার সঙ্গে?

—ফুঃ, ওই হেডস্ট্রং মেয়ের সঙ্গে আমি ঝগড়া করব? শি ইজ সিম্প্‌লি ইন্‌টলারেবল্‌। কোন ব্যাপারেই একমত হয় না।

—সে আর কোন্‌ বউ'ই বা হয়! বউদের ধর্মই তো বরকে ডিফাই করা।

—না রে, তুই ওর টাইপটা বুঝতে পারছিস না। আমি যদি ডাইনে চলতে বলি, ও অব্‌ভিয়াসলি বাঁয়ে যাবে। এবং ওর ইচ্ছে মতো আমাকেও বাঁয়ে ঘুরতে হবে। বলতে বলতে গরগর করে উঠল অয়ন,—আমার চিরকাল চিত হয়ে শোওয়া অভ্যেস, ওর দাবি আমায় পাশ ফিরে শুতে হবে। কেন? না পাশে চিত হওয়া লোক দেখলে ওর মনে হয় একটা ডেডবডির পাশে শুয়ে আছে।

—ও, এই প্রবলেম? আমি মুচকি হেসে চোখ টিপলাম, —নয় পাশ ফিরেই শুলি। সোমঋতার দিকে ফিরে শুতে তোর তো খারাপ লাগার কথা নয়।

—এ ক'মাস তো তাই শুয়েছি। মহারানি যা যা বলেছেন সব মেনেছি। কিন্তু কদ্দিন অ্যাডজাস্ট করব? কদ্দিন? ভাবতে পারিস, ডিপ ঘুমে রয়েছি, কোঁৎকা মেরে পাশ ফিরিয়ে দেয়। আমার মুখ দেখে অয়ন আরও চটে গেল, —ডোন্ট লাফ রাতুল। এটা ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্ন। একটা মানুষ কোন পোজে ঘুমোবে সেটুকুও তার ডিসাইড করার রাইট নেই? পরশু আমি উঠে বেরিয়ে গেছি ঘর থেকে। সারা রাত সোফায় শুয়েছিলাম।

হাসিটা জোর করে চেপে বললাম, —হুম। যথেষ্ট অবজেকশনেবল্‌। সোমঋতা একটু আদর করে পাশ ফেরাতে তো পারে।

—আদর? গা থেকে চাদর কেড়ে নেয়।

—কেন?

—কী বলব? আমি বারো মাস গায়ে চাদর দিয়ে ঘুমোই। ওর মতে এটা নাকি বুড়োমি। আরও শুনবি? ও এখন একটা নতুন অপবাদ দেওয়া শুরু করেছে। আমার নাকি ভয়ংকর নাক ডাকে। বাবা মা কেউ কোনও দিন বলল না, এখন উনি কিনা আমায়...! জানিস টিজ করে কী বলে? স্নোরিং লায়ন।

লায়ন বলাটা কি গালাগাল? সিংহ বললে ছেলেরা তো গর্বিতই বোধ করে। পুরুষ সিংহ! বেশ তো ওজনদার, সম্মানবাচক শব্দ। অয়নের থমথমে মুখ দেখে কথাগুলো বলতে অবশ্য ভরসা হল না, উল্টে একটা গোমড়া ভারিক্কি ভাব ফোটালাম, —ব্যাড, ভেরি ব্যাড। সোমঋতাকে বকা দরকার।

—বকেটকে কিছু হবে না। ও একটা সেলফিশ জায়েন্ট। না, সেলফিশ বিচ।

—অ্যাই, মুখ খারাপ করিস না।

—অনেক দুঃখে বেরিয়ে যাচ্ছে রে। কী টর্চারটা যে সহ্য করছি। এভরিওয়ান নোজ, আমার শোওয়ার টাইম এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটা, ওই সময় ঘর আমার পুরো অন্ধকার চাই। কিন্তু সোমঋতা বেছে বেছে ওই সময়েই বইখাতা খুলে বসবে। অ্যান্ড দ্যাট টু, ওই বেডরুমেই।

—এটা একটা ব্যাপার হল? নরম করে বুঝিয়ে বল্। টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে কাজ করুক।

—তাই করে। কিন্তু এককণা আলো থাকলেও আমি চোখ বুজতে পারি না। দুহাতে নিজের ঝাঁকড়া চুল খামচে ধরল অয়ন, —আরও আছে। আরও আছে। শি ডাজন্ট কেয়ার ফর মি। আমি সকালে কী ব্রেকফাস্ট করব, কী পরে অফিস বেরোব, রাতে কী খাওয়া পছন্দ করি, কোনটাই বা আমার অপছন্দ, কোনও ব্যাপারেই এতটুকু হেলদোল নেই। শি ইজ অলওয়েজ বিজি উইথ হার ওউন ওয়ার্ক। কী গুষ্টির পিণ্ডি থিসিস করছে, তাই নিয়েই মশগুল। আমি আজ না খেয়ে অফিস চলে গেছি। সারাদিনে একটা ফোন করে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না পেটে আমার কিছু পড়ল কিনা! তুইই বল্, এরকম স্বার্থপর মেয়ের সঙ্গে বাস করা যায়?

খ্যাপা দেখি জোর খেপেছে! মনে মনে সোমঋতার ওপরও রাগ হল একটু। জানে ছেলেটার মাথায় ক্যারা আছে, একটু মানিয়ে গুনিয়ে চলতে পারে না?

দিন দুই পরে ছবিটা একশো আশি ডিগ্রি বদলে গেল। অফিস থেকে ফিরে ঈশিতা বলল, —জানো তো, আজ সোমঋতার সঙ্গে মোলাকাত হল।

—কোথায়?

—ন্যাশনাল লাইব্রেরির ওপর আমরা একটা স্টোরি করছি, আই মিন হাউ ইট ইজ বিয়িং মেনটেনড, কী রকম পাঠক আসে, গ্র্যান্ট্ কী ভাবে ইউটিলাইজড হচ্ছে...ওখানেই সোমঋতার সঙ্গে কথা হল।

—বললে, পাগলা কী কী কমপ্লেন করে গেছে?

—শুনলই না। তারও তো ঝুড়ি ঝুড়ি অভিযোগ। কোনওটাই ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

—যেমন?

—ও তো বলল অয়নই কোনও রকম অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে রাজি নয়। অসম্ভব সেল্‌ফসেন্টারড, আত্মসুখী, পান থেকে চুন খসলে হল্লা শুরু করে। সোমঋতার মশারি টাঙিয়ে শুলে দম বন্ধ হয়ে আসে, কিন্তু বাবু মশারি টাঙাবেনই। তিনতলার ওপর মশা নেই, ম্যাট জ্বলছে, তবুও। বাতিক। রান্নায় এক ফোঁটা মিষ্টি পড়েছে টের পেলেই বাবু খাওয়ার থালা ছুঁড়ে ফেলে দেন। সোমঋতার একটু মিষ্টি মিষ্টি তরকারি খাওয়া অভ্যেস, বোঝো বেচারার কী ঝকমারি! কোনও কম্মের নয়, এক গ্লাস জল পর্যন্ত গড়িয়ে খাবে না, অফিস যাওয়ার সময়ে রুমালটা পর্যন্ত বাবুর হাতের কাছে এগিয়ে দিতে হবে। নইলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে। সোমঋতা বলছিল, ও কি দাসীবাঁদী? বরের ফাইফরমাশ খাটার জন্য বিয়ে করেছে?

ঠিক কথা। তবু নিজের অজান্তে অয়নের পক্ষেই চলে গেছি, —যাই বলো, এটা কিন্তু সোমঋতারও একটু বাড়াবাড়ি। নিজের সংসারেরই কাজ করবে, বরের দেখভাল করবে...এর মধ্যে দাসীবাঁদীর কথা আসে কোথ্‌থেকে?

—আসত না, যদি দুজনেই ঘরের কাজকর্ম শেয়ার করত। সোমঋতাকেও তো বাইরে বেরতে হয়। পেপার রেডি করছে, ডাটা কালেক্‌শান করছে, গাইডের কাছে ছুটছে...। তার মধ্যেই তো রান্নাবান্না সবই করে। কিন্তু সমস্ত ঝক্কি ও কেন একাই মাথায় নেবে? এবং তার পরেও বরের মন পাওয়া যাবে না। জানো সেদিন কী জন্য না খেয়ে অফিস চলে গিয়েছিল অয়ন?

—কী জন্যে?

—গেস করো।

—হবে সিলি কিছু।

—সিলি নয়, সিলিয়েস্ট অফ দা সিলি। অয়ন ব্রেকফাস্টে পোচ খেতে চেয়েছিল, সোমঋতা ওকে ওমলেট ভেজে দিয়েছিল, তাই। সোমঋতাও ত্যাড়া হয়ে গেছে, বলেছে রোজ ওমলেটই করে দেবে। খেতে হয় খাও, না হলে রাস্তা দ্যাখো। এখন তো আরও বেশি বেশি করে শোওয়ার ঘরে বসে পড়াশুনো করছে। অত কী? সব সময়ে অয়নের সুবিধেই দেখতে হবে নাকি?

—বা রে, এরকম করলে চলবে? এতে তো শুধু লাঠালাঠিই হবে।

কিছু!

—এর মধ্যে আবার নিজেকে ঢোকাচ্ছ কেন?

—কারণ আমিও একজন সাফারার। কত কিছু স্যাক্রিফাইস করেছি তোমাদের জন্য। জিনস্ পরে রাস্তাঘাটে কাজ করতে কত সুবিধে, তোমার মা'র পছন্দ নয় বলে আমি জিনস্ ছেড়ে দিইনি? সারা সপ্তাহ কী খাটুনিটাই যায়, তার পরও একটা রোববার আমার কোনও বিশ্রাম আছে? তোমার মতো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারতে যেতে পারি? তোমার বাবা চান বলে আমায় বউমাটি সেজে কিচেনে ঢুকতে হয় না? যত টায়ার্ড হয়েই ফিরি, রাত্তিরে আমায় পরিবেশন করত হয় না খাবার টেবিলে?

—আশ্চর্য, এটুকু কাজের জন্য তোমার এত বিরক্তি? এ কথা তো আগে কখনও বলোনি?

—বলিনি। আজ উঠল বলে বললাম।

—আমার কিন্তু ধারণা ছিল কাজগুলো তুমি ভালবেসেই করো।

—ভালবেসে করি, না পিস্‌ফুলি থাকার জন্য করি সে আমিই জানি। না করলে তো বাড়িশুদ্ধু লোকের মুখ হাঁড়ি হত। তুমিও বাদ যেতে না। ছেলেদের তো চিনতে বাকি নেই, তারা এসব সময়ে বাপ মার সুবোধ বালক বনে যায়।

—আমাকে এর মধ্যে টানছ কেন?

—কারণ তুমিও একটি ছদ্মবেশী অয়ন। তোমার বন্ধু গলা ফাটায়, আর তুমি ঘাপটি মেরে থাকো। ঈশিতা চোখ টেরচা করল,—অফিস থেকে ফিরে যদি কোনও দিন দ্যাখো আমি আগে এসে গেছি, ওমনি হুকুম, এক কাপ কফি করে দাও তো! এর উলটোটা ঘটেছে কোনও দিন? আমার কফি খাওয়ার ইচ্ছে হলে তখন তো অর্ডারটা মাকে পাস করে দাও। দাও না?

এবার আমার একটু রাগই হয়ে গেল। গোমড়া মুখে বললাম,—আমি তোমার জন্য কিচ্ছু করি না? নিজেকে একটুও বদলাইনি?

—কী বদলেছ?

—তোমার সঙ্গে সময় অ্যাডজাস্ট করতে পারি না বলে সিনেমা থিয়েটারের নেশাটা ডকে তুলি দিইনি? তোমার পছন্দ নয় বলে কালেভদ্রে যা একটা দুটো সিগারেট খেতাম, তাও অফ।

—ওফ্, মহৎ ত্যাগ! আর?

—আর আর...। অনেক চিন্তা করেও আর তেমন কিছু খুঁজে পেলাম না। অস্থির মুখে বললাম,—অত কি হিসেব থাকে?

—মাথা খুঁড়েও আর কিছু মনে করতে পারবে না। কারণ আর কিছুই ছাড়োনি। ঈশিতা হেসে ফেলল,—তবু আমরা বেশ বহাল তবিয়তে তেমন ঝগড়াঝাঁটি না করেও টিকে আছি। কী করে আছি?

ভ্যাবলার মতো তাকালাম,—কী করে?

—কারণ আমাদের মধ্যে কয়েকটা মিলও আছে। যেমন, আমরা দুজনে মশারি ছাড়াই ঘুমোতে ভালবাসি। দুজনেই ঝাল খাই। দুজনেরই অল্প অল্প নাক ডাকে। বলেই চোখ টিপল ঈশিতা,—এবং আমরা একসঙ্গে শুতে যাই। ছোটখাটো মিলগুলো হচ্ছে না বলেই অয়ন আর সোমঋতার এত সমস্যা। তবে এই নিয়ে মাথা ঘামানোরও কিছু নেই। ঝগড়া ওরা বিয়ের আগেও করত, এখনও করছে।

—এভাবেই ওরা টিকে থাকবে? বলছ?

—দেখা যাক।

অয়ন সোমঋতার বিয়েটা শেষ পর্যন্ত টিকল না।

প্রথম বিবাহবার্ষিকীটা অবশ্য বেশ ঘটা করেই উদ্‌যাপন করেছিল দু'জনে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের ডেকে এলাহি আয়োজন। দেদার খানাপিনা, হল্লাগুল্লা, নাচাগানা...। সোমঋতা দিব্যি একটা সুখী সুখী মুখে ঘুরে বেড়াল সারাক্ষণ, অয়নও খুশিতে ডগমগ। দেখে মনে হচ্ছিল একটা ভাল মতন প্যাচ আপ্ বুঝি হয়ে গেছে।

কোথায় কী! অ্যানিভারসারির পর বোধহয় দুটো সপ্তাহও কাটেনি, হঠাৎ শীতের ভোরে ঝোড়ো কাকের মতো অয়ন এসে হাজির। হাতে প্রকাণ্ড একটা স্যুটকেস, কাঁধে সেই বিয়ের দিনের ঝোলাব্যাগ।

আমরা দুজনেই জোর চমকেছি। চোখ রগড়াতে রগড়াতে জিজ্ঞেস করলাম,—কী রে, কী ব্যাপার?

—ওভার। এভরিথিং ইজ ফিনিশড।

ঈশিতা ভুরু কুঁচকে বলল,—আবার কী পাকালে তোমরা?

—পাকাইনি। ছিঁড়ে ফেললাম। আমাদের রিলেশানশিপ আজ থেকে খতম।

আমাদের গলা কোরাসে বেজে উঠল,—কেনওও?

গুমগুমে স্বরে অয়ন বলল,—সোমঋতা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।

—মানে?

—মানে আবার কী! বলেছে ভাগো। অবশ্য আমিই ওকে আগে গেট আউট বলেছিলাম। আফটার অল্ ফ্ল্যাটের রেন্টটা তো আমিই দি। ব্ল্যাংক ফায়ার হয়ে গেল। সোমঋতা বলল, আমি বেরিয়ে গেলে তুমি আমার বাবার দেওয়া খাট আলমারি ফ্রিজ টিভি ব্যবহার করবে, ওটি হচ্ছে না। তুমিই কাটো। ব্যস্, আমিও উইথ ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ বেরিয়ে এলাম। একটি দিনও আর ওখানে নয়। দা কার্টেন হ্যাজ ড্রপড।

—বোস বোস। মাথা ঠাণ্ডা কর। হঠাৎ কী নিয়ে তোদের ফাটাফাটি হল?

—আমি যে ওকে খুন করিনি এ ওর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি। কী অসভ্য মেয়ে জানিস? ঠাণ্ডায় জম্পেশ করে ঘুমোচ্ছি, ওই বজ্জাত মেয়ে কম্বল সরিয়ে আমার ঘুমন্ত নাকে ফস করে ড্রপ দিয়ে দিল! এতো আমাকে মার্ডারের প্ল্যান। ওই তেতো ন্যাজাল ড্রপ যদি আমার শ্বাসনালীতে ঢুকে যেত? দ্যাট ভেরি মোমেন্ট আই হ্যাড ডিসাইডেড, ওই মেয়ের সঙ্গে আর নয়। অ্যান্ড দিস ইজ ফাইনাল ফাইনাল ফাইনাল।

এবার আর নির্দোষ জন্ডিস নয়, কেসটা হেপাটাইটিস বি-তে টার্ন নিয়েছে! বসে বসে ফোঁস ফোঁস করছে অয়ন, লাল চোখ ঘুরছে এপাশ ওপাশ! দাঁত কিড়মিড় করছে মাঝে মাঝে, যেন সোমঋতাকে সামনে পেলে এক্ষুণি চিবিয়ে খেয়ে নেবে।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল,—চলি।

—কোথায় যাবি এখন?

—হোটেল খুঁজতে। স্যুটকেসটা রইল, পরে এসে নিয়ে যাব।

—হোটেলে যাবি কেন? এখানে থেকে যা।

—হয় না। আমার জন্য তোরা কেন ডিসটার্বড হবি।

—তাহলে অন্তত নিজের বাড়িতে যা। গোলপার্কে।

—আমার কোনও বাড়ি ফাড়ি নেই। মার সঙ্গে তো কাট্টি হয়ে গেছে। আর যাকে আমি ছাড়ি, তাকে পুরোই ছেঁটে ফেলি। কথাটা সোমঋতাকেও জানিয়ে দিস।

—প্লিজ অয়ন, বি সেন্সেবল্। ঈশিতা অয়নের হাত ধরল,—সামান্য কারণে লোক হাসিও না।

—সামান্য কারণ? কী নোংরা ভাষায় আমায় অপমান করেছে জানো? বাপের দেওয়া জিনিস দেখাচ্ছে, এত বড় স্পর্ধা! কে দিতে বলেছিল ওসব ওর বাপকে? অয়ন সরকারের পয়সা ছিল না? ...ইশ, কেন যে তখন ফিফ্‌টি ফিফ্‌টিতে যাইনি!

আমাদের কোনও উপরোধকেই আমল না দিয়ে দুপদাপিয়ে বেরিয়ে গেল অয়ন। একটুক্ষণ থম মেরে বসে থেকে ঈশিতা বলল,—দাঁড়াও, সোমঋতাকে ধরি।

ঈশিতা উঠে টেলিফোনের বোতাম টিপল। শুরুটুকুই যা করতে পেরেছে, তারপর আর কথা বলার সুযোগই পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে চোখের ভাষা বদলে যাচ্ছে, আর টুকরো টুকরো ধ্বনি ফুটছে—ও মা...তাই নাকি...বলিস কী ...সর্বনাশ...! ফোনটা যখন রাখল ঈশিতার মুখে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ।

ভার গলায় বলল,—হোপলেস কেস। কিছুই আর করা যাবে না।

—এ তো জানা কথাই। সোমঋতাও তো কম জিদ্দি নয়। ও এক চুল নত হবে না।

—কেন হবে? জানো অয়ন কী করেছে? এক ফোঁটা ড্রপ দিয়েছিল বলে সপাটে চড় মেরেছে সোমঋতাকে। অবশ্য সোমঋতাও ছাড়েনি। জোর খিমচে দিয়েছে। ...ক'দিন ধরে নাকি চূড়ান্ত বাঁদরামি শুরু করে দিয়েছিল অয়ন। রাতে শুতে যাওয়ার আগে মেনের ফিউজটা খুলে নিয়ে পকেটে পুরে রাখত, যাতে সোমঋতা লাইট জ্বালিয়ে পড়াশুনো না করতে পারে। বেচারাকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে গোটা পেপার তৈরি করে, প্রিন্ট করে, পুরো রেডি করে ফেলতে হবে। এই সময়ে ওরকম নন-কো-অপারেশান কোন বউ সহ্য করবে? ...ওতো দেখলাম অয়নের চেয়ে অনেক বেশি তেতে আছে। বলছিল, যে চুলোয় খুশি যাক, আমি জীবনে ওর মুখ দর্শন করব না।

—না করাই ভাল। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। সত্যি ওরা দুজনে টোটাল মিসম্যাচ।

—হ্যাঁ, ওই নীলাঞ্জনার সঙ্গে বিয়ে হলে সোমঋতা অন্তত বেঁচে যেত।

অস্ফুটে বললাম,—কে যে বাঁচত বলা কঠিন।

—কী? কী বললে?

—না, কিছু না।

কোঁৎ করে গিলে ফেললাম কথাটা।

অ্যাদ্দিনে এইটুকু অন্তত বুঝে ফেলেছি দুনিয়ায় মেয়েরা একটা আলাদা জাত। একটা স্পেসিফিক স্পিসিস। একটা কাককে একটু বেঁধে রাখলে সব কাক যেমন একসঙ্গে কা কা করতে থাকে, মেয়েরাও যেন অনেকটা সেরকম। আর বেশি কথা বললে ঈশিতা এক্ষুণি ঠুকরে দেবে। গলা ঝেড়ে নিয়ে বললাম,—আমি বলছি কী...অয়ন এলে ওকে আর এই প্রসঙ্গ নিয়ে ঘাঁটানোর দরকার নেই।

—আমার ভারী দায় পড়েছে। তুমিও আর তোমার ওই বদমেজাজি বন্ধুটিকে প্রশ্রয় দিও না।

—দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। মিয়া বিবির বক্সিং-এ রেফারি হয়ে মরি আর কি । ওরা যা প্রাণ চায় করুক।

অয়ন সোমঋতার প্রাণ যে কী চাইবে মোটামুটি আন্দাজ করে ফেলেছিলাম। প্রায় সেই ছকেই এগোল দুজনে। অয়ন আর সোমঋতার কাছে ফিরল না, দিন কয়েক হোটেলে কাটিয়ে কিছুদিন পেয়িংগেস্ট হয়ে রইল এক বাড়িতে, মাস তিন চারেকের মধ্যেই ট্রান্সফার নিয়ে চলে গেল হেড অফিস। হায়দরাবাদ। সোমঋতাও ও বাড়ির পাট তুলে দিল, প্রত্যাবর্তন করল পিতৃগৃহে, যথাসময়ে জমা করে দিয়েছে থিসিস, অস্থায়ী চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে একটা স্কুলে। সোমঋতার বাবা মা দিদি জামাইবাবু কে না দেখা করেছে অয়নের সঙ্গে। অয়নের মা পর্যন্ত ছুটে এসেছিলেন সোমঋতাকে বোঝাতে। দৌত্য কূটনীতি, সন্ধিপ্রস্তাব, সবই বিফলে গেল। দুই বক্সারের এক রা—কভি নেহি, কভি নেহি।

তবে আমাদের সঙ্গে দুজনেরই যোগাযোগ রয়ে গেছে অল্পবিস্তর।

সোমঋতা মাঝে মাঝে ফোন টোন করে, স্কুলের গল্প শোনায়, পিএইচডি হওয়ার পর একদিন এসে লাড্ডুও খাইয়ে গেল। দেখে মনেই হয় না ওর জীবনে কোনও বিপর্যয় ঘটেছে। প্রাণবন্ত ভাবটা একটু কম বটে, তবে বিষাদের তেমন চিহ্ন নেই। শুধু কোনও কারণে অয়নের প্রসঙ্গ উঠে পড়লে চোয়ালটা কেমন শক্ত হয়ে যায়। কিংবা সামান্য উদাস হয়ে যায় মুখচোখ।

অয়নের তো বোধহয় তাও হয় না। হায়দরাবাদে দিব্যি খোসমেজাজে আছে অয়ন। প্রায় রোজই লম্বা লম্বা ই-মেল পাঠায় আমাদের। হায়দরাবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর থাকে সেখানে। হায়দরাবাদের রাস্তাঘাট কী রকম, বাড়িঘরের ভাড়ার কী রেট যাচ্ছে এখন, আলু পেঁয়াজ শশা টোম্যাটোর দাম কত, কোন মার্কেটে ভাল মাছ পাওয়া যায়, কবে কী টেম্পারেচার যাচ্ছে...কিছুই বাদ যায় না। আমরা এখন চোখ বুজে বলে দিতে পারি হায়দরাবাদের কোন দোকানের বিরিয়ানি সেরা, কোথায় দারুণ চাঁপ পাওয়া যায়, হায়দরাবাদের বিশ পঞ্চাশ কিলোমিটারের মধ্যে কোন কোন দ্রষ্টব্য স্থানে কী ভাবে বেড়াতে যেতে হবে, নিজাম প্যালেস, চারমিনার শহরের ঠিক কোথায়, বান্‌জারা হিল্‌সে বাস করে কোন কোন বিখ্যাত মানুষ...। আমরা উত্তর দিই না দিই, অয়নের ই-মেল আসবেই। তবে ভুলেও সেখানে সোমঋতার নামের আদ্যক্ষরটিও নেই।

ভারী আশ্চর্য লাগে। অয়ন সোমঋতা কি এভাবেই কাটিয়ে দেবে? ডিভোর্সটাও তো করল না! স্বামী স্ত্রী হয়েও স্বামী স্ত্রী না হয়ে রয়ে যাবে আজীবন?

আশ্চর্য হওয়ার আরও কিছু বাকি ছিল আমাদের।

কুলু মানালিতে হানিমুন সেরে আসার পর আমাদের আর তেমন বেড়ানো হয়নি কোথাও। তাছাড়া ঈশিতার কাজটাই এমন বেখাপ্পা, ওর ছুটি পাওয়াই দুষ্কর। এবার অনেক লড়ে টড়ে ক'টা দিন ম্যানেজ করে ফেলল, বিজয়া দশমীর পরের দিন আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গোপালপুর। বাসনা, কোজাগরী পূর্ণিমাটা সমুদ্রের ধারে কাটাব।

গোপালপুরে পৌঁছে একটু অসুস্থই হয়ে পড়ল ঈশিতা। গা গুলোচ্ছে, মাথা ঘুরছে... যত সব ঝঞ্ঝাটিয়া উপসর্গ। তারই মধ্যে বিকেলবেলা হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। সমুদ্রের পাড় ধরে। এলোমেলো। উদ্দেশ্যহীন।

হঠাৎই সামনে পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়।

অয়ন আর সোমঋতা!

অয়নের হাত সোমঋতার কাঁধে, সোমঋতার হাত বেড় দিয়ে আছে অয়নের কোমর। গভীর প্রেমে তন্ময় হয়ে হাঁটছে দুজনে।

চেপে চেপে চোখ রগড়ালাম। যা দেখছি তা সত্যি তো?

ডাকব, কী ডাকব না ইতস্তত করছি, তখনই অয়ন দেখতে পেয়ে গেছে আমাদের। সেই বিয়ের দিনের মতো লাজুক লাজুক মুখে এগিয়ে এল দুটিতে। অয়ন বলল,—তো-তো-তোরা এখানে?

—আমরা তো আসতেই পারি। তোরা কোথ্থেকে?

—ফ্রম আওয়ার ওউন প্লেসেস। অয়নের হাসি চওড়া হল,—আমি ফ্রম হায়দরাবাদ। ও কলকাতা।

ঈশিতার চোখ বড় বড়,—তোমাদের মিটমাট তাহলে হয়ে গেছে?

অয়নের বদলে সোমঋতাই উত্তর দিল,—কিসের মিটমাট? আমরা তো এখানেও একসঙ্গে থাকছি না।

অয়ন ভুরু নাচাল,—ইয়েস। সোমঋতা আর আমি আলাদা আলাদা হোটেলে আছি। উই মিট অন দা বিচ। কখনও কখনও এ ওর ঘরে যাচ্ছি, দু-চার ঘণ্টা কাটাচ্ছি, আবার ঢুকে পড়ছি যে যার গলতায়। অনেক ভেবে দেখলাম এক ছাদের নীচে আমরা বাস করতে পারব না, আবার কেউ কাউকে পুরোপুরি ছেড়ে থাকতেও পারব না...তাই এই ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি বন্দোবস্ত। মোটামুটি হায়দরাবাদ আর কলকাতার মাঝামাঝি মিট করছি আমরা। আগের বার দেখা হয়েছে আরাকুভ্যালিতে, নেক্সট বার হয়তো মিট করব কোনও জঙ্গলে। ভূতটাকে টাইটে রাখার এটাই বেস্ট উপায়।

—ভূত? আমি আর ঈশিতা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম,—কোন ভূত?

সোমঋতা ফিক করে হাসল,—যে ভূতটা আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধায়।

হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে গেল দুই মূর্তি। ক্রমশ দৃষ্টিসীমার বাইরে। আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। উঁহু, হতভম্ব নয়, হতবাক। সোমঋতা আর অয়ন দুজনেই কি বদ্ধ উন্মাদ?

সূর্য ডুবছে। শেষ বিকেলে সমুদ্রের নীল এখন প্রায় বর্ণহীন। দূরে একটা

মাছ ধরার নৌকো। ঢেউ-এর দোলায় উঠছে, নামছে। চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছে কখনও বা। আবার পরমুহূর্তে জানান দিচ্ছে সে আছে, সে আছে।

অনেকক্ষণ পর ঈশিতা কথা বলল। বুঝি বা ওই নৌকোটাকে দেখতে দেখতে। ইশিতার স্বরে মুগ্ধতার ঘোর,—সোমঋতাদের আইডিয়াটা কিন্তু দারুণ, তাই না?

—দারুণ নয়, বলো বিটকেল।

—মোটেই না। খুব ভাল। এই যে আমরা একসঙ্গে আছি, রোজই কিছু না কিছু নিয়ে মনোমালিন্য হচ্ছে, কথা কাটাকাটি হচ্ছে...তোমার মনে হয় না, সম্পর্কটা ক্রমশ স্টেল হয়ে যাচ্ছে? আমরাও যদি ওদের মতো দূরে দূরে থাকতে পারতাম! বছরে একবার কি দুবার দেখা হত...কখনও জঙ্গলে, কিংবা কোনও পাহাড়ে...

—অথবা কোনও সমুদ্রের পারে। বলেই আমি হেসে উঠলাম। আলগা ঠেললাম ঈশিতাকে, —যাও না, তাই থাকো না।

—আহা, সে উপায় বুঝি রেখেছ?

—আটকাচ্ছে কিসে?

—তুমি একটি গবেট। এখনও টের পাওনি?

—কী?

—ইশ, আমি বলে ভেবে ভেবে মরছি, কবে থেকে ছুটি নিতে হবে, কলিগরা কী ভাববে, আবার কদ্দিন পরে কাজে জয়েন করতে পারব...

—ছুটি? কেন?

—আমি প্রেগন্যান্ট। ঈশিতা আমার নাক নেড়ে দিল,—বুঝলে ভোম্বল, আমাদের মধ্যিখানে একজন আসছে।

ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছি ঈশিতাকে। তিরতির সুখ কাঁপছে ঈশিতার দু-চোখে। ওই কাঁপন ছড়িয়ে গেল আমার বুকে। শিরায়। উপশিরায়।

বুঝতে পারছিলাম না কোন্‌টা ভালবাসা? আমাদের এই বন্ধন? না অয়ন সোমঋতার ওই দূরে দূরে থাকা? নাকি দুটোই? ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি!

অন্য সুখ

প্রথমটা দেখে চিনতেই পারিনি। নিতান্ত সাদাসাপটা চেহারার মাঝবয়সী একটা লোক, পরনে ট্রাউজার-বুশশার্ট, মাথা জোড়া চকচকে টাক—এমন দর্শনধারী সাধারণ মানুষ আমার ভক্তদের ভিড়ে মোটেই বিরল নয়। একটু সামনে এসে দাঁড়ানোর সুযোগ পেলেই ধন্য হয়ে যায় এরা, গদগদ মুখে অটোগ্রাফ চায়, কিম্বা হেঁ হেঁ হেসে বলে, আপনার গলা কী অসাধারণ...আপনার গান যে আমি কী ভালবাসি...!

লোকটা অবশ্য ওসব কিছুই বলল না। হাতদুটো জড়ো করে কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলল,—আমায় চিনতে পারা যাচ্ছে কী?

এতক্ষণ একটানা পনেরোখানা গান গেয়ে সবে নেমেছি স্টেজ থেকে, বেশ ঝিমঝিম করছে মাথাটা। তাছাড়া আজকাল আধচেনা সিকিচেনা লোকেরাও তো আমার সঙ্গে এভাবে ভাব জমাতে আসে। কবে হয়তো কোথাও কারুর সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলেছিলাম, কিম্বা হয়তো আত্মীয়তার সূত্রে তুতোর তুতো কেউ, সকলেই পূর্ব পরিচয়ের একটা সুতো ধরে টানতে চায়! খ্যাতির গায়ে গা ঘষে নেওয়ার চেষ্টা আর কি!

ভুরু কুঁচকে বললাম,—না মানে...আমি তো ঠিক...

—শ্যামবাজারে কোনও দিন থাকা হতো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু...

—সমীরকে মনে পড়ে? সমীর দত্ত? দত্তবাড়ির...?

—ওহো, সমীর! তুমি... মানে তুই সমীর?

—চিনেছিস তাহলে? আমি তো ভাবছিলাম তোর এখন যা নামডাক, হয়তো পুরোন লোকদের আর...

স্টেজ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে গুণমুগ্ধরা ছেঁকে ধরেছে আমাকে। ইদানীং ফাংশানে গেলেই এভাবে জনতা পরিবৃত হয়ে যাই। তাদের দিকে ঝলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে হাসিটাকে চওড়া করলাম,—ফ্র্যাংকলি স্পিকিং, এক চান্সে সত্যিই চিনিনি। চেহারাখানা এমন বুড়োটে মার্কা বানিয়ে ফেললি কী করে? মাথার চুলগুলোও তো সব প্রায় সাফ করে এনেছিস?

সমীর শুকনো হাসল,—সবই সময়ের লীলা রে ভাই। সময় যে কাকে কখন কোথায় নিয়ে যায়!

কথাটায় কি কোনও চাপা বেদনা আছে? নাকি ঈর্ষা? এই সমীর এককালে কী ঠাটবাটেই না থাকত। বাপের পয়সা ছিল, নিজেও দিব্যি ভাল চাকরিতে ঢুকে পড়েছিল, সর্বদা ড্রেস-টেস মেরে টিপটপ, মোটরসাইকেল হাঁকিয়ে টগবগিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে...। তুলনায় আমি তো তখন ভিখিরি। এদিক-ওদিক গানের টিউশনি করে বেড়াই, বাবা রিটায়ার করে গেছে, দুটো বোনের একটারও তখন বিয়ে হয়নি...। তার মধ্যেও প্রাণপণে গান নিয়ে লড়ে চলেছি। ছোটামোটা ফাংশানে চান্স পাওয়ার জন্য ঘুরছি ফ্যা ফ্যা করে। মনে আছে অলক যেন কাকে একবার ধরে করে সোনারপুরে একটা প্রোগ্রাম জোগাড় করল। ছোট্ ছোট্ শ্যামবাজার থেকে সোনারপুর। মেইন আর্টিস্টরা পৌঁছোনর আগে আসর গরম করার জন্য পর পর গান গেয়ে গেলাম। হারমোনিয়ামে আমি, তবলায় অলক। টানা ঘণ্টা দেড়েক সঙ্গীত পরিবেশনের পারিশ্রমিক কত? একটা মাত্র পঞ্চাশ টাকার নোট! তার থেকে আমিই বা কী রাখব, অলককে বা কী দেব? ধুত্তোর বলে ঠিকই করে ফেলেছিলাম আর গান গাইবই না। সেই অবস্থা থেকে লড়ে লড়ে...

এ কি শুধুই সময়ের লীলা? সাধনাটা কিছু নয়? পরিশ্রমটা? এঁটুলির মতো লেগে থাকাটা?

কথাটা অবশ্য পলকের জন্য মনে হলো আমার। পলকে উবেও গেল। চারপাশ থেকে সইশিকারীরা অটোগ্রাফ খাতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। মুখে একটা ইলাস্টিক হাসি টেনে খচাখচ সই দিয়ে চলেছি।

সমীর একটু সরে দাঁড়িয়েছিল। ভিড় সামান্য হাল্‌কা হতে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে বলল,—চলবে?

—না রে। ছেড়ে দিয়েছি। গলার অসুবিধে হয়।

—বেশ করেছিস। ভাল করেছিস। সমীর নিজে একটা সিগারেট ধরিয়েছে,—তোকে দেখে যা আনন্দ হচ্ছে না। এতদিন শুধু তোর পপুলারিটির কথা শুনেছি, আজ চাক্ষুষ দেখলাম। সত্যি, কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছিস রে তুই। গর্ব গর্ব, তুই আমাদের গর্ব।

এ ধরনের স্তুতিও শুনে শুনে আমি অভ্যস্ত। তবু আলগা হেসে বললাম,—একদিনে কি আর পৌঁছেছি রে ভাই? প্রচুর ঘাম ঝরেছে।

—বটেই তো। সাকসেস কি এমনি এমনি আসে? সমীর মাথা দোলাল,—তবে তোর মধ্যে ট্যালেন্টটাও ছিল। আমি জানতাম তুই একদিন ঠিক নাম করবি।

এসব বাক্যও অহরহ শুনি এখন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই নাকি জানত আমি একদিন না একদিন গান দিয়ে ভুবন জয় করবই। এমনকি যারা একদিন আমার সঙ্গীতচর্চাকে ব্যঙ্গ করেছে, তারাও।

তবু আজ সমীরের মুখ থেকে শুনতে বেশ লাগছিল। একটা অন্য ধরনের তৃপ্তি পাচ্ছিলাম যেন। এই সমীরের কাছেই একবার আমি হাজার দশেক টাকা ধার চেয়েছিলাম না? বনুর বিয়ের সময়ে? ইচ্ছে করলেই দিতে পারত সমীর, দেয়নি।

ঘটনাটা দুম করে মনে পড়ে গেল। বোধহয় সমীরের সঙ্গে আজ দেখা হলো বলেই...

সমীরের সঙ্গে সম্পর্কটা কি তখন থেকেই ছিঁড়ে গিয়েছিল? আমরা আমাদের শ্যামবাজারের বাড়ির ভাগ বিক্রি করে গড়িয়ায় ভাড়া চলে গেলাম কবে? বনুর বিয়ের পর? না টুলুর? দুৎ, মনে পড়ছে না।

আমার মিউজিকহ্যান্ডরা বাজনার যন্ত্রপাতি তুলতে শুরু করেছে গাড়িতে। অলকই সব গোছগাছ করছে, সঙ্গে বাবলু, রমেন আর পুলু।

—হুঁ। যাই।

অবশ্য যাই বললেই পার্থসারথি সেনের নড়ার উপায় কই? আধুনিক বাংলা গানের দুনিয়ায় সত্যি তো আমি এখন রীতিমতো একটা নাম। যেখানেই গান গাইতে যাই, শ্রোতা উপচে পড়ে। মাস দুয়েক আগে একখানা ক্যাসেট বেরোল, সেটাও গোল্ডেন ডিস্ক। এখনও এক ঝাঁক মেয়ে ঘিরে ধরেছে আমায়। এক সুন্দরী টুক করে আমায় একটু ছুঁয়ে নিল। লাজুক হাসিতে মেয়েদের এই নীরব নিবেদনও তো আমাকে একটু উপভোগ করতেই হয়।

প্রমীলাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সমীরকে বললাম,—তুই কি আরও কিছুক্ষণ আছিস? না যাবি?

সমীর জোরে জোরে মাথা নাড়ল,—না না, আমি তো শুধু তোর জন্যই এসেছিলাম।

—তো আয়, তোকে নামিয়ে দিই। শ্যামবাজার যাবি তো?

—না রে, আমি এখন থাকি উল্টোডাঙায়। ট্রেনেই চলে যাব।

—আহা ট্রেনে কেন, আমার গাড়িতো উল্টোডাঙা দিয়েই যাবে। চল্।

সমীর তবু ইতস্তত করছে,—তোর গাড়িতে এত লোক, জায়গা হবে কিনা...

—আরে বাবা, আমার টাটা সুমো। ছজন কেন, হেসে খেলে দশজন ধরে যায়। চল্ চল্, উঠে পড়।

দোনামোনা করে সমীর উঠল গাড়িতে। সামনের সিটে বসেছে, পাশে আমি।

স্টার্ট দিল টাটা সুমো। চলছে বি টি রোড ধরে। খানাখন্দ বাঁচিয়ে।

সমীরকে জিজ্ঞেস করলাম,—হঠাৎ উল্টোডাঙায় চলে গেলি যে? ওদিকেও তোদের কোনও বাড়ি-টাড়ি ছিল নাকি?

—না না, ভাড়া থাকি।

—সে কী রে? তোদের শ্যামবাজারের বাড়ি কী হলো?

সমীর গলা নামাল,—সে তো অনেককাল আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। বাবার বিজনেসটা ডাউন হয়ে গেল, বাজারে প্রচুর দেনা...সামাল দিতে গিয়ে মর্টগেজ রেখেছিল একজনের কাছে, আর ছাড়াতে পারল না।

—ও। ...মাসিমা-মেসোমশাই আছেন কেমন?

—বাবা তো অনেককালই নেই। প্রায় পনেরো বছর। ...মা এখনও আছে টিকে। প্রায় না থাকারই মতো।

—মানে?

—সেরিব্রাল হয়ে জড়ভরত মতো হয়ে গেছে। নড়তে-চড়তে পারে না, বিছানাতেই পুঁটলি হয়ে পড়ে থাকে। সমীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল,—আমারই হয়েছে যত হ্যাপা। বড়দা-বউদি তো আগেই কেটে পড়েছিল, পল্টু তো বিয়ে করেই আলাদা হলো...সব ঝামেলা এখন আমার ঘাড়ে। খুকুরও বিয়েটা ভেঙে গেল, ছেলে নিয়ে সেও এখন আমার কাছে।

এককালের ফান্টুস সমীর দত্ত এখন তাহলে বেশ গাড্ডায় আছে? চোখ কুঁচকে বললাম,—তুই এখনও সেই চাকরিতেই আছিস? কোথায় যেন ছিলি? কী এক ওষুধ কোম্পানিতে?

—সে কোম্পানি কোথায় এখন! সমীর আর একটা শ্বাস ফেলল,—তাদের গেটের তালায় বোধহয় অ্যাদ্দিনে মরচে পড়ে গেল।

—তাই? তুই তাহলে করছিস কী এখন?

—অর্ডার সাপ্লাই-এর বিজনেস করি। গভর্নমেন্ট অফিসে টুকটাক মালপত্র দিই।

—সেও তো ভাল বিজনেস রে। ইন্‌ভেস্টমেন্ট কম, রোজগারপাতিও নিশ্চয়ই মন্দ হয় না...

—ধুর, পেমেন্ট বার করতে জুতোর সুখতলা খয়ে যায়। একে তেল মারো, ওকে মাল খাওয়াও...। আপন মনে মাথা নাড়ছে সমীর,—হচ্ছে না রে কিছু...চলছে না। এই তো আজই ব্যারাকপুরে একটা পেমেন্ট নিতে এসেছিলাম। সাত মাসের পুরোন বিল, ফের ঘুরিয়ে দিল আজ। বাড়িই ফিরছিলাম, হঠাৎ তোর ফাংশানের বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ে গেল। ভাবলাম, কতকাল দেখা হয়নি...তোর এখন এত ফেম....একবার তোকে দেখেই যাই।

—খুব ভাল করেছিস। আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে তোকে দেখে।

ফাঁপা শোনাল কি কথাটা? সমীরকে দেখে সত্যিই কি আনন্দিত হওয়ার মতো কিছু আছে এখন? আমার কথা অবশ্য সমীরকে ছোঁয়নি তেমন, কোনও ভাবান্তর নেই। একই রকম বিমর্ষ ভাব।

আলগা ভাবে বললাম,—তোর সঙ্গে কদ্দিন পর দেখা হলে বল তো? প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বছর?

—হুঁ, তা তো হবেই। তোরা যখন পাড়া ছাড়লি, তখনও তো আমার বিয়ে হয়নি। এখন আমারই মেয়ের বিয়ে হব হব করছে।

এটাই তো স্বাভাবিক। নয় নয় করে আমার মেয়েও তো ষোলোয় পড়ল। আমি খানিকটা দেরি করেই বিয়ে করেছিলাম, তবুও।

অকারণেই গলায় খানিকটা বিস্ময় আর খুশি ফোটালাম,—বলিস কী রে? এত বড় হয়ে গেছে তোর মেয়ে?

—হ্যাঁ, একুশ হলো।

—কবে বিয়ে?

—দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি। ইচ্ছে আছে ফাল্গুনে দেব। মেয়ে অবশ্য নিজেই পছন্দ করেছে। তবু বাবা হিসেবে আমার তো একটা কর্তব্য আছে। খালি হাতে তো আর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে পারব না।

দশ হাজার টাকার ব্যাপারটা আবার মাথায় চিড়িক দিয়ে উঠল, বললাম,—হুম। বিয়ে মানে তো অনেক খরচ।

—সেটাই তো ভাবনা। কী করে যে কী করব?

—হয়ে যাবে। ভাবিস না। হাত রাখলাম সমীরের কাঁধে। হাল্‌কা সুরে বললাম,—তা আমায় নেমন্তন্ন করছিস তো?

—তুই আসবি? আসবি তুই?

—কেন আসব না? তুই আমার ছোটবেলার বন্ধু...। আমার ঠোঁটে একচিলতে হাসি ফুটে উঠল,—তোর বিয়েটা মিস্ হয়ে গেছে, তোর মেয়ের বিয়েতে আমি ফাঁক পড়তে চাই না।

সমীর কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। ফ্যালফ্যাল চোখে দেখছে আমাকে। যেন পরখ করতে চাইছে বিখ্যাত গায়ক পার্থসারথি সেন তার সঙ্গে তামাশা করছে কিনা। মুখে আর কথা ফুটছে না কোনও। বোধহয় ভেবে পাচ্ছে না এই মুহূর্তে তার কী বলা উচিত।

আমিই যেচে গল্প শুরু করলাম। টুকটাক কথা। আমার বাড়ির গল্প। মা বাবা বউ মেয়ে, আরও নানান হাবিজাবি। একটা-দুটো প্রশ্ন করছিল সমীর। আড়ষ্ট ভাবে।

রাস্তা ফাঁকাই ছিল। হু হু করে শ্যামবাজারে পৌঁছে গেল গাড়ি। বাঁ দিকে ঘুরে দীনেন্দ্র স্ট্রিট ধরল টাটা সুমো। পার হচ্ছি দেশবন্ধু পার্ক, আমাদের পুরোনো আড্ডার জায়গা। এদিক দিয়ে যখনই যাই, একবার করে চোখ চলে যায়। একটা চিনচিনে ব্যথা হয় বুকে। বহু পুরোনো স্মৃতি ভিড় করে মাথায়। সবই প্রায় দুঃখের। অপমানের।

উল্টোডাঙার কাছে আসতেই কথা বলে উঠল সমীর,—এই দাঁড় করা, দাঁড় করা, এসে গেছি।

টাটা সুমো ফুটপাথ ঘেঁসে দাঁড়াল। আমি এদিক-ওদিক তাকালাম,—কোন দিকে তোর বাড়ি?

—এই তো, একটুখানি হাঁটতে হবে।

—হাঁটবি কেন? চল তোকে বাড়িতেই নামিয়ে দিই।

—বাড়ি অব্দি যাবে না রে গাড়ি। আমাদের রাস্তাটা খুব সরু, তোর টাটা সুমোর অসুবিধে হবে। গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে সমীর। হাতে হাত রাখল আমার,—ডেট ফাইনাল হয়ে গেলে আমি তোকে বাড়ি গিয়ে বলে আসব। সবাই আসবি কিন্তু।

—ও শিওর। পকেট থেকে আমার একটা কার্ড বার করে দিলাম,—আমার ঠিকানাটা রাখ। আমি এখন সল্টলেকে আছি। বলেই গলাটা সামান্য নামালাম,—মেয়ের বিয়ে নিয়ে বেশি টেনশান করিস না। দরকার হলে আমায় বলিস। যতটা যা পারি...টাকা দিয়ে, কিম্বা অন্য কোনও ভাবে...

কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল সমীরের মুখখানা। মনে হলো চোখ দুটো চিকচিক করছে। মাথা নামিয়ে নিল আস্তে আস্তে। তারপর ধীর পায়ে চলে যাচ্ছে।

ফের গাড়ি স্টার্ট দিতেই ঘাড় ঘোরালাম,—চিনতে পারলি মালটাকে?

—আমার মেমারি অত দুর্বল নয়। অলক ঘড়ঘড়ে গলায় বলল,—ও তো সেই তোদের পাড়ার কাপ্তেন। তোকে খুব হ্যাটা করেছিল না একসময়ে?

—হ্যাঁ। বনুর বিয়েতে ধার চেয়েছিলাম, বুড়ো আঙুল দেখিয়েছিল। মৃদু হেসে উদাস গলায় বললাম,—মাঝরাত্তিরে মার অ্যাপেনডিক্সের পেইন উঠল, সমীরকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম ওদের গাড়িটা বার করার জন্য, স্ট্রেট বলে দিল ক্লাচ গড়বড় করছে।

রমেন বিস্মিত স্বরে বলল,—তাও তুমি ওকে হেল্প করবে বললে? স্ট্রেঞ্জ!

পুলু বলল,—সত্যি পার্থদা, তোমার মাথায় ক্যারা আছে। হঠাৎ ওই লোকটাকে এত মহানুভবতা দেখাতে গেলে কেন?

উত্তর দিলাম না। হঠাৎই একটা চোরা সুখ কুলকুল করছে বুকে। জীবনের প্রতিটি প্রতিশোধের চেহারা কি একরকম হয়?

আয়নার মুখ

অফিস থেকে ফিরে জামাকাপড় বদলাচ্ছিল অশোক। রুমা শোওয়ার ঘরে এসে বলল,—জানো, আজ একজন ফোন করেছিল।

—কে?

—গেস্ করো তো কে! রুমা চোখ ঘোরাল,—সামওয়ান আন্-এক্সপেক্টেড।

কোনও কোনও সময়ে রুমার রহস্য করার অভ্যেসটা উপভোগই করে অশোক। তবে এখন মোটেই পছন্দ হল না। হাক্লান্ত হয়ে বাড়ি ঢুকে এসব লুকোচুরি খেলা কারুর ভাল লাগে?

ভুরু কুঁচকে অশোক বলল,—বলার হলে বলো, নইলে আমি বাথরুমে যাচ্ছি।

—চটছ কেন? নাম শুনলে তুমি চমকে উঠবে। ধনরাজ।

—কে ধনরাজ? অশোক সত্যিই চমকেছে,—আমাদের সেই পুরীর ধনরাজ?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। ধনরাজ রাও। সাইক্লোনে ওদের একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেছে। বাড়িঘর সব নাকি ভেঙেচুরে একাকার।

দিন পনেরো হল ভয়ঙ্কর এক ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে ওড়িশার ওপর দিয়ে। ঝড়ের তাণ্ডবে মারা গেছে হাজার হাজার লোক, লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্বান্ত। এমন মারাত্মক প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝা ভারতবর্ষে বহুকাল আসেনি।

অশোক চিন্তিত মুখে জিজ্ঞেস করল,—কোথ্থেকে ফোন করেছিল?

—এখানে এসেছে। কলকাতায় ভবানীপুরে এক আত্মীয় আছে, তার কাছে।

—এ সময়ে দেশ ছেড়ে চলে এল?

—শখ করে কী আর এসেছে! নিশ্চয়ই সাহায্যের আশায়...। কাল আমাদের বাড়ি আসবে। বেচারাকে আমাদের কিছু দেওয়া উচিত, কী বলো?

—হুম্।

অন্যমনস্ক ভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে বাথরুমে চলে গেল অশোক। ধনরাজের মুখটা মনে পড়ছে বারবার। এ বছরই আলাপ ধনরাজের সঙ্গে। ছেলের অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর পুরী বেড়াতে গিয়েছিল, তখন।

আলাপটা ঘটেওছিল ভারী বিচিত্র এক পরিস্থিতিতে।

সমুদ্রে তখন উদ্দাম স্নান করছিল জোজো। সদ্য সাঁতার শিখেছে সুইমিং ক্লাবে, সেই জোশে ঢেউ ভেঙে ভেঙে চলে যাচ্ছিল ভেতরে। সারাক্ষণ অশোক সঙ্গেই ছিল ছেলের, একবার বুঝি পাড়ে উঠে এসেছে রুমার পাশে, আলগা হাসি ঠাট্টা করছে, হঠাৎই সমুদ্রে শোরগোল।

জোজো ডুবে যাচ্ছে!

সমুদ্রের অনেকটা গভীরে চলে গেছে জোজো! প্রাণপণে হাত পা ছুঁড়ছে ফিরে আসার জন্য, পারছে না!

কয়েকে সেকেন্ডের জন্য অশোক কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারপরই উদ্‌ভ্রান্তের মতো নেমেছে জলে। সমুদ্রে ভরা জোয়ার, ঢেউ-এর ধাক্কায় জোজো আছড়ে আছড়ে পড়ছে বারবার। রুমা ডুকরে উঠল। জোজোকে আর দেখা যাচ্ছে না! উঁহু, যাচ্ছে। কালো বিন্দুর মতো দেখা দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে জোজো।

ঠিক সেই সময়েই ধনরাজের আবির্ভাব। না, ঠিক আবির্ভাব নয়, ধারেকাছেই ছিল লোকটা, বালিতে ঘুরে ঘুরে ইচ্ছুক স্নানার্থীদের ছবি তুলে

বেড়াচ্ছিল। ক্যামেরা ফেলে লোকটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ মারল সমুদ্রে, মিনিট কয়েকের মধ্যেই জোজোকে উদ্ধার করে এনে দিল পাড়ে। তেমন একটা জল খায়নি জোজো, তবে বারো বছরের ছেলেটা ভয়ে তখন প্রায় আধমরা।

কী করে ধনরাজকে কৃতজ্ঞতা জানাবে ভেবে পাচ্ছিল না অশোক-রুমা। দু'জনে প্রায় হাত ধরে হোটেলে টেনে নিয়ে এল পরিত্রাতাকে, জোর করে হাতে একটা একশো টাকার নোট গুঁজে দিল।

ধনরাজ না না করছিল খুব। বলছিল, আপনারা আমাদের এখানে বেড়াতে এসে বিপদে পড়েছেন, সাহায্য করা তো আমাদের কর্তব্য। এর জন্য মূল্য নেব কেন?

সাদাসিধে কালোকুলো দরিদ্র চেহারার লোকটার কথায় অশোক অভিভূত। বলেছিল,—এভাবে ভাবছ কেন? মনে করো না বড় দাদা ভাইকে ভালবেসে দিচ্ছে!

রুমা বলেছিল,—এটা না নিলে আমরা কিন্তু খুব দুঃখ পাব ভাই।

ধনরাজ তারপর আর আপত্তি করেনি। টাকা নিয়ে চলে গেছিল। পরিচয়টা আরও ঘন হলো বিকেলবেলায়। সমুদ্রের পাড়ে বসে তখন অস্তগামী সূর্যের আলোয় অন্তহীন জলরাশির শোভা দেখছিল অশোক-রুমা। জোজো তখন বালিতে ঘুরে ঘুরে ঝিনুক কুড়োচ্ছে।

তখনই আবার কোথ্থেকে ধনরাজের উদয়। শেষ বিকেলে আর কাঁধে ক্যামেরা নেই, তার বদলে ইয়া এক ঝোলা। অশোক-রুমার সামনে এসে ঝুপ করে বসল। এক গাল হেসে বলল,—শঙ্খ নেবেন বউদি? সমুদ্রের ফেনা? মুক্তো?

অশোক রীতিমতো অবাক,—তুমি তো ছবি তোলো হে! এসবও করো নাকি?

—আরও অনেক কিছু করি দাদা। অথবা বলতে পারেন কিছুই করি না।

—মানে?

—মানে আর কী! যখন যা প্রাণ চায় তাই করি, আমার কোনও বাঁধাধরা কাজ নেই। এই তো কালই ভোরে, জাপানীদের একটা গ্রুপের সঙ্গে কোণার্ক চলে যাব।

—তাই নাকি? অশোকের চোখ কপালে,—তোমায় তো ভাল করে কালটিভেট করতে হয় দেখছি!

লোকটার সঙ্গে অশোকদের বেশ জমে গেল এর পর। আশ্চর্য, শাঁখ বেচাতেও ধনরাজের তেমন আগ্রহ নেই, নিজের জীবনকাহিনী রসিয়ে রসিয়ে বলে চলেছে। তিন পুরুষ ধরে ধনরাজরা এই পুরীরই বাসিন্দা, কিন্তু আদতে তারা নাকি অন্ধ্রপ্রদেশের লোক। পরিবারের পেশা মাছ ধরা, অর্থাৎ জাতে তারা ধীবর। ধনরাজের বাবা নেই, দাদা-কাকা এখনও নিয়মিত সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। ধনরাজই পরিবারের দলছুট। মাছ ধরতেও তার ভাল লাগে না, দিনের পর দিন জলে ভেসে থাকতেও না। বরং হরেক রকম লোকজনের সঙ্গে মেলামেশাতেই তার বেশি আনন্দ। বিদেশী-বিদেশিনীদের সঙ্গেও দিব্যি টকাটক আলাপ জমিয়ে ফেলে। কখনও শাঁখ-ঝিনুক বেচার সূত্রে, কখনও বা নুলিয়া হয়ে সমুদ্রস্নানে সাহায্য করার সুবাদে। সেই আঠেরো-উনিশ বছর বয়স থেকেই টুরিস্টদের সঙ্গে গোটা ওড়িশার সমুদ্র উপকূল চষেছে ধনরাজ। আজ পুরী, তো কাল গোপালপুর। এই কোণার্ক ছুটল, তো এই চাঁদিপুর, পারাদীপ। বছর কয়েক হলো অবশ্য একটু থিতু হওয়ার চেষ্টা করছে। বিয়ে করেছে, বাচ্চাও হয়েছে, এখন আর বোহেমিয়ানের মতো অত উড়ে বেড়াতে পারে না। ফটোগ্রাফির পেশাটাও শুরু হয়েছে এক আমেরিকান ট্যুরিস্টের কল্যাণে। বুড়ো-বুড়ি স্বামী-স্ত্রী ভারত ভ্রমণে এসেছিল, ধনরাজ বুড়িকে নিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে সমুদ্রের অনেক গভীরে চলে যেত, বুড়ো মোহিত হয়ে দামী ক্যামেরাটা উপহার দিয়ে গেছে ধনরাজকে। এখন ট্যুরিস্টদের ছবি তুলে, চেনা স্টুডিওতে প্রিন্ট করিয়ে হোটেলের রুমে রুমে ডেলিভারি দিয়ে আসে। রোজগার মোটামুটি মন্দ হয় না। সঙ্গে শাঁখ-টাখ বিক্রি তো আছেই। শাঁখ অবশ্য ধনরাজ মহাজনদের কাছ থেকে আনে না, পারিবারিক সংগ্রহ। সমুদ্রের তলদেশ থেকে। দুষ্প্রাপ্য শাঁখের সঙ্গে কখনও কখনও মাছের জালে উঠে আসে ঝিনুকসুদ্ধ মুক্তোও। বাড়ির মধ্যে ধনরাজই বেশি বলিয়ে-কইয়ে বলে তাকেই বিক্রিবাট্টার ভার দিয়েছে দাদা-কাকারা।

ইদানীং অন্য একটা বাসনাও জেগেছে ধনরাজের মনে। ট্যুরিস্টদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো এবার ছেড়ে দেবে, নিজের একটা স্টুডিও করবে পুরীতে। একেবারে নিজস্ব। ডার্করুমের অন্ধকারে নিজের হাতে ফুটিয়ে তুলবে মানুষের

সমুদ্রস্নানের সুখী সুখী মুহূর্তগুলোকে।

শুনতে শুনতে অশোক-রুমা চমৎকৃত। জোজোর চোখ গোল গোল। সে আরও মুগ্ধ ধনরাজের অনর্গল বিদেশী ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা দেখে। পেটে মাত্র ক্লাস ফোরের বিদ্যে, অথচ কী অবলীলায় রাশিয়ান জার্মান ফ্রেন্চ জাপানিজ আওড়ায়! ঠিক বলছে না ভুল বোঝার উপায় নেই। তবে তার বাচনভঙ্গিটি নিখুঁত। ঠিক যেন নিখাদ বিদেশী! শুধুমাত্র শুনে শুনেই এত ভাষা শিখে ফেলেছে লোকটা? ভাবা যায়!

পুরী থেকে চলে আসার দিন আবার একবার দর্শন মিলেছিল ধনরাজের। সেদিন জোজোকে সমুদ্রের অনেকটা ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল ধনরাজ। বড় বড় ঢেউদের ওপারে। শান্ত সমুদ্রে। যখন জল ছেড়ে উঠল, জোজোর চোখে ধনরাজ তখন মস্ত হিরো। শাহরুখ-শচীন গোছের কেউ।

সেই ধনরাজ এখন কলকাতায়! সর্বস্বহারা!

ঈষৎ ভার মনে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল অশোক। অঘ্রানের শুরু, এ বছর এখনও তেমন ঠাণ্ডা ভাব আসেনি। পাখাটা তিন পয়েন্টে দিয়ে সোফায় এসে বসল। টিভি চালিয়েছে, লো ভলিউমে। জোজো পড়ছে, টিভির আওয়াজ কানে এলেই উঠে আসবে, উঁকিঝুঁকি মারবে।

রুমা সেন্টার টেবিলে জলখাবার রেখে গেল। দু'কাপ চা নিয়ে এসে বসেছে। টিভিতে ওড়িশারই দৃশ্য। মর্মান্তিক। বীভৎস। জীবজন্তু পচে ফুলে আছে। গ্রামের পর গ্রাম একেবারে ন্যাড়া, কোথাও এতটুকু সবুজের চিহ্ন নেই। বুভুক্ষু মানুষের মিছিল চলেছে, খাবারের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে শয়ে শয়ে শীর্ণ শরীর।

রুমা ফোঁস করে শ্বাস ফেলল,—সত্যি, স্টেটটার ওপর দিয়ে যা গেল!

অশোক চায়ে চুমুক দিল, —সাইক্লোনটা আমাদের এখানেও আসতে পারত। কী অবস্থা হতো তখন ভাবতে পারছ?

—ভাগ্যিস! টিভি থেকে চোখ সরিয়ে নিল রুমা,—এই, তুমি পরোটা আগে না খেয়ে চা খাচ্ছ কেন?

—খাব। আগে মাথাটা একটু ছাড়াই। অশোক সোফায় হেলান দিল,—আচ্ছা, ধনরাজ কি সাহায্যের কথা কিছু তোমায় বলছিল?

—মুখে বলেনি, তবে গলাটা যা কান্না কান্না...! আমাদের বাড়ির

ডিরেকশান-ফিরেকশান ভাল করে জেনে নিল। সাহায্যই চাইতে আসবে মনে হয়।

—হুম্। কী দেওয়া যায় বলো তো?

—সবাই যা দেয় তাই দেব। পুরনো জামাকাপড়।

—আমার আর পুরনো শার্ট-প্যান্ট কোথায়? তোমার বাসন রেখে রেখে যা অবশিষ্ট পড়ে ছিল, সবই তো রোববার পাড়ার ছেলেগুলো ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল। তার আগে পার্টির ছেলেরা...। এত ত্রাণের ধুম পড়েছে, পুরনো জামাকাপড় আর থাকবে কোথ্থেকে?

—যা বলেছ। বাচ্চাদের জন্য জামাপ্যান্ট দেব, তাই বা কোথায়? এই তো জোজোর একগাদা ছোট ছোট শার্ট-প্যান্ট ওদের স্কুলের রিলিফ বক্সে ঢেলে এলাম। আর আমার শাড়ি তো পুরনো হলেই সরস্বতীর মা জমাদারনি সব একেবারে চিনে জোঁকের লেগে আছে।

অশোক চিন্তিত মুখে বলল,—সবই তো বুঝলাম, কিন্তু একটা কিছু তো করতেই হবে। লোকটা বিপদে পড়ে আসছে...

—শুধু তাই নয়। মনে রেখো ধনরাজ জোজোর প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

—ও কথা বোলো না। তার জন্য আমরা বখশিসও দিয়েছি।

—জোজোর প্রাণের দাম মাত্র একশো টাকা?

—চুলচেরা হিসেব করলে দেখা যাবে একশোর অনেক বেশিই দিয়েছি। বিকেলবেলা তোমায় কথায় ভিজিয়ে এক গণ্ডা শাঁখ বেচে গেল, তার থেকে ধনরাজ লাভ করেনি? একটা ইয়া বড় শাঁখে ফুঁ দিল, গমগম আওয়াজ বেরোল...ব্যস্, ভীমের মহাশঙ্খ বলে তুমি দেড়শো টাকা দিয়ে কিনে নিলে! পুঁচকে একটা দক্ষিণাবর্ত শাঁখ দেখাল, দাম হাঁকল হাজার...তুমি তাতেই রাজী! তাও আমি ভাগ্যিস দরাদরি করে ওটা আটশোয় নামিয়েছিলাম!

রুমা ভারী গলায় বলল,—আহা, দক্ষিণাবর্ত শাঁখের ওরকমই দাম।

—বাজে বোকো না তো। আমাদের অফিসের দীপক মৈত্র পুরী থেকে ইয়া বড় একটা দক্ষিণাবর্ত এনেছে। মাত্র পাঁচশো টাকায়।

—বা রে, ধনরাজ বলল না, দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ যত ছোট হয় তত দাম বেশি?

—ও গুলগাপ্পি ঝাড়ল, তুমিও ভুলে গেলে!

—ধনরাজ গুলগাপ্পি মারে?

—মারতেই পারে! আমরা কি ওর পেছনে গোয়েন্দাগিরি করেছি? হয়তো নিজের সম্পর্কে যা বলেছে, সবটাই বানানো। বা বলতে পারো ওটাই ওর সেলস্‌ম্যানশিপ। গল্প বলে বলে জপাবে, তারপর কুচকুচ গলা কাটবে।

—কিন্তু লোকটা জোজোর প্রাণ বাঁচিয়েছিল এটা তো সত্যি!

—আমি কি বলেছি মিথ্যে? নাকি আমি ওকে সাহায্য করব না বলেছি? আমাদের সকলেরই তো এখন উড়িষ্যার ভিক্টিমদের পাশে দাঁড়ানো উচিত।

কথাটা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার টিভিতে চোখ গেছে অশোকের। স্টার নিউজে এখনও ওড়িশা। হেলিকপ্টারে চেপে দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করছেন মন্ত্রীরা, নীচে ধু-ধু জল। কত গ্রাম যে এখনও ডুবে আছে! নৌকো বাইছে অসহায় মানুষরা, চোখ তাদের আকাশপানে।

রুমা থমথমে গলায় বলল,—মন্ত্রীদের আক্কেলটা দেখেছ? আকাশ থেকে চোখ বুলিয়েই খালাস!

অশোক গমগম হাসল,—তুমি কি ভেবেছ মন্ত্রীরা নৌকা নিয়ে বেরোবে? আমরা কমন্ মানুষেরা কমন্ মানুষের জন্য ফিল করি, ওদের থোড়াই এসে যায়!

—কেন যে লোকে এখনও এদের ভোট দেয়! রুমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রিমোট টিপে চ্যানেল বদলে দিল অশোক,—থাক। তোমার এখন উড়িষ্যা না দেখাই ভাল।

এবার ডিসকভারি চ্যানেলে। গিরগিটি দেখাচ্ছে। গাছে একরকম, পাতায় অন্যরকম, মাটিতে আর একরকম, ঘন ঘন রঙ বদলাচ্ছে প্রাণীটা। পিছলে পিছলে যাচ্ছে।

সরীসৃপ দেখলে রুমার গা ঘিন ঘিন করে। অশোকের হাত থেকে রিমোট কেড়ে নিয়ে চ্যানেল আবার বদলাল রুমা। পর্দায় এখন নরম মিষ্টি রঙিন হিন্দি সিরিয়াল।

রুমার চোখ গেঁথে গেল হাসিকান্নার নাটকে। অশোক উঠে রান্নাঘরের সিংকে কাপ-ডিশ রেখে এল। ছোট ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ক্ষণিক নিরীক্ষণ করল জোজোর পড়াশুনা। মন দিয়ে হোমটাস্‌ক করছে ছেলে। বাবার

উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ তুলে হাসল একটু। এক টুকরো স্বর্গীয় হাসি।

হঠাৎই অশোকের বুক টিপটিপ। প্রায় সাত মাস পর ভয়ংকর দৃশ্যটা আবার চোখের সামনে দুলে উঠেছে। কালো বিন্দু হয়ে গেছে জোজো, ডুবছে ভাসছে ডুবছে...! সত্যিই তো, ধনরাজ সেদিন জলে না ঝাঁপালে কোথায় থাকত এই ছেলে? তাছাড়া মুখে যতই বলুক, ধনরাজকে তো তখন ভালও লেগেছিল অশোকের। লোকটাকে এই মুহূর্তে ঠগ প্রবঞ্চক ভাবা বোধহয় অমানবিক কাজই হয়ে যাচ্ছে।

ফিরে এসে রুমার পাশে বসল অশোক,—শোন। ভাবছি লোকটাকে কিছু টাকা দিয়েই দিই।

রুমা সিরিয়ালে আচ্ছন্ন ছিল। কথাটা প্রায় শুনতেই পায়নি। অন্যমনস্ক চোখে তাকাল,—কিছু বলছ?

—হ্যাঁ বলছি। ভাবছি ধনরাজকে শ'পাঁচেক টাকা দিয়ে দেব।

—ওমা, অত কেন? একশো-দুশো দাও, তাহলেই হবে।

—মাত্র একশো-দুশোয় কী হবে?

—ও কি শুধু তোমার ভরসায় কলকাতা এসেছে ভাবছ? আমাদের মতো অনেক ওর চেনা আছে এখানে। প্রত্যেকের কাছ থেকেই নিশ্চয়ই নেবে কিছুই না কিছু। তুমি একা অত দিতে যাবে কেন?

—তুমিই তো বললে আমরা ওর কাছে ঋণী?

—বিপদের দিনে মন খুলে এক পয়সা দিলেও অনেকটা ঋণ শোধ হয়।

কথাটা ভারী মনে ধরে গেল অশোকের। বিবেকটাও সাফ হয়ে গেল মুহূর্তে। তার ক্ষমতা অনুযায়ী সে সাহায্য করবে, এতে দোষের কী আছে? তাছাড়া পুরী শহরের অবস্থা তো তত খারাপ নয়। হয়তো ঘরবাড়ি একটু ড্যামেজ হয়েছে, সেটাকেই বাড়িয়ে-টাড়িয়ে বলে হয়তো লোকের করুণা ক্যাশ করতে চাইছে ধনরাজ!

তা করুক। তবু ধনরাজের কাছে তো অশোক ছোট হতে পারে না!

পরদিন সকালে অবশ্য এল না ধনরাজ, এল সন্ধের পর। অশোক তখন বাড়ি ফিরে সবে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। ধনরাজকে দেখে অশোক বেশ স্তম্ভিত। কী চেহারা ভেঙে গেছে ধনরাজের! কালো রঙে চকচকে ভাবটা নেই, খসখসে হয়ে গেছে চামড়া। গাল গর্তে ঢুকে গেছে, বেরিয়ে এসেছে কণ্ঠার হাড়। তিন

দিনের তুফান যেন তিরিশ বছর বয়স বাড়িয়ে দিয়েছে লোকটার!

ধনরাজের মুখের হাসিটি কিন্তু অম্লান। ঝকঝকে দাঁত বার করে বলল,—কী যে কটা দিন গেল দাদা! প্রভু জগন্নাথও এবার আমাদের সামাল দিতে পারলেন না।

রুমার গলা ভিজে গেল মমতায়,—খুব বড় বড় ঢেউ উঠেছিল সমুদ্রে, তাই না?

—বড় ঢেউ কী বলছেন বউদি, সমুদ্র তো জলের পাহাড় হয়ে গিয়েছিল! খ্যাপা পাহাড়। পাগলের মতো গুঁতো মারছে আমাদের শহরটাকে। জল পাক খেতে খেতে স্তম্ভ হয়ে পঞ্চাশ-একশো ফুট উঠে যাচ্ছে, তারপর কামানের গোলার মতো গুম গুম শব্দ করে ফাটছে। ঢেউগুলো সব আপনাদের কলকাতার বাড়ির চেয়েও উঁচু উঁচু। দেখলে আপনারা মাথা ঠিক রাখতে পারতেন না। বাড়িঘর তো গেছেই...মাটির ঘর ...এত জল-ঝড় সে সইবে কী করে! আমরা যে প্রাণে বেঁচেছি, সেটাই আশ্চর্য।

জোজো ধনরাজের পাশে দাঁড়িয়ে। নিস্পন্দ মুখে শুনছে কথা। ঝপ করে জিজ্ঞেস করল,—বাড়ির সবাই এখন ভাল আছে তো ধনরাজদাদা?

—ভাল মানে, ওই আর কি। টিকে আছে। তিন দিন খাওয়া জোটেনি, তারপর গরমেন্টের চিঁড়ে এল...

অশোক জিজ্ঞেস করল,—তা কলকাতায় এসে সুবিধে হলো কিছু?

—হ্যাঁ, কিছু সুবিধে তো হলো। মামার মেয়েটা আমাদের ওখানে ছিল, তার চিন্তায় মামা-মামির পাগলপারা অবস্থা...তাকে মামার কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। উফ্, বুকের একটা বড় ভার নেমে গেল।

রুমার যেন ঠিক বিশ্বাস হলো না। বলল,—শুধু বোনকেই পৌঁছে দিতে এসেছিলে?

—আর কী জন্য আসব?

—বা রে, বললে যে তোমাদের সব ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে...

কথাটা শেষ করতে পারল না রুমা। তার আগেই ধনরাজ বলে উঠল,—তো কী আছে? আবার গড়ে নেব। স্টুডিওর জন্য ব্যাংকে কিছু টাকা জমিয়েছিলাম, তাই দিয়েই এখন ঘর তুলব। ক্যামেরাটা কলকাতায় বেচে দিয়ে গেলাম, ওই পয়সায় কাকা জাল বানাবে...নৌকোও মেরামত করতে হবে...

—ও। অশোকের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। অস্ফুটে বলে ফেলল,—তুমি এখানে সাহায্য চাইতে আসোনি?

—আপনারা আশীর্বাদ করবেন, আমাদের জন্য প্রার্থনা করবেন, সেটাই সাহায্য দাদা। ধনরাজের মুখ হাসিতে ভরে গেল,—আপনাকে বলেছিলাম না দাদা, আমরা হচ্ছি জাতে ধীবর! ধীবর যখন মাঝ সমুদ্রে নৌকো নিয়ে ভাসে, মৃত্যুর সঙ্গে তার ব্যবধান মাত্র এক সুতো। কোথাও একটু বেপরোয়া হাওয়া ছুটলেই ধীবর শেষ। তবু এই বিপদ মাথায় নিয়েও ধীবর সমুদ্রে যায় দাদা। বিপদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে। ঝড় তো কেটেই গেছে, এ বিপদেরও আমরা মোকাবিলা করে নেব। জাতের ব্যবসা না করি, বংশের রক্ত তো আমার গায়ে আছে। তাই না? বলুন?

রুমা-অশোক চোখ চাওয়াচাওয়ি করছিল। কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

ধনরাজ ফের বলল,—হ্যাঁ দাদা, যে জন্য আসা। ঝড়ের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে দাদারা নৌকা নিয়ে ফিরেছিল সমুদ্র থেকে। বুঝতেই পারছেন, জোর বেঁচে গেছে। এবার জল থেকে ভারী সুন্দর একটা শঙ্খ পেয়েছে দাদা। বিনায়ক-মুখ শঙ্খ। বলতে বলতে পকেট থেকে ছোট্ট একটা বাদামী শাঁখ বার করেছে,—দেখুন, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখুন। যেদিক থেকে দেখবেন, ঠিক যেন গণেশ ঠাকুর! জোজোভাইকে একটা অদ্ভুত শঙ্খ উপহার দেব বলেছিলাম...এই শঙ্খ ঘরে রাখলে আপনাদের শুভ হবে বউদি...

ধনরাজ চলে গেছে অনেকক্ষণ। ন যযৌ ন তস্থৌ বসে আছে স্বামী-স্ত্রী। কেউ কারুর মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। নিজেদের ক্ষুদ্রতা আর দীনতার ভারে পীড়িত হচ্ছে।

টেবিলের ওপর পড়ে আছে শাঁখটা। একটা মহতী বিদ্রূপের মতো।

বীরপুরুষ

সকালবেলা ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই কলিংবেল বেজে উঠেছে। ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং। ঘণ্টি বাজছে তো বাজছেই, থামেই না। বাড়িতে ডাকাত পড়ল নাকি?

লীলা দরজা খুলল। ডাকছে—শুনছ, সুব্রতদা এসেছেন।

এই অসময়ে সুব্রত? ঝটিতি দাঁত ব্রাশ করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল অমল। দেখল সুব্রত ঘরে ঢোকে নি, দরজার সামনে পায়চারি করছে। অমলকে দেখা মাত্র দাঁড়িয়ে পড়ল। বিনা ভূমিকায় বলল—চললাম রে।

অমল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল—কোথায়?

—যে দিকে দু'চোখ যায়।

—মানে?

সুব্রত ফোঁস করে শ্বাস ফেলল—আমি গৃহত্যাগ করেছি।

—সে কি! কেন?

—আমি আর মমতার সঙ্গে থাকব না।

বলে কী সুব্রত? যে বউতে সুব্রত সারাক্ষণ আপ্লুত হয়ে থাকে, বউকে যে যমের মত ডরায়, যার বকুনির ভয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও মারে না, তাস খেলা পর্যন্ত ছেড়ে দিল, তাকে ছেড়ে চলে যাবে? নির্ঘাৎ বড় রকমের ফাটাফাটি কিছু হয়েছে।

নিশ্চয়ই তাই। সুব্রতর মুখ চোখ সেরকমই বলছে। সব সময়ে টিপটপ সেজে থাকা সুব্রতর চুল উশকো খুশকো, চোখের নীচে কালির পোঁচ, সযত্ন লালিত দাড়ি খাড়া খাড়া হয়ে আছে, মুখমণ্ডলে কেমন একটা বন্যার্ত বন্যার্ত ভাব। সুব্রতর কাঁধে ইয়া এক ঝোলা ব্যাগ। আলখাল্লা টালখাল্লা নিয়ে হিমালয়ে চলল নাকি?

অমল ব্যাগটা ধরে টানল—আয় আয়, বোস। মাথা ঠাণ্ডা কর।

—মাথা আমার ঠাণ্ডাই আছে। কুল অ্যাজ আইস।

—বুঝলাম। ...কিন্তু হয়েছেটা কী, অ্যাঁ?

—এভরিথিং ফিনিশড।

—কী ফিনিশড?

—রিলেশান। মমতার মত জাঁহাবাজ মেয়ের সঙ্গে আমি আর থাকবই না।

বউ হিসেবে মমতা যে জাঁহাবাজ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যেমন চাঁছাছোলা ভাষা, তেমনই দেমাকী হাবভাব। সুব্রতর কোনও বন্ধুই মমতার ওপর তেমন প্রীত নয়। অমলও না। তবু একটা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভেঙে যাবে চিন্তা করতে মোটেই ভাল লাগল না অমলের।

বন্ধুকে হিড়হিড় করে টেনে এনে সোফায় বসাল অমল। বলল,—হেঁয়ালি ছাড়। খোলসা করে বল তো কী হয়েছে?

—অ্যাদ্দিন ঘর করার পরও আমায় একটুও বিশ্বাস করে না মাইরি! সুব্রত গরগর করছে—বলে কিনা আমি লম্পট! চরিত্রহীন! জীবন্ত ক্যাসানোভা! আমি নাকি মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি মেরে বেড়াই!

—তুই!

—ইয়েস। আমি। আমার নাকি মেয়েছেলে দেখলেই নোলা টসটস করে!

লীলা গোল গোল চোখে দরজায়। কথা গিলছে। মাত্র পাঁচ মাস হল

বিয়ে হয়েছে অমলের সঙ্গে, গা থেকে এখনও কোরা গন্ধ যায় নি। অমলের বন্ধুবান্ধব সম্পর্কে তার অসীম কৌতূহল।

বন্ধুর মান বাঁচাতে অমল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, এই যাও তো, ঝটপট দু কাপ চা করে আন তো।

লীলা গা মুচড়ে সরে গেল। সুব্রতর মুখোমুখি বসল অমল। গলা নামিয়ে বলল, কী কেলো করেছিস?

—তুইও আমায় অবিশ্বাস করিস?

—আহা, মমতা তোকে এমনি এমনি ঝাড়ল? আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয়?

—মেয়েরা আগুন ছাড়াই ধোঁয়া বার করতে পারে। সবে তো বিয়ে হল, এখন টের পাবি না, কটা দিন যাক...

হাহ্, অমল ধোঁয়া বার করতে দিলে তো। কক্ষনো অমল বউ-এর ভেড়ুয়া বনবে না। বেড়াল সে মেরে রেখেছে, বিয়ের রাত্রেই। বউকে কী করে চাপে রাখতে হয় অমল জানে। সুব্রতটা বউ নিয়ে বড় বেশি আদিখ্যেতা করতো, এখন যাঁতা খেয়ে উলটো বুলি ঝাড়ছে।

অমল একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, জ্ঞান পরে মারবি, এখন ঝেড়ে কাশ তো দেখি।

—কত আর কাশব মাইরি! কাল থেকে কেশে কেশে তো গলা চিরে গেল। সেন্টার টেবিলে পড়ে থাকা প্যাকেট থেকে সুব্রত সিগারেট বার করল একটা। ধরাল না, গুম হয়ে আছে একটুক্ষণ। তারপর বলল—এত সিলি ব্যাপার...কী যে বলি...! জানিসই তো, অফিস থেকে ফেরার সময়ে মিনিবাসে কী লদকালদকি ভিড় থাকে...কপাল গুনে কাল বসার জায়গা পেয়েছি, ঝপাৎ করে এক মহিলা হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিল...চেনা মহিলা, প্রায়ই বাসে দেখা হয়...তো হল কি, নামার সময়ে মহিলাও খেয়াল করে নি, আমারও খেয়াল নেই, প্যাকেটটা আমার হাতেই রয়ে গেছে। আর সেই প্যাকেট নিয়েই যত গণ্ডগোল।

—কী রকম?

—কী কুক্ষণে যে প্যাকেটটা আমি ব্রিফকেসে ভরে নিয়ে বাড়ি এলাম! ভেবেছিলাম কাল পরশু তো বাসে দেখা হবেই, তখন মহিলার গচ্ছিত ধন ফেরত দিয়ে দেব...। হবি তো হ, কালই মমতার কী দরকার পড়ল, আমার

ব্রিফকেস খুলেছে। প্যাকেটে চোখে পড়তেই ঝড়াকসে ওপেন। ব্যস কুরুক্ষেত্র স্টার্ট।

—কী ছিল প্যাকেটে?

—ছিল আমার গুষ্টির পিণ্ডি। একটা সায়া, আর একটা ব্লাউজ। ...ওই সায়া ব্লাউজ নাকি আমার প্রেমিকার! সুব্রত খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল—তুইই বল, দুনিয়ায় কোন শালা গাণ্ডু পুরুষ আছে যে প্রেমিকার সায়া ব্লাউজ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়?... তাও যদি শালা নতুন মাল হত!

—পুরনো সায়া ব্লাউজ!

—তবে আর কী বলছি! শালা টুটা ফুটা গন্দা মাল, বোধহয় প্যাকেটে ভরে কোথাও থেকে নিয়ে আসছিল...

—বয়স কত মহিলার?

প্রশ্নটার আকস্মিকতায় সুব্রত বুঝি থমকাল একটু। টেরচা চোখে তাকিয়েছে।

—তার মানে তুইও ভাবছিস...?

—না, না, জাস্ট কৌতূহল।

—মেয়েদের বয়স টয়স আমি বুঝি না। তবে ওই হবে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ...আধবুড়ি।

—হুম, ব্যাপার গুরুচরণ। অমল মাথা দোলাল,—মমতাকে খুলে বলেছিলি?

—বলি নি আবার! কিন্তু যে মেয়েছেলে বুঝবে না বলে ঘাড় বেঁকিয়ে থাকে, তাকে বোঝানো শিবেরও অসাধ্যি। সুব্রত লম্বা লম্বা শ্বাস ফেলল,—কাল সারারাত যে কী গেছে মাইরি! আমার মেরিটাল রাইটটা পর্যন্ত কেড়ে নিল! ধাক্কা মেরে ফেলে দিল বিছানা থেকে!

—বলিস কী রে?

—সাধে কি এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলাম! ফস করে সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলল সুব্রত। স্টিম ইঞ্জিনের মতো ধোঁয়া ছাড়ছে,—শুধু বিছানা থেকে আউট করেই ছাড়ে নি। সঙ্গে সঙ্গে শাসিয়েছে, আমি খাটে ওঠার চেষ্টা করলেই চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবে! সব্বাইকে বলবে আমি নাকি ওর ওপর অত্যাচার করছি! আমি নাকি ওকে রেপ করছি। অ্যান্ড মাইন্ড ইট, এ সব

কিছুই হচ্ছে গুড্ডুর প্রেজেন্সে।

—ছি ছি। ছি ছি।

—তুইই বল, ছেলেটা বাপের সম্পর্কে কী ভাবল? ওইটুকু তিন বছরের শিশু...

—নাহ্ সত্যিই এ চরম ইনসাল্ট। ইনটলারেবল।

—বল বল। সুব্রতর গলা করুণ হয়ে গেল—জানিস কাল সারা রাত আমায় সোফায় পড়ে থাকতে হয়েছে। শালা মশারা চুষে চুষে ছিবড়ে করে দিয়েছে আমাকে। এর পরও তুই ওর সঙ্গে থাকতে বলবি?

লীলা চা এনেছে। সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধুর মুখে কুলুপ। কাপে লম্বা লম্বা চুমুক দিচ্ছে সুব্রত, অশান্ত চোখে তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। অমল গম্ভীর। চিন্তামগ্ন। লীলা মুখ টিপে হাসল—মমতাদির ওপর খুব রেগে আছেন মনে হচ্ছে?

অমলের মোটেই পছন্দ হল না প্রশ্নটা। লীলা হাসে কেন? মজা পাচ্ছে? না না, এ তো ভাল কথা নয়। একজন পুরুষ মনোবেদনায় কাতর, তাই দেখে আহ্লাদিত হবে এক নারী—এ কি প্রশ্রয় দেওয়া যায়?

অমল গলা ঝেড়ে বলল, রাগের কারণ আছে বলেই রেগেছে। যাও, এবার আমাদের জন্য একটু টোস্ট ওমলেটের ব্যবস্থা কর।

লীলা ঠোঁট ফোলাল—তোমরা বুঝি আমার সামনে কিছু আলোচনা করতে চাও না?

—বুঝতেই যখন পারছ, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

—বেশ বাবা বেশ, যাচ্ছি। চপল ভ্রুকুটি হেনে ঘর থেকে চলে গেল লীলা।

সুব্রতও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েছে—তাহলে বন্ধু বিদায়।

—এক্ষুনি যাবি কি? ব্রেকফাস্টটা কর। কাল রাত থেকে তো পেটে কিছু পড়ে নি!

—অনেক কিছু পড়েছে রে। পেট টইটুম্বুর হয়ে আছে। সুব্রত পেঁচার মত মুখ করে হাসল—গুড্ডুকে একটু দেখিস ভাই। পারলে ওই পাষাণী মায়ের হাত থেকে ছেলেটাকে রক্ষা করিস।

—তুই সত্যিই চললি?

—অফকোর্স। আমি ওই সাসপিশাস মহিলাকে একটা চরম শিক্ষা দিতে চাই। ভাতে মারব ওকে। যদ্দিন না এসে পা জড়িয়ে ধরে।

অমল মুগ্ধ চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল। বাহ বাহ, একেই তো বলে মরদের বাচ্চা।

সুব্রতর পিঠে হাত রেখে বলল, যাচ্ছিস কোথায় এখন?

—আপাতত শেয়ালদার কোনও হোটেলে। তবে খবরদার, মমতা যেন জানতে না পারে।

—নিশ্চিন্ত থাক।

দরজা অবধি গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল সুব্রত—রাত্তিরের দিকে ফোন করব। ফ:রদার কোনও ডেভেলপমেন্ট হলে জানিয়ে দিস।

—অবশ্যই।

ঝোলাব্যাগ কাঁধে সুব্রত হনহন করে চলে গেল।

দুই

অমল ভেবেছিল বাজার থেকে ফেরার পথে একবার সুব্রতর ফ্ল্যাটে উঁকি দিয়ে আসবে। মমতা একটুও দমেছে কিনা সরেজমিন করা দরকার। যাওয়ার অবশ্য প্রয়োজন হল না। বন্ধুর টোস্ট ওমলেটটাও সাঁটিয়ে সবে থলি হাতে বাড়ির বাইরে পা রেখেছে, সামনে মমতা।

গনগনে গলায় বলল, কোথায়? কোথায় আপনার বন্ধু?

মমতার চেহারাটি ভারী নরম সরম। ছোটখাটো। তবে তাকে দেখে যেমনটা লাগে সে যে তা নয়, এ কথা অমলরা হাড়ে হাড়ে জানে। সত্যি কথা বলতে কি, মমতার সঙ্গে কথা বলতে গেলে অমলেরও হাঁটুর জোর কমে যায়। অবশ্য এখন অমলকে ঘাবড়ালে চলবে না। তার ওপরই এখন নির্ভর করছে বন্ধুর মানসম্মান।

অমল কায়দা করে কাঁধ ঝাঁকাল—সুব্রত তো এখানে আসে নি!

—অ। তিনি এখান থেকেও ভাগলবা হয়েছেন?

ইশ, কী ভাষা! স্বামী সম্পর্কে কী মধুর বচন! মমতার সঙ্গে লীলার

এখনও তেমন হৃদ্যতা গড়ে ওঠে নি, লীলাকে মমতার ছায়া থেকেও দূরে রাখতে হবে। মমতার পাল্লায় পড়লে বিগড়োতে কতক্ষণ?

অমল দরজা আড়াল করে দাঁড়াল। মমতাকে যে সে ভয় পায়, এটাও যেন লীলা টের না পায়।

গলা ভারী করে বলল—সুব্রত বাড়ি থেকে পালিয়েছে বুঝি?

—ঢং করছেন কেন? একটু আগেই তো এখানে এসেছিল!

মেয়ে? নাকি টিকটিকি?

অমল মিয়োনো স্বরে বলল, ও মানে...হ্যাঁ মানে...।

—তোতলাবেন না। কোথায় গেল সেই মূর্তিমান?

মুখ ফসকে শেয়ালদা শব্দটা বেরিয়ে এসেছিল প্রায়, কোঁৎ করে ঢোক গিলল অমল। চোখ বুজে বলে ফেলল, —কৃকৃকৃ...কৃষ্ণনগর।

—কৃষ্ণনগর?

—হ্যাঁ। ...ওর কে মামা থাকে..

—ওর তো একটাই মামা। তাঁর বাড়ি তো খানাকুল।

—হ্যাঁ তাই তো। ...তাহলে বোধহয় কাকার বাড়ি।

—কোন কাকা? ওর দুই কাকা থাকে গোবরডাঙায়, একজন কোতরং। কৃষ্ণনগরে কোনও কাকা থাকে বলে তো শুনি নি।

—আপন কাকা নয়। মামাতো কাকা।

—সেটা কেমন?

—হে হে, সহজ কথাটা বুঝলে না? আপন কাকা নয়। আপন বাবার আপন মামাতো ভাই।

—সুব্রতর বাবার তো কোনও মামা টামা ছিল না!

—তাই বুঝি? অমলের গলা শুকিয়ে এল—তাহলে বোধহয় কাকাতুতো মামা হবে। আই মিন মার খুড়তুতো ভাই।

চোখ দুটো সার্চলাইটের মতো অমলের ওপর ফেলল মমতা। হিম গলায় বলল—বুঝলাম।

—কী বুঝলে?

—কলকাতায় কেষ্ট সেজে বাবুর মন প্রাণ ভরে নি, তিনি এখন ছুটেছেন কেষ্টনগর। তা বাবু কি কেষ্টনগর থেকেই অফিস করবেন?

এই রে, অফিসের কথাটা তো মাথায় আসে নি! এ যা মহিলা, যে কোনও সময়ে অফিসেই হানা দিয়ে সুব্রতর টুঁটি চেপে ধরতে পারে। তখন সুব্রতর মানটা থাকে কোথায়? সুব্রতরে, তুই বুঝি আর বাঁচলি না!

অমল মরিয়া হয়ে বলে ফেলল—ও আর ফিরবে না বলেছে।

—ফিরবে না?

—নাহ। সংসার থেকে ওর মন উঠে গেছে। অমল গলায় করুণ রস আনল, —বোধহয় সাধুসন্ন্যাসী হয়ে যাবে।

—হুঁহ, ওই চরিত্রের লোক হবে সাধু!

—এটা কিন্তু তুমি ঠিক বললে না মমতা। অমল ভুরু কুঁচকোল—তুমি কিন্তু ওকে অযথা সন্দেহ করেছ।

—ও, বন্ধু দেখছি তাহলে সবই উগরে গেছে?

—অনেক দুঃখে বলেছে ভাই। অমলের স্বরে আবার করুণ রস—আহারে, বলতে বলতে বেচারা কেঁদে ফেলছিল।

—কুমীরের কান্না। মমতা মুখ বেঁকাল—লুজ ক্যারেকটার পুরুষরা হাতে নাতে ধরা পড়লে ওরকম অনেক কাঁদুনি গায়। একবার নয়, কাল নিয়ে ওকে আমি চার চারবার ধরলাম। পকেট থেকে লেডিজ রুমাল বেরোচ্ছে, অফিসের ফাইলে লাল টিপের পাতা, ব্রিফকেসে নতুন শাড়ি...। এর পরও বলবেন আপনার বন্ধু ধোয়া তুলসীপাতা?

সুব্রত কেসগুলো চেপে গেছে কেন? একটুখানি ধন্দ মেরে রইল অমল। মিনমিন করে বলল—তবু একটা সামান্য সায়া ব্লাউজ নিয়ে এত অশান্তি...

—কিছুই সামান্য নয় অমলদা। আপনি জানেন না, আপনার বন্ধুটি একটি মিচকে শয়তান। ঝানু লেখকদের মতো গল্প বানাতে পারে। বলতে বলতে মমতার রুক্ষ গলা সহসা ভেজা ভেজা,—আপনি আমার সন্দেহের কথা বলছেন? জানেন আপনার বন্ধুর নেচার? এই তো গত হপ্তায় আমার কলেজের এক পুরোন বন্ধু এসেছিল দুজনে সন্ধেবেলা বসে গল্প করছি...আপনার বন্ধুর কী প্যাটপ্যাট তাকানো! সে আমাদের অতিথি, তার সঙ্গে ভাল করে একটা কথাও বলল না! ...এত নীচু মন, আমার জামাইবাবুকেও সহ্য করতে পারে না! লজ্জায় ঘেন্নায় অপমানে মাথা কাটা যায় আমার জামাইবাবুকে বাড়িতে পর্যন্ত আসতে বলতে পারি না

অমলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—তাই নাকি?

মমতা যেন শুনেও শুনল না। গলায় ফের ঝাঁঝ ফিরেছে। বলল—শুনুন অমলদা, সে যদি সত্যিই আমার সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে চায়, তার সঙ্গে থাকতে আমারও ভারী বয়ে গেছে। কথাটা আপনার বন্ধুকে জানিয়ে দেবেন।

বলেই ফিরে হাঁটা দিয়েছে মমতা।

অমল হতভম্ব। দ্বিধায়। মমতার কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না, আবার কেমন কেমন যেন লাগছেও।

লীলা বাথরুমে ছিল। কখন যেন বেরিয়ে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিরীহ মুখে জিজ্ঞাসা করল—কে এসেছিল গো?

অমল সচকিত। বলল—কেউ না, জমাদারনি।

তিন

বিকেলের দিকে আজ বেশ মেঘ মেঘ করেছিল। সন্ধের পর বৃষ্টিও হল কয়েক পশলা। ভাদ্র মাস। ধারাপাত থামতেই গুমোট বেড়ে গেছে খুব।

অফিস থেকে ফিরে ভাল করে স্নান করল অমল। গায়ে পাউডার মেখে, পাজামা পাঞ্জাবিটি চড়িয়ে জলখাবার খেল, চায়ে চুমুক মেরেই এবার ক্লাবে তাস খেলতে দৌড়বে। আয়েশ করে সিগারেট ধরিয়েছে একটা। মাঝে মাঝেই লীলার উদ্দেশে হুকুম ছুঁড়ছে। অ্যাশট্রে দিয়ে যাও! প্লেট নিয়ে যাও! অ্যাই, সেন্টার টেবিলটা মুছলে না কেন! লীলা দৌড়োদৌড়ি করছে খুব, স্বামীর হুকুম তামিল করছে।

অমল হাসছে মিটিমিটি। হুঁ হুঁ বাবা, বউকে তো এভাবেই রাখতে হয়। সুব্রতটা এত ম্যাদামারা ছিল! বউ-এর জুতো নিয়ে পর্যন্ত মুচির কাছে ছুটছে! বিয়ের পরই অমলের কাছ থেকে সুব্রতর টিপস নেওয়া উচিত ছিল।

ফোন বাজছে। রিসিভার তুলল অমল। শয়তানের নাম করতেই শয়তান। উত্তেজনায় সুব্রতর গলা টগবগ ফটছে—হোমফ্রন্টের কী বারতা?

—মমতা এসেছিল তো সকালে।

—কী বলল?

—কাঁড়ি কাঁড়ি তোর কেচ্ছা গেয়ে গেল। হ্যাঁ রে, তোর পকেটে নাকি লেডিজ রুমাল পাওয়া গিয়েছিল?

—সে তো আমাদের অফিসের সুষমাদির। সর্দি হয়েছিল বলে শিকনি পোঁছার জন্য সুষমাদি দিয়েছিল। মমতাকে তো বলেছি, তাও তোর কাছে কমপ্লেন করল?

—আরও কত কী বলল। তোর ফাইলে নাকি টিপের পাতা পাওয়া যায়! ব্রিফকেসে নতুন শাড়ি...!

—অফিসের কোনও মহিলা স্টাফ যদি ফাইলে টিপের পাতা রেখে দেয়, তার জন্য আমি দায়ী? আর শাড়িটা তো আমি ওর জন্যেই এনেছিলাম। ও তো জানে সে কথা!

কৈফিয়তগুলো ঠিক যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না অমলের। চুপ করে আছে।

সুব্রত কাতর স্বরে বলল—তুই তো আমায় জানিস। মমতার ওপর ভালবাসায় কোনও ফাঁকি দেখেছিস কখনও?

তা বটে, তা বটে। ফাইলে ব্রিফকেসে যা খুশি থাক, সুব্রতর হৃদয়ে তো ওই একজনই আছে। মমতা। এখানে সত্যিই তো কোনও ফাঁক নেই।

ওপারে ফের সুব্রতর গলা—কী রে, চুপ করে আছিস কেন? তুইও কি ভাবছিস আমি পট্টি পড়াই?

—না না, তোকে কি আমি চিনি না! ঝটাং করে অমলের আর একটা কথা মনে পড়ে গেল—হ্যাঁরে, তুই নাকি মমতাকে সন্দেহ করিস?

—বলেছে এ কথা? বলেছে?

—করিস কিনা বল।

—আমি কি চিকেনহার্টেড ফেলো! সুব্রত গলা ওঠাল—মাঝে মাঝে হয়তো জোক করি...। মমতাটা এত ডাল হেডেড, বুঝতে পারে না।

লীলা চা নিয়ে ঢুকল। আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে। সোফায় বসে টিভি চালিয়ে দিল। টিভির শব্দে ঈষৎ স্বস্তি বোধ করল অমল। তবু সাবধানের মার নেই, গলা খাদে নামিয়ে বলল—কোন হোটেলে উঠেছিস?

—হোটেল ডিলাক্স।

—আছিস কেমন?

—বেড়ে। তোফা। জীবন এই প্রথম মুক্তির স্বাদ পাচ্ছি। কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান নেই, টুসকি বাজালে হাতের গোড়ায় সব এসে যাচ্ছে...

—অফিস গিয়েছিলি?

—নাহ্। শরীর দিল না। দুপুরে খেয়ে টেনে একখানা ঘুম দিলাম। এবার কলেজ স্কোয়্যারে হাওয়া খেতে বেরোব।

—গুড। ভেরি গুড। স্টেডি থাক, মমতার বিষ দাঁত ভেঙে যাবে।

—ভাঙতেই হবে। হা হা হা। সুব্রতর গলায় প্রাণখোলা স্বাধীন হাসি—যাক গে, আমার ফোন নাম্বারটা টুকে নে। দরকার বুঝলে রিং করিস।

—এক সেকেন্ড।

রিসিভার রেখে টিভির পাশের দেরাজ থেকে ডায়েরি কলম নিয়ে এল অমল। টুকে নিল নম্বর। গুড্ডুর সম্পর্কে একটা দুটো প্রশ্ন করল সুব্রত, তারপর ফোন ছেড়ে দিয়েছে।

গুনগুন গান গাইতে গাইতে পান সিগারেট লাইটার পকেটে ঢোকাল অমল। দেরি হয়ে গেল অনেক, তাসপার্টি ওয়েট করছে।

লীলা নড়ে চড়ে উঠল—কার ফোন ছিল গো?

অমল টানটান—তোমার কী দরকার?

—না, এমনিই...

—মেয়েদের বেশি কৌতূহল ভাল নয় লীলা। আমি পছন্দ করি না।

—তাই বুঝি? লীলা তবু ঠোঁট টিপে হাসছে—তা এই যে বেরোচ্ছ, ফিরবে কখন?

—যখন ফিরি। দশটা, সাড়ে দশটা।

—একটা দিন সন্ধেবেলা না গেলে কী হয়। লীলা পাশে এসে অমলের বুকে হাত রাখল,—এক দিন নয় আমার কাছে রইলে।

—বউয়ের আঁচল ধরা হয়ে বসে থাকব? ওই প্যানপেনে সিরিয়ালগুলো দেখব? ফুঃ।

লীলার মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল।

একটু একটু মায়া হচ্ছিল অমলের। থেকে গেলে হয়, আজ সন্ধেটা নয় একটু ফস্টিনস্টি করেই কাটল। একটু অন্য রকম ভাবে। স্পেড হার্ট ডায়মণ্ড ক্লাব্‌সের জগতের বাইরে। লীলার মধ্যে বেশ একটা রহস্য আছে, হয়তো মন্দ

কাটবে না।

না বউ-এর কথা শুনে বাড়ি বসে থাকলে বউ লাই পেয়ে যাবে। আর তেমন হলে লীলাও যে মমতা হয়ে যাবে না তার গ্যারান্টি কী?

মনকে ধমকে বাগে আনল অমল।

চার

দেখতে দেখতে তিন চারদিন কেটে গেল।

এখনও পরিস্থিতি বদলায় নি এতটুকু, সুব্রত সেই হোটেলেই থানা গেড়ে আছে।

রোজই রাতে ফোন আসে তার, অমলের সঙ্গে বহুক্ষণ ফুসুর ফুসুর চলে। হাসি তামাশাও হয় বিস্তর। এর মধ্যে মমতার সঙ্গে বেশ কয়েকবার পথে ঘাটে দেখা হয়েছে অমলের, মুখ কালো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে মমতা, মনে হয় একটু যেন ভেঙেছে। তবে কথাটা ঘুণাক্ষরেও সুব্রতকে জানায় নি অমল। যদি সুব্রত দুর্বল হয়ে পড়ে!

সেদিন সন্ধেবেলা অমল সুব্রতর হোটেলে গেল। ছোট্ট হোটেল, তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, তবে ঘরটা মোটামুটি ছিমছাম। খাট বিছানা চেয়ার টেবিল, ছোট্ট একখানা আলমারি, সবই আছে। সব থেকে বড় কথা, আছে শান্তি। যেটা সুব্রতর বড় কাম্য ছিল। একটাই মাত্র ঝামেলা, বিছানায় নাকি বেজায় ছারপোকা। রোজ নাকি দুশো তিনশো সিসি রক্ত কমে যাচ্ছে সুব্রতর। অবশ্য তা নিয়েও সুব্রত তেমন দুঃখিত নয়। বাড়িতে থাকলে ওই রক্ত তো মশারাই খেত।

বন্ধুর পয়সায় দেদার চা চপ কাটলেট ওড়াল অমল। সুব্রত এখনও মমতায় বিগলিত হয়ে পড়ে নি দেখে সে দারুণ খুশি। আসার সময়ে পই পই করে বলে এল,—আর কটা দিন গ্যাঁট হয়ে বসে থাক। মমতা তোর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বলে।

অমল বাড়ি ঢুকল রাত দশটা বাজিয়ে।

লীলা দৌড়ে এসেছে—কী গো, অফিস থেকে এত দেরি?

—অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে এমন মুচলেকা দিয়ে রেখেছি নাকি?

—বা রে, ভাবনা হয় না বুঝি?

—তাই বলো। কৈফিয়ত চেয়ো না খবরদার। অমল সোফায় বসে জুতো ছাড়ছে। হিন্দি গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে বলল—এক জায়গায় গিয়েছিলাম।

—সুব্রতদার কাছে?

চমকে লীলার দিকে তাকিয়েছে অমল। নাহ্ লীলার মুখে কোনও প্যাঁচ নেই। অর্থাৎ নিরীহ প্রশ্ন।

লীলা ফের জিজ্ঞেস করল—সুব্রতদাকে ফিরতে বলছ না কেন?

—কেন ফিরবে? ওই ডিক্টেটর বউ-এর গোলামি করার জন্যে?

—এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি। ভুল বোঝাবুঝি কোন সংসারে না হয়? তা বলে অ্যাদ্দিন ঘরদোর ছেড়ে...। মমতাদি খুব কষ্ট পাচ্ছে।

—তোমায় বলেছে বুঝি?

—বলতে হয় না। আমি বুঝি।

—ছাই বোঝা। মমতার মন বলে কিস্যু নেই। কটা দিন চাপে থাকুক, টাকা পয়সায় টান পড়ুক, তখন বুঝবে স্বামীকে অপমান করার ফল।

—মানে মমতাদি ভেঙে পড়লে তবেই সুব্রতদা ফিরবে? নইলে নয়?

—কারেক্ট।

—কিন্তু ধরো যদি উল্টোটা হয়?

—মানে?

—যদি সুব্রতদাই সুড়সুড় করে ফিরে আসে?

—অসম্ভব।

—কিন্তু আমার মন বলছে সেটাই ঘটবে। সুব্রতদা মমতাদিকে খুব ভয় করে বলে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। আর মনে মনে ফেরার জন্য ছোঁকছোঁক করছে।

—হতেই পারে না।

—খুবই হতে পারে। চান্স পেলেই সুব্রতদা...

—ইমপসিবল।

—বেট?

—কী বেট?

—যদি সুব্রতদা চব্বিশঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসে তবে তুমি টানা এক বছর সন্ধেবেলা ক্লাবে যেতে পারবে না। বাড়িতেই থাকতে হবে। রাজী?

—খুব রাজী। তবে তুমি যদি হারো, আমি টানা পাঁচ বছর তাস খেলে রাত এগারোটায় বাড়ি ঢুকব। ডান?

—ডান। লীলা বুড়ো আঙুল ওঠাল,—মনে রেখো, কথা দিয়ে কথা না রাখলে কিন্তু কালীঘাটের কুকুর হয়।

অমল মুচকি হাসল—তার কোনও সুযোগ নেই।

পাঁচ

পরদিন একটু জলদি জলদি অফিস থেকে ফিরছিল অমল। ক্লাবে ব্রিজ কম্পিটিশান আছে, সাড়ে ছটায় হাজিরা দিতে হবে।

পাড়ায় ঢুকতেই মাটিতে পা গেঁথে গেল। মুদির দোকানে কে ও? সুব্রত না?

চোখ কচলাল অমল, পায়ে পায়ে এগোল দোকানের দিকে। হ্যাঁ, সুব্রতই তো! পাঁচফোড়ন কিনছে!

বন্ধুর কাঁধে ইয়া এক রদ্দা কষাল অমল—কী রে, তুই?

উউউ করে উঠেছিল সুব্রত, পরক্ষণে বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে হাসছে—চলে এলাম রে। কেসটা খুব খারাপ দিকে চলে যাচ্ছিল।

—খারাপ দিকে?

—খারাপ নয়? গোটা পাড়ায় রটে গেছে মমতা নাকি আমায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছে!

—কে বলল তোকে?

—কে বলল সেটা বড় কথা নয় রে অমল। তবে রটনা একটা হয়েছেই। আমি ভাল সোর্স থেকে খবর পেয়েছি। সুব্রত গলাটা একেবারে মিহি করে ফেলল—আরও জন্ডিস কেস আছে রে। গুড্ডুটা...

—কী হয়েছে গুড্ডুর?

—হয় নি কিচ্ছু, তবে...কাল গুড্ডু নাকি আমার জন্য খুব কাঁদছিল, বাবা কই, বাবা কই বলে...। তখন জানিস ছেলেকে ঠাণ্ডা করতে মমতা কী বলেছে?

—কী বলেছে?

—বলেছে, কেঁদো না সোনা, তোমার ওই বাবাটা খুব দুষ্টু ছিল, আমি তোমাকে আর একটা ভাল বাবা এনে দেব।

—তোকে এসব কে জানাল?

—যেই জানাক, ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। মেয়েরা রেগে গেল সব পারে। বেশি দিন তো বিয়ে করিসনি, এখন টের পাচ্ছিস না...

—বাজে কথা রাখ। তুই তাহলে ওই ভয়েই...?

—গুড্ডুর জন্যও বুকটা খুব আনচান করছিল রে। বলতে বলতে সুব্রত আরও মিহি করল গলা—আরও কেলো আছে।

—কী রকম?

—মমতার জামাইবাবুটা চান্স নেওয়ার চেষ্টা করছিল খুব। শালা নাকি বলেছে, তুমি ইয়াং মেয়ে, একা একা আছ, আমি নয় মাঝে মাঝে তোমার কাছে এসে...

—ব্যস? শুনেই ওমনি...?

—মমতা আমায় কিচ্ছু বলেনি রে। সুব্রত অমলিন হাসছে, আমি ঢুকতেই একবার শুধু হুঙ্কার ছুঁড়েছিল, কোন সাহসে তুমি...ব্যস ওমনি আমি গুড্ডুকে বাইরে রেখে এসে দরজা ভেজিয়ে দিলাম। দরজার খিলটা হাতে তুলে দিয়ে বললাম, মারো আমায়, যত খুশি মারো, আমি টুঁ শব্দটি করব না...। হয়ে গেল। মমতা গলে জল।

অমলের গা রি রি করছিল। আগুন বেরোচ্ছে মাথা দিয়ে। কান ঝাঁ ঝাঁ। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, তোকে এত সব গুহ্য সংবাদ সাপ্লাই করল কে?

—যেই হোক, সে তো আমার ভালর জন্যই...

—দাঁড়া দাঁড়া। যে বলেছে সে সত্যি কথা বলছে কী করে বুঝলি?

—কারণ সে খুব ভাল। সে কখনও মিথ্যে বলতে পারেই না।

—কে কে? নামটা জানতে পারি?

সুব্রত মুখ টিপে হাসল, তোর বউ।

অমলের হাত থেকে ব্রিফকেস খসে পড়ে গেল।

ছয়

লীলা দরজা খুলতেই অমল গর্জে উঠল—আমি জানতে চাই এ সবের মানে কী?

লীলা নির্বিকার—কিসের কী?

—সুব্রতর কাছে তুমি গিয়েছিলে?

—যাই নি তো। ফোন করেছিলাম। তোমার ডায়েরি থেকে নাম্বারটা পেয়ে গেলাম।

—সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলে দিলে?

—না হলে যে মিটমাট হত না। লীলা হি হি হাসছে—আমি জানি মেয়েদের থেকে ছেলেরা অনেক বেশি সন্দেহপ্রবণ। আর সেই লাইনে একবার ঘা দিতেই সুব্রতদা ফ্ল্যাট।

রাগে অমলের গলা দিয়ে শব্দ ফুটল না। গোঁজ হয়ে স্নানে চলে গেল।

বেরিয়ে পাজামা পাঞ্জাবি চড়াচ্ছে, দরজায় লীলা—চললে কোথায়?

—চুলোর দোরে।

—কথা কিন্তু অন্যরকম ছিল। তুমি বাজী হেরে গেছ।

—মানি না। তুমি চিট করেছ।

—বেশ করেছি। শান্তশিষ্ট লীলা হঠাৎ গলা চড়িয়েছে—সুব্রতদা মমতাদির যাতে ভাল হয় তাই করেছি। তুমি বাজী হেরেছ, এক বছর তোমার ক্লাবে যাওয়া বন্ধ।

—এহ্ তোমার কথায় বন্ধ করব? যাব আমি। আলবৎ যাব।

কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে লীলা আঙুল নাচাল—দেখি কী করে তুমি বেরোও। ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে দ্যাখো।

লীলার এই রণরঙ্গিনী মূর্তি অমলের অদেখা। দুচোখে আগুন জ্বলছে লীলার, নাকের পাটা ফুলে গেছে, মুখমণ্ডলে কেমন যেন মমতা মমতা ভাব!

লীলা কি মমতার কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়েই ফেলল?

মরিয়া হয়ে অমল বলল—বেরোলে তুমি কী করবে?

—রাত্তিরবেলা কাছে আসতে দেব না। ধাক্কা মেরে খাট থেকে ফেলে দেব। বেশি বাড়াবাড়ি করলে এমন চেঁচাব...! মনে রেখো, আমি আর নতুনটি নেই...

মাত্র পাঁচ মাসেই নতুন বউ পুরোন হয়ে যায়? পুরনো হয়ে যায়, নাকি মমতা হয়ে যায়?

লীলা চোখ পাকিয়ে বলল, আজ থেকে ক্লাব বন্ধ, আড্ডা বন্ধ, তাস বন্ধ। বউ একা একা বাড়িতে পচবে, আর তুমি ফুর্তি মেরে বেড়াবে? চলবে না, চলবে না।

ও বাবা, এ যে একেবারে স্লোগান দেয়!

অমল পাঞ্জাবি খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সত্যি যদি চেঁচায় লীলা তো চিত্তির। বধূ নির্যাতনের দায়ে পড়ে যেতে হবে। সেকশান ফোর নাইনটি এইট।

নাহ, সুব্রত ঠিকই বলেছে। মেয়েরা সবাই এক। এ জীবনের মতো অমলের পায়েও শিকল গেঁথে গেল।

রান্নাঘরে তখন মুখে আঁচল চেপে খুব হাসছে লীলা। হেসে কুটিপাটি খাচ্ছে।

সুধাকর

মাঘমাসের সকাল। বাজার নামিয়ে রেখে চুল ছাঁটতে গেছিলাম, ফিরে দেখি সুধাকর এসেছে। গ্রিল বারান্দার রোদ্দুরে বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে সুধাকর। পাশে বেঁটে টুলে ধূমায়িত চায়ের কাপ, প্লেটভর্তি নোন্‌তা বিস্কুট।

গেট থেকে হেঁকে উঠলাম,—কী হে, কতক্ষণ?

কাগজ নামিয়ে একগাল হাসল সুধাকর,—এখনও চায়ে চুমুক দিই নি, এ থেকেই আন্দাজ করে নাও।

প্রসন্ন মেজাজে চেয়ার টেনে বসলাম মুখোমুখি। সুধাকর আমার পুরোন বন্ধু, সেই কলেজ জীবনের। মাঝে সম্পর্ক একেবারেই ছিঁড়ে গেছিল, বছর পনেরো আগে আচমকা অফিসপাড়ায় দেখা, তারপর থেকে সুধাকর আসে কালেভদ্রে। হঠাৎ হঠাৎ। ধূমকেতুর মতো ক্ষণিক দর্শন দিয়ে ফের মিলিয়ে যায়। আমিও গেছি এক আধবার। মাখামাখি তেমন নেই বটে, তবে এই অবসরজীবনে বন্ধুবান্ধব এলে তো ভালই লাগে, খানিক সময় কাটে গল্পে

আড্ডায়।

মাঘের রোদেও গরম লাগছিল অল্প অল্প। শালখানা খুলে চেয়ারের হাতলে রেখে বললাম,—হঠাৎ পথ ভুলে আজ এদিকে?

সুধাকর উত্তর না দিয়ে হাসল একটু। কাগজ মুড়ে রাখতে রাখতে বলল,—তোমার বারান্দাখানা কিন্তু খাসা, বুঝলে। শীতকালে দারুণ আরাম।

—অনেক চিন্তাভাবনা করে প্লটটা কিনেছিলাম ভাই। যেন পুব দক্ষিণ পারমানেন্ট্‌লি ওপেন থাকে, গরমকালের চেয়ে শীতে বেশি রোদ খেলে...

—দোতলাটাও এবার তুলে নাও। রাস্তার গায়ে বাড়ি, দোতলায় ধুলোময়লা কম হবে।

নিতান্তই বাস্তববোধহীন পরামর্শ। রিটায়ার করে যৎসামান্য সঞ্চয় আগলে বসে আছি, বাড়িতে সর্বস্ব ঢেলে শেষ বয়সে কি ছেলের হাততোলা হয়ে থাকব? অবশ্য সুধাকর তো এই গোছেরই কথাবার্তা বলবে। সুধাকরের সাংসারিক জ্ঞানগম্যি আছে, এমন অপবাদ ওর অতি বড় শত্রুও দিতে পারবে না।

আলগা হেসে বললাম,—কী হবে রে ভাই প্রাসাদ হাঁকিয়ে? মেয়ে চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি, ছেলের বদলির চাকরি, আজ সে চাঁপাডাঙায় তো কাল হবিবপুর...আমরা দুই বুড়োবুড়ি বিশাল পুরীতে করবটা কী?

—হুম্। তা অবশ্য ঠিক।

মাথা নাড়তে নাড়তে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল সুধাকর। একখানা নোন্‌তা বিস্কুট তুলে নিল হাতে। চিবোচ্ছে। এবার মাস পাঁচেক পর এল সুধাকর, এর মধ্যে আরও খানিকটা বুড়োটে মেরে গেছে যেন। কপালে বলিরেখা প্রকট, চুল বেশির ভাগই সাদা, খসখসে চামড়া কুঁচকে গেছে বেশ। দেখে মনে হয় বয়স যেন সত্তরের ওপারে। একটু যেন রোগাও লাগছে না? শুকনো শুকনো? সময়টা কি আরও খারাপ যাচ্ছে সুধাকরের?

কাজের মেয়েকে দিয়ে উমা আমার চা পাঠিয়েছে। সঙ্গে সুধাকরের জন্য প্লেটে কটা নারকোল নাড়ু। কাপ হাতে তুলে জিজ্ঞেস করলাম,—তারপর? খবর বলো। আছ কেমন?

—চলছে। ...এই তো কদিন গঙ্গাসাগর ঘুরে এলাম।

—তাই নাকি? হঠাৎ বুড়ো বয়সে পুণ্যে মতি হল যে?

—আরে না। পুণ্যটুন্য তো শ্রীময়ীর ডিপার্টমেন্ট। আমি গেছিলাম অন্য উদ্দেশ্যে, বুঝলে।

—কীরকম?

—অনেকদিন ধরে গঙ্গাসাগরের পটভূমিকায় একটা উপন্যাস লিখব ভাবছি, বুঝলে। তারই রসদ জোগাড় করে আনলাম। চায়ের কাপ নামিয়ে নারকোল নাড়ু মুখে পুরল সুধাকর, —ফাঁকতালে শ্রীময়ীরও তীর্থদর্শন হয়ে গেল। ব্যস্ত লেখকের বউ হওয়ার অপরাধে বেচারীর তো কোনও কাশী বৃন্দাবনই হয় না।

হাসি পেয়ে গেল। সুধাকরকে নিয়ে এই এক মুশকিল। সারাক্ষণ বুঝলে বুঝলে করে নিজেকে একজন বিশাল লেখক প্রতিপন্ন করতে চায়। তার জন্য গুলগাপ্পিও ঝেড়ে চলে দেদার। অথচ সুধাকর যে কী দরের লেখক তা আমার ভালই জানা হয়ে গেছে। নয় নয় করে পাঁচ ছখানা বই তো উপহার দিয়েছে আমায়, দেখেছি উল্টেপাল্টে। পাতে দেওয়া যায় না। পাতার পর পাতা শুধু পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য মার্কা ক্যাতকেতে জোলো কাহিনী। ভাষা কাঁচা, প্লট দুর্বল, লেখার ভঙ্গিও মান্ধাতা আমলের। চল্লিশ বছর ধরে কলম পিষেও এখনও স্কুল ম্যাগাজিনের লেখক রয়ে গেল। নিসর্গপ্রেম, মানবিক সম্পর্কের জটিলতা, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, সমকালীন সমাজ, কিছুই ফোটে না লেখায়। সেই সুধাকর কিনা লেখার মালমশলা জোগাড় করতে সাগরে ছুটেছিল!

ঠাট্টাতামাশা খানিক করাই যায়। কারও মাঝে মাঝে। কখনও চটে গিয়ে তর্ক জোড়ে সুধাকর, কখনও চুপচাপ হাসে মিটিমিটি। তবে চৌষট্টি বছর বয়সে পৌঁছে সবসময়ে খেপানোর ছেলেমানুষি আর ভালও লাগে না। থাক না বেচারা নিজের ঘোরের অন্ধ কুয়োয়।

সহজভাবেই জিজ্ঞেস করলাম,—তা শ্রীময়ী এখন আছে কেমন? আগের বার বলছিলে না, ওর হাঁটুটা খুব ট্রাবল দিচ্ছে?

—লেংচে লেংচেই তো গঙ্গাসাগর করল। ...এদিকে ইদানীং তার আবার এক নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে, বুঝলে। পেট।

—কী হল পেটে?

—হঠাৎ হঠাৎ একটা ব্যথা উঠছে। কলিক পেনের মতো। এমনিতে

দিব্যি আছে, কিন্তু যন্ত্রণা স্টার্ট হলে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করে। পেন কিলারেও সহজে কমতে চায় না, বুঝলে।

—কিসের থেকে হচ্ছে?

—মনে হয় গ্যাস অম্বলের বাড়াবাড়ি। সারাজীবন প্রচুর অনিয়ম করেছে তো।

তাইই হবে। দেখেছি তো কী ক্ষয়াটে চেহারা। স্বামী তো ঘি ননীতে ডুবিয়ে রাখেই নি, তায় নাকি তার আবার শতেক ধর্মীয় প্যাখনা। আজ এই পুজো, কাল ওই ব্রত, আজ শনিবারের উপোস তো কাল জয় মঙ্গলবার...। সুধাকরের কথা শুনে মনে হয় ছেলেপুলে হয় নি বলে একটু বুঝি খ্যাপাটেও মেরে গেছে শ্রীময়ী। সুধাকরকে না খাইয়ে জলস্পর্শ করবে না, সুধাকর না ফিরল তো ভাত কোলে করে বসে রইল...।

ঈষৎ চিন্তান্বিত মুখে বললাম,—ডাক্তার দেখিয়েছ?

—এখনও হয়ে ওঠে নি। আমাদের ওখানে একজন কবিরাজ আছেন, বুঝলে। হেলাফেলার কোবরেজ নয়, রীতিমত ভিষগাচার্য উপাধি পাওয়া। পানিহাটিতে খুব নামডাক। উনি আবার আমার লেখার খুব অনুরাগী, বুঝলে। এখন একটু ফাঁকা হয়েছি, ভাবছি এবার একদিন শ্রীময়ীকে ওঁর কাছে নিয়ে যাব।

—কী এত রাজকার্য করো, যে বউকে ডাক্তার দেখানোর সময় পাও না?

—কাজ তো আমার একটাই রে ভাই। পেশাদার লেখক হয়েছি, লেখা নিয়েই আমার...। গত কয়েকটা মাস নাওয়া খাওয়ারও ফুরসত পাই নি বুঝলে। হাতের কাজ চুকল, তবে না গঙ্গাসাগর যেতে পারলাম।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল,—কী মহাভারতটা লিখছিলে?

সুধাকর যেন কথাটা লুফে নিল। হাতে হাত ঘসতে ঘসতে বলল,—মনময়ূরীর সেকেন্ড পার্টটা শেষ করলাম। প্রথম খণ্ড তো বছর ঘুরতে না ঘুরতে কেটে গেছে, বুঝলে। পাবলিশার তাই ধরে পড়ল দ্বিতীয় খণ্ডটি বইমেলার আগে লিখে দিতে হবে। পুরোন পাবলিশার, বহুকালের সম্পর্ক, না করতে পারলাম না।

ফের আত্মপ্রচারের ঝাঁপি খুলেছে সুধাকর। শ্লেষটা ফুটেই গেল

গলায়,—বাহ্, তোমায় এখন পায় কে! বছর বছর এডিশান, কম কথা!

সুধাকর ব্যঙ্গটা বুঝলই না। ঈষৎ দুলে দুলে বলে চলেছে,—তুমি বন্ধু মানুষ তোমার কাছে লুকোছাপার কিছু নেই...আমার বই-এর কাটতি সত্যিই বেড়েছে, বুঝলে। তবে হ্যাঁ, হয়তো বড় বড় লেখকদের মতো নয়। তাদের যেখানে পাঁচ হাজার বিকোয়, আমার সেখানে হাজার। তা ভাই আমার পাবলিশার তো এতেই খুশি।...ভেবেছিলাম মনময়ূরীর এই খণ্ডটা একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে লিখব, অ্যাইসান তাগাদা দিতে লাগল।

এই ধরনের বুলি কপচানোকে কী বলে? বারফাট্টাই? আমার স্কুলের সহপাঠী মনীশও আছে লেখালিখির লাইনে। অধ্যাপনা করত, বাংলা সাহিত্যের ওপর বেশ কয়েকখানা প্রবন্ধের বইও আছে মনীশের। থাকে পানিহাটিতে, সুধাকরদেরই পাড়ায়। মোটামুটি চেনেও সুধাকরকে। মনীশের মুখেই শুনেছি কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় এক ধরনের প্রকাশক আছে যারা নিম্ন মানের কাগজে, যেমন তেমন করে হোক ছেপে, বিকট রুচির প্রচ্ছদ লাগিয়ে সুধাকরদের মতো লেখকদের গল্প উপন্যাস বাজারে ছাড়ে। এবং লাইব্রেরি টাইব্রেরিকে মোটা কমিশন খাইয়ে, মফস্বলের মেলায় মেলায় ঘুরে বইগুলো বেচেও ফেলে দিব্যি। অবিরাম ধরনা দিয়ে দিয়ে এরকম এক দুজন প্রকাশককে নাকি জপিয়ে রেখেছে সুধাকর, তাদের দৌলতে বছরে দু-বছরে এক আধখানা বই তার বেরিয়েও যায়। এই সব প্রকাশকরা সুধাকরদের টাকাপয়সা ছোঁয়ায় না বড় একটা। দিলেও জোর দু পাঁচশো, তাও জুতোর সুকতলা খইয়ে ফেলার পর। এরকমই কোনও প্রকাশক গদগদ হচ্ছে, সুধাকরের ঘাড় ধরে লিখিয়ে নিচ্ছে, এ কি বিশ্বাস করা সম্ভব?

ফের ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম,—এতই যখন বিক্রিবাটা, পাবলিশারকে বলছ না কেন বড় করে তোমার বিজ্ঞাপন করতে? সেল্ তো তাহলে আরও চড়ে।

—আমার পাবলিশার বিজ্ঞাপনের পরোয়া করে না রে ভাই। সুধাকর নির্বিকার,—তার সাফ কথা, আপনার বই এমনিই যখন কাটছে, ফালতু খরচে যাব কেন? পারলে বরং এই টাকার খানিকটা আমি আপনাকেই দেব।

—দেয় তোমাকে?

—হয়তো দেয়। কিম্বা দেয় না। আমি লেখক মানুষ, অত চুলচেরা

হিসেব বুঝে নেওয়া কি আমায় মানায়? হাজার কপি বলে দু হাজার তিনহাজার ছাপায় কিনা সেও কি ছাই আমি জানি? তবে একটা কথা বলতে পারি, বুঝলে ভাই...অন্যদের রয়্যালটি যদি ফিফটিন্ পারসেন্ট হয়, তো আমার টোয়েন্টি ফাইভ।

নাহ্, সুধাকরের ওপরচালাকির অভ্যেস আর যাবে না। কথাবার্তার ঢং কী, যেন ওই সব ছাইপাঁশ লিখে লাখ লাখ কামায়! আদতে হাঁড়ির হাল যে কী, সে তো আমার স্বচক্ষে দেখা। নেহাত ঠাকুরদা একখানা বাড়ি রেখে গেছিল, তাই মাথার ওপর ছাদ অন্তত একটা আছে। কিন্তু পেটের ভাত? এক বেলা ঠিকঠাক জোটে কিনা সন্দেহ। চা'পাতা আছে তো চিনি নেই, চাল আছে তো কেরোসিন বাড়ন্ত, হুট করে কেউ গিয়ে পড়লে ছুটছে মুদির দোকানে ধার করতে...। ঘরদোরেরও কী বাহার। জানলায় শাড়ি কেটে পরদা, দেওয়ালে রঙ্ তো দূরস্থান চাঙড় খসে খসে পড়ছে, আটফাটা মেঝে, বিবর্ণ আসবাব। পেশাদার লেখক বনবে বলে সারাজীবন চাকরি বাকরির ধার মাড়ায় নি সুধাকর, চাকরি করলে নাকি সরস্বতীর সেবায় বিঘ্ন ঘটত। ঘটিবাটি সোনাদানা যেটুকু ছিল সব নিঃশেষ করেছে। চরম বিপন্ন দশায় পড়লে নাকি এদিক ওদিক প্রুফ দেখে দু চার পয়সা কামায়। কিন্তু তাতেই বা কতটুকু সুসার হয় সংসারের? এই যে গায়ে একটা খসকুটে শাল জড়িয়ে আছে সুধাকর, এটা তো বোধহয় সেই আচমকা দর্শন মেলার দিন থেকেই দেখছি। পরনে ধুতিপাঞ্জাবীর হতজীর্ণ দশা। দৈন্যের বহর যত বাড়ে, নিজেকে পেশাদার লেখক হিসেবে ঘোষণাও বুঝি তত উচ্চকিত হয় সুধাকরের। বলিহারি দেমাক!

সুধাকর আধময়লা পাঞ্জাবীর পকেট হাতড়ে বিড়ির বাণ্ডিল বার করেছে। গোছা থেকে একখানা বিড়ি নিয়ে দু চারটে ফুঁ মারল। ঠোঁটে ঝুলিয়েছে। বুকে হাত চাপড়ে চাপড়ে খুঁজছে দেশলাই।

নাক কুঁচকে বললাম,—উফ্, বদ নেশাটা আর ছাড়তে পারলে না!

—লেখক মানুষের একটা আধটা নেশা না থাকলে চলে ভাই! মগজই খোলে না, বুঝলে। সুধাকর বিড়িখানা ধরিয়ে ফেলল। শীতের পরিচ্ছন্ন সকালটাকে কটু গন্ধ ভরিয়ে দিয়ে হাসছে মৃদু মৃদু। আমেজে চোখ বুজে বলল,—শরৎচন্দ্র আফিং খেতেন, মানিকবাবু মদ, আমি ধরেছি বিভূতিবাবুর

নেশাটা। নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক বিড়ি, বুঝলে।

বলতে যাচ্ছিলাম, নেশাটা নকল না করে যদি বিভূতিভূষণের লেখাটা নকল করতে পারতে...। ঝেঁঝে ওঠার আগেই বারান্দায় উমার আবির্ভাব। হলুদের হাত শাড়ির আঁচলে মুছতে মুছতে বলল,—আপনার ভাত কিন্তু চড়িয়ে দিচ্ছি সুধাবাবু। দুপুরে চাট্টি খেয়ে যাবেন।

—আজ? সুধাকরের মুখে একগাল হাসি,—আজ তো হবে না গো।

—কেন?

—শ্রীময়ীকে বলা নেই। সে আবার থালা সাজিয়ে বসে থাকবে।

—বেশ আছেন আপনারা। উমা হেসে ফেলল,—দুজনে কুজনে...। তা ভাত না খান, একটু কপিপোস্ত টেস্ট করুন। আপনি এত পোস্ত ভালবাসেন...

—বাহ্ বাহ্, মনে রেখেছ? সুধাকর খুব খুশি,—দাও তবে অল্প করে।

কাউকে কিছু খাওয়াতে পারলে উমা ভারী আহ্লাদিত হয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্লেটে কপিপোস্ত হাজির। জিভে চকাম চকাম শব্দ বাজিয়ে উমার রান্না চাখছে সুধাকর। পুলকিত স্বরে উমাকে বলল,—আমার প্রিয়তমা বইটা তোমাদের দিয়েছিলাম না? পড়েছ?

চোরা চোখে আমার দিকে তাকাল উমা। হ্যাঁ বলবে, কি না বলবে দ্বিধায় পড়েছে যেন।

সুধাকর আবার বলল,—ওতে একটা দৃশ্য আছে, বুঝলে। পুরোন প্রেমিকের সঙ্গে বহু যুগ পর দেখা হয়েছে নায়িকার। প্রেমিকটি এখন লেখক, তাকে হাতপাখার বাতাস করতে করতে বিউলির ডাল আর আলুপোস্ত খাওয়াচ্ছে নায়িকা...

—হাতপাখা কেন? না বলে পারলাম না, —ঘরে ফ্যান নেই? নাকি লোডশেডিং?

—হাতপাখায় যে ভালবাসাটা ফোটে, ফ্যানের হাওয়ায় তা তুমি কোথায় পাবে ভাই? বলেই সুধাকরের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েছে,—প্রিয়তমা তোমরা পড়ো নি মনে হচ্ছে? পোড়ো, পোড়ো, ভাল লাগবে।

কী করে সুধাকরকে বলি, চেষ্টা করলেও ও বই আর পড়ার উপায় নেই। সুধাকরের প্রিয়তমা কবেই সাফ হয়ে গেছে পুরোন কাগজ আর ম্যাগাজিনের সঙ্গে।

বই না পড়ার অপরাধ স্খালনের জন্যই বুঝি উমা তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—আপনার সেদিন একটা নাটক শুনছিলাম রেডিয়োতে। গত মাসে বোধহয়। কী যেন নাম? কী যেন নাম?

—প্রাণের চেয়ে প্রিয়। সুধাকর বেজে উঠল,—ওটা রিপিট ব্রডকাস্ট ছিল। এই নিয়ে চারবার চালাল, বুঝলে। চেকটা ওরা আমায় আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল। দু হাজার।

গুল মারার আর জায়গা পায় না, হাহ্! পুনঃপ্রচারে দু হাজার! মনীশ মাঝে মাঝেই টক দেয় রেডিয়োতে, আজ পর্যন্ত পাঁচশোর বেশি কখনও পায় নি। তাও ওই এক বার, প্রথম প্রচারের সময়ে। তারপর হাজার বার ওই টেপ চালালেও এক পয়সা দেয় না। সুধাকরের মাত্রাজ্ঞান যে কবে হবে!

টাকার অংক শুনে উমা বুঝি একটু একটু নাড়া খেয়েছে। মুগ্ধ মুগ্ধ চোখে বলল,—টেলিভিশানে আপনার কিছু আসছে না?

—হয়েছিল তো একটা। সুখের সংসার। ওরা নাম পাল্টে দিয়ে শুধু সংসার রেখেছিল। দ্যাখো নি?

—না...কই আপনি তো...আজকাল এত চ্যানেল...

—আবার একটা হবে। নাট্যরূপ দেওয়া চলছে। ...তবে আমি খুব একটা সন্তুষ্ট নই, বুঝলে।

—কেন?

—টাকাটা বড় কম দেয়। দশ হাজারের বেশি উঠতেই চায় না। আমি পেশাদার লেখক...লেখাই আমার জীবিকা...সম্মান দক্ষিণা যদি মনোমত না পাই...

—কিন্তু টিভিতে হলে কত বেশি মানুষের কাছে আপনার লেখার পৌঁছোয়, ভাবুন।

—সে তো বই হয়েও পৌঁছোয়। ...তবে হ্যাঁ, টিভির দর্শকের কথাও আমি ভাবি বৈকি। সেই জন্যই না...

বিমোহিত শ্রোতা পেয়ে আরও খানিকক্ষণ বাকতাল্লা মেরে উঠল সুধাকর। তাকে এগিয়ে দিয়ে এসে হাল্কা ধমক দিলাম উমাকে,—তুমি কী গো! বেমালুম ওই গুলবাজটাকে তোল্লাই দিয়ে যাচ্ছিলে?

উমা পাল্টা মুখঝামটা দিল,—তোমার আবার বেশি বেশি। মানুষটাকে

তুমি বড্ড হেলাফেলা করো। সুধাবাবুর নাটক হয় না রেডিয়োতে? আমি স্বকর্ণে শুনেছি। টিভিতেও নিশ্চয়ই দেখিয়েছে।

—কীভাবে হয় জানো? মনীশ এলে মনীশকে জিজ্ঞেস কোরো। টিভি রেডিয়োর প্রোডিউসারদের কাছে গিয়েও বডি ফেলে দেয়। একটা গল্প গছানোর জন্য ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকে মাসের পর মাস। হাতে পায়ে ধরে।

—তবু হয় তো।

—টাকাও অত পায় না। ও তো বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে গেল।

—তাতে তোমার কী এল গেল? ...গরীব মানুষ...সারাটা জীবন এই নিয়েই পড়ে আছেন...কিছুই করে উঠতে পারেন নি...ওইটুকু বলে উনি যদি একটু সুখ পান...

উমাকে বেশ দ্রবীভূত করে ফেলেছে তো সুধাকর! হেসে ফেললাম,—বুঝেছি।

—কী বুঝেছ?

—তুমি মরেছ। চোখ নাচালাম,—এবার এলে পোস্ত খাওয়ানোর সময়ে ভাল করে পাখার বাতাস কোরো, কেমন।

তা সে সুযোগ আর উমার মিলল কই! মাস দুয়েকের মাথায় একটা বিচ্ছিরি খবর পেলাম সুধাকরের। না, খবরটা ঠিক সুধাকরের নয়, শ্রীময়ীর। সুধাকরের বউ-এর।

মার্চের মাঝামাঝি বাবান এসেছিল কলকাতায়। বউ বাচ্চা নিয়ে। হপ্তা খানেকের জন্য বাবা মাকে নাতির সঙ্গসুখ দিয়ে গেল। তাদের ট্রেনে তুলে দিতে আমি আর উমা গিয়েছিলাম হাওড়া স্টেশনে, ফিরতেই কাজের মেয়েটি বলল, মনীশবাবুর ফোন এসেছিল, জরুরী দরকার, আমি যেন অবশ্যই তার সঙ্গে যোগাযোগ করি।

শার্ট টাট না ছেড়েই ডায়াল ঘোরালাম,—কী রে, কী ব্যাপার?

ভূমিকা না করেই মনীশ বলল,—তোর লেখকবন্ধুর খবর শুনেছিস?

—সুধাকর? কী হয়েছে সুধাকরের?

—বউ-এর ক্যান্সার।

—সে কি?

—হ্যাঁ রে। সুধাকরবাবুর এক ভাইপো আমার কাছে পড়তে আসে, ও'ই বলল।

—কী কাণ্ড! কবে হল?

—আমি তো জানলাম আজ। বোধহয় দিন পনেরো আগে ধরা পড়েছে। লিভার ক্যানসার। স্টেজ নাকি বেশ অ্যাডভান্সড।

—চিন্তার কথা।

—যার চিন্তা করার কথা তার তো কোনও মাথাব্যথা নেই। সৌম্য এসে আজ গজগজ করছিল কাকা নাকি সেভাবে ডাক্তার পর্যন্ত আর দেখাচ্ছে না। সবই নাকি ভাগ্যের হাতে ছেড়ে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে। কী চিজ রে ভাই! টাকা নেই তো সংকোচের কী আছে? চাইলে লোকাল পিপল্‌রা চাঁদা করে কিছু তুলে দিতে পারে। ওর জ্ঞাতিভাইরাও নাকি সব হায় হায় করছে। অমন একটা ভালমানুষ মহিলা বেঘোরে মরে যাবে!

ফোন রেখে উমাকে বললাম ব্যাপারটা। উমারও মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। রাতে খেতে বসে বলল,—তুমি একবার কাল সুধাবাবুর কাছে যাও।

—হুম্, যেতে তো হবেই। কিন্তু ওই খ্যাপাকে...

—অনেকসময় বন্ধুবান্ধবদের কথায় কাজ হয়। তোমাকে তো উনি বেশ পছন্দ করেন। দ্যাখো বুঝিয়ে বাঝিয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারো কিনা।

পরদিন সকালে জলখাবার খেয়েই ছুটলাম পানিহাটি। সুধাকরদের বাড়িটা প্রায় গঙ্গার কাছাকাছি, বাস থেকে নেমে খানিকটা হাঁটতে হয়। বড়সড় দোতলা বাড়ি, দেখেই বোঝা যায় দু পুরুষ আগে সুধাকরদের অবস্থা রীতিমত ভাল ছিল। তবে এখন যে পড়তি দশা তা অনুমান করাও কঠিন নয়, শরিকে শরিকে বহুধাবিভক্ত বাড়ির দেওয়ালে বটগাছের চারা গজিয়েছে।

সুধাকরের ভাগে পড়েছে পিছন দিকটা। একতলার। সদর সারাক্ষণ খোলাই থাকে, উঠোন কলতলা পেরিয়ে ডাক দিলাম,—সুধাকর? আছ নাকি?

মিনিট খানেক সাড়াশব্দ নেই। তারপর কালচিটে দরজা খুলে সুধাকর বেরিয়ে এল। পরনে লুঙ্গি আর বগলফাটা গেঞ্জি।

সুধাকরকে কখনও তেমন চমকাতে দেখিনি। আজও কোনও বিস্ময়ের রেখা ফুটল না মুখে। বলল,—ও, তুমি? এসো এসো।

ঘরে ঢুকতেই একটা চিমসে গন্ধ ঝাপটা মারল নাকে। ভ্যাপসানি? নাকি অসুখের? এ ঘরের যত হতদরিদ্র হালই হোক, শ্রীময়ী তো মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই রাখে, এমনটাই দেখেছি। আজ কিন্তু রীতিমত বিশৃঙ্খল দশা। আধভাঙা চেয়ারদুটো ছেতরে আছে দু ধারে, আদ্যিকালের কাচের আলমারিটার পরতে পরতে ধুলো, মেঝেতে ছড়িয়ে আছে মুড়ি। পিঁপড়ে ঘুরছে।

চেয়ার দুটো ঠিকঠাক করে সুধাকর বলল,—বোসো। চা খাবে তো?

ভুরু কুঁচকে বললাম,—কে করবে? তুমি?

উত্তর না দিয়ে সুধাকর পাল্টা প্রশ্ন করল,—সঙ্গে ওমলেট ভেজে দেব?

গম্ভীর মুখে বললাম,—আমি আপ্যায়িত হতে আসি নি সুধাকর।

সুধাকর চুপ হয়ে গেল। আমার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল দু এক সেকেন্ড। তারপর মলিন হেসে বলল,—ও, খবরটা পেয়েছ তাহলে?

জবাব দিলাম না।

সুধাকর ফের বলল,—তুমি যা ভাবছ তা নয় বুঝলে? ও শয্যাশায়ী নেই। রাতের দিকে ব্যথাটা আসে। আর কিছু খেলে টেলে...। দিনের বেলাটা ঠিকই থাকে।

—আর তাই তুমি তাকে দিয়ে সব করিয়ে নিচ্ছ?

—বারণ করলে শোনে না, ভাই। সুধাকর গলা নামাল,—আমিও খুব জোরাজুরি করি না। পাছে হিতে বিপরীত হয়। শুইয়ে রাখতে চাইলে হয়তো টের পেয়ে যাবে ওর কী হয়েছে।

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম,—শ্রীময়ী জানে না?

—খেপেছ? বলি? ভয়েই মরে যাবে না! ও জানে খারাপ ধরনের জন্ডিস, সাবধান থাকতে হবে।

জীবনে এই প্রথম বুঝি একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছে সুধাকর। ক্যানসারের নাম শুনলে আচ্ছা আচ্ছা পালোয়ানের আতংকে নাড়ি ছেড়ে যায়, আর শ্রীময়ী তো সামান্য এক গৃহবধূ। যার সংসারটিও এমন, সেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।

সুধাকর গলা ঝাড়ল,—চা তাহলে করতে বলি?

—শুধু চা। লিকার। চিনি ছাড়া।

—দু মিনিট। তুমি হাত পা ছাড়িয়ে বসো, আমি লেখার কাগজগুলোও গুছিয়ে আসি। পড়ে থাকলে আমার স্লিপগুলো বড উল্টোপাল্টা হয়ে যায়।

শুনেই গা'টা রি রি করে উঠল। সত্যি, চিজ না চিজ! বউ-এর মরণাপন্ন দশা, উনি কিনা বসে বসে অখদ্যে নাটুকে সেন্টিমেন্টের ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন কলমে!

সুধাকর পিছনের ঘরে গেছে। সাবধানে বসলাম চেয়ারে। জানলায় চোখ গেল। ওপারে কিছুই দৃশ্যমান নয়, শুধু শ্যাওলা ধরা এক উঁচু পাঁচিল ছাড়া। ক্ষীণ একটা কলরব ভেসে আসছে, এ বাড়িরই কোনও অংশ থেকে। উঁহু, কলরব নয়, টিভির আওয়াজ। চৈত্রমাসের গোড়াতেই এ বছর গরম পড়ে গেছে বেশ, পুরোন আমলের পুরু দেওয়ালঅলা ঘরে বসেও ঘামছি অল্প অল্প। মাথার ওপর চার ঠ্যাং-এর সাবেক ফ্যান। সম্ভবত ঠাকুরদাই লাগিয়েছিল। ঘুরছে না। চালাতে ভুলে গেছে সুধাকর।

উঠে সুইচটা অন করতে গেছি, সুধাকর ফিরেছে। বলল, বৃথা চেষ্টা। চলবে না।

—কেন? খারাপ?

—কারেন্ট নেই।

—কিন্তু টিভির আওয়াজ পাচ্ছি যে?

—আরে বোলো না, ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই অফিসের বদমাইশি। সুধাকর বলল,—দুম করে একটা পাঁচ হাজার টাকার বিল পাঠিয়েছিল, বুঝলে। কেন দেব অত টাকা ? কমপ্লেন তো নিলই না, উল্টে আমার লাইনটা কেটে দিয়ে গেল। আমিও ছাড়ব না, বুঝলে। দরকার হলে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট করব।

আমার যা বোঝার বুঝে গেছি। সেই ফানুশমার্কা ডায়ালগ্। ক'মাস বিল মেটায় নি কে জানো ও প্রসঙ্গে না গিয়ে সরাসরি কাজের কথায় গেলাম,—তা কী করছ বউটার?

—খাওয়াচ্ছি ওষুধ বিষুধ। ব্যথাটা যাতে কম থাকে।

—কাকে দেখাচ্ছ?

—ভাল একটা হোমিওপ্যাথের সন্ধান পেয়েছি, বুঝলে। রবিন সিন্‌হা।

নাটাগড়ে চেম্বার। আমার বিশেষ অনুরাগী। খুব মন দিয়ে দেখছে শ্রীময়ীকে।

—ওফ্, ওসব হোমিওপ্যাথ ফোমিওপ্যাথ ছাড়ো। একজন ক্যানসার স্পেশালিস্টকে দেখাও, কেমোথেরাপি করাও।

—কী হবে আর শরীরে বিষ ঢুকিয়ে? লাভ নেই, বুঝলে।

সুধাকরের যেন তাপ উত্তাপ নেই! ক্ষুব্ধ স্বরে বললাম,—লাভ হবে না, তুমি বুঝে গেছ?

—বোঝাবুঝির কী আছে, লিভারে কিছু করা যায় না।

—নাকি তুমি কিছু করতে চাও না?

—না গো, বিশ্বাস করো। কবিরাজ মশাইকে দেখিয়েছিলাম। উনিই তো প্রথম বললেন, লক্ষণ ভাল নয়, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে টেস্ট করান। শুনে নিয়েও গিয়েছিলাম আর-জি-করে, বুঝলে। পরীক্ষা টরিক্ষা করে ওই তো বেরোল। ওখানকার ডাক্তারই বলল ভর্তি করে কাজ নেই। এরপর পেট ফুলে যাবে, জন্ডিসটা বাড়বে, বমিটমি হবে..কেমো করে এখন আর উন্নতি হবে না। আর কপাল ভাল থাকলে শরীর আপনাআপনি কিছুকাল রুখে রাখবে ব্যাধিকে। ততদিন যন্ত্রণাটা যাতে কম থাকে তারই চেষ্টা...। বলতে বলতে কানের পিছন থেকে বিড়ি বার করেছে সুধাকর। আপত্তি জানানোর সুযোগ না দিয়ে ধরিয়েও ফেলল ফস করে। দেশলাই লুঙ্গির খুঁটে গুঁজতে গুঁজতে বলল,—অগত্যা তাই করছি, বুঝলে। ফলও পাচ্ছি। বলতে নেই, দু তিন দিন পেনটাও তেমন বাড়ে নি।

কী অবলীলায় কথাগুলো বলে যাচ্ছে সুধাকর! আমি হাঁ হয়ে যাচ্ছিলাম। সুধাকরের কি হৃদয় বলে কোনও বস্তু নেই? নাকি অবাস্তব দুনিয়ায় চরতে চরতে বাস্তব অনুভূতিগুলো ভোঁতা মেরে গেছে?

কলাই-এর থালায় দু কাপ চা সাজিয়ে শ্রীময়ী ঢুকল ঘরে। মাথায় আধো ঘোমটা। পরনে সস্তা দামের ছাপা শাড়ি। শাঁখাটি ছাড়া পুরোপুরি নিরাভরণ। গত বারের মতো অত শীর্ণ লাগছে না শ্রীময়ীকে, বরং গোটা শরীরে কেমন ফোলা ফোলা ভাব। ফর্সা রঙ একেবারে কালি মেরে গেছে। ফুলো ফুলো চোখদুটোর নীচে গাঢ় কালো ছোপ। কিসের ছায়া? এ কি আসন্ন মৃত্যুর সংকেত?

দুর্বল স্বরে শ্রীময়ী বলল,—বহু যুগ পরে এলেন কিন্তু। সেই আপনার

ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছিলেন, তারপর এই...

সুধাকর তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—আসলে আমিই তো যাই, তাই আর ওর...। এই সপ্তাহ দুয়েক কামাই করেছি, ওমনি খোঁজ করতে ছুটে এসেছে। বুঝলে, একেই বলে বন্ধু।

স্তুতিতেও এতটুকু খুশি হলাম না। নিজের স্ত্রীকেও মিথ্যে গপ্পো শোনায়, চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপে না, সুধাকরটা কী? এরকম একটা মিথ্যে বলারই বা কী প্রয়োজন?

নিজেকে শান্ত রেখে বললাম, —আপনার শুনলাম শরীরটা ভাল যাচ্ছে না?

—আর বলবেন না, কী যে রোগে ধরল! আপনার বন্ধুর ঠিক মতো দেখাশুনো করতে পারছি না, ওর লেখায় কত ব্যাঘাত হচ্ছে...

শ্রীময়ী হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। বললাম,—ও নিয়ে আপনি ভাববেন না তো। শরীরটাকে আগে সারান। যান, বিশ্রাম নিন গিয়ে।

মন্থর পায়ে চলে গেল শ্রীময়ী। ও কি এখন গিয়ে রান্নাবান্না করবে? বেআক্কেলে স্বামীর জন্য? চা'টা বিস্বাদ লাগছিল, এক চুমুকের পর আর মুখে তুলতে পারলাম না। চাপা স্বরে বললাম,—তোমার কি মায়া দয়া বলে কিছু নেই সুধাকর?

—কেন? এ কথা বলছ কেন?

—হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে? ছেলেমানুষি কোরো না, ক্যানসার হস্‌পিটালে ভর্তি করে দাও। ওখানে খরচাপাতি বেশি লাগবে না। যেটুকুনি যা পড়বে...ভাবছ কেন, আমরা তো আছি।

—তুমি ভাবছ টাকার জন্য আমি পিছিয়ে যাচ্ছি? না রে ভাই না, ওটা কোনও সমস্যা নয়। সুধাকর চশমাটা চোখে চেপে নিল,—এই তো, পরশুদিন এক প্রোডিউসার এসেছিল বাড়িতে। আমার বিধির বিধান উপন্যাসটা নিয়ে একটা ফিল্ম বানাতে চায়। চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে চিত্রস্বত্ব কেনার জন্য ঝুলোঝুলি করছিল, বুঝলে। একশো টাকায় নোটের বান্ডিল আমার হাতে গুঁজে দিচ্ছিল। আমি কিন্তু পঞ্চাশ হাজারের এক পয়সা কম নিতে রাজী হলাম না। ...আমার গল্প নিয়ে তোমরা ষাট সত্তর লাখ টাকার সিনেমা বানাবে, আমি যা চাইব, তা দেবে না কেন? টাকা থাকলেই যদি শ্রীময়ীর অসুখ সেরে যেত,

তাহলে তো আমি পরশুই...। বিশ্বাস না হয় শ্রীময়ীকে ডাকো, জিজ্ঞেস করো, ও তো দেখেছে...

আবার সেই নির্জলা মিথ্যে? অহেতুক বড়াই?

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আপনা আপনি। সুধাকরের মতো মানুষদের উপকার করে এমন সাধ্য কার আছে এই দুনিয়ায়? অন্তত আমার তো নেই।

বেচারা শ্রীময়ী।

সত্যিই বেচারী। পুরো ছটা সপ্তাহও টিকল না শ্রীময়ী।

মাঝে আর শ্রীময়ীকে দেখতে যাই নি। কী হবে গিয়ে, কিছুই তো করতে পারব না। মৃত্যুসংবাদের প্রতীক্ষায় ছিলাম। খবরটা পেয়ে অবশ্য আর পুরোপুরি নিস্পৃহ থাকার জো রইল না, উমা প্রায় ঠেলে পাঠাল আমাকে। যেমনই হোক, বন্ধু তো, শোকের দিনে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ানো নাকি বন্ধুর কর্তব্য।

বিকেলবেলা শ্রীময়ী ঢুকে গেল ইলেক্ট্রিক চুল্লিতে। শ্মশানে সুধাকরের কিছু জ্ঞাতি পরিজন এসেছে। পাড়ার কয়েকটি ছেলেও। এদিক সেদিকে জটলা বেঁধে রয়েছে তারা। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। শেষের কদিন শ্রীময়ী কী ভীষণ কষ্ট পেয়েছিল, পেট ফুলে ঢোল, আজীবন মুখ বুজে থাকা মহিলা কী ভয়ংকর আর্তনাদ করত যন্ত্রণায়, বেশির ভাগই সেই সব আলোচনা। সুধাকরের নিন্দেও যেন ভাসছিল শ্মশানের বাতাসে। মানুষপোড়া গন্ধের মতো।

পরিবেশটা আমার ভাল লাগছিল না। পায়ে পায়ে সরে এলাম গঙ্গার ধারে। শবযাত্রীদের জন্য সিমেন্টের বেঞ্চি করা আছে। ভাবছিলাম শ্রীময়ীর কথা। কী পেল এ জীবনে? একটা অপদার্থ স্বামী, চরম দারিদ্র্য, অনাহার, প্রাণঘাতী অসুখ, অসহ্য কষ্ট, তারপর পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া। সন্তান সুখ? তাও তো জুটল না কপালে। মর্নিং ওয়াকে ইদানীং এক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বলছিলেন লিভার ক্যানসার লাস্ট স্টেজে ধরা পড়লে কেমোথেরাপি করেও নাকি কিছু হয় না। শুনে খুব একটা সান্ত্বনা পাই নি।

কণামাত্র সম্ভাবনা থাকলেও কি চিকিৎসাপাতিতে যেত সুধাকর?

আকাশ দুপুর থেকে গুম মেরে আছে। নদীর ধারেও এতটুকু বাতাস নেই। দূরে মেঘ জমছে একটু একটু। শেষ বিকেলের গঙ্গা চিরে চলেছে এক লন্‌চ। ঢেউ উঠছে। নামছে। আবার উঠছে।

কে যেন পাশে এসে বসল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি সুধাকর। শ্রীময়ীর মুখে আগুন দেওয়ার সময়ে সুধাকর ধুতির খুঁটে চোখ মুছছিল, এখন তার মুখে আবার সেই পুরোন নির্বিকল্পভাব। বিড়বিড় করছে কী যেন।

জিজ্ঞেস করলাম,—কিছু বলছ?

—নাহ্। ভাবছি। একদিক দিয়ে বোধহয় ভালই হল, বুঝলে। মায়ার বাঁধনটুকু ছিঁড়ে গেল। আর কোনও পিছুটান রইল না। এবার শুধু লেখা আর লেখা।

অসহ্য। মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

সুধাকর আপন মনে বলে চলেছে,—রবীন্দ্রনাথ বউকে হারিয়েছিলেন একচল্লিশ বছর বয়সে। শরৎচন্দ্রের প্রথম স্ত্রী যখন মারা যান, শরৎচন্দ্রের বয়স তখন বত্রিশ। বিভূতিবাবুও প্রথমা স্ত্রীকে...

—তুমি থামবে?

কড়া ধমকে থতমত খেয়ে গেল সুধাকর। আমতা আমতা করে বলল,—আমি কি ভুল বলেছি? সে তুলনায় শ্রীময়ী তো...

—তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। খিঁচিয়ে উঠলাম,—তুমি নিজেকে কী ভাবো, অ্যাঁ? রবীন্দ্রনাথ? শরৎচন্দ্র? বিভূতিভূষণ? তুমি ওঁদের নখের যুগ্যি?

—ওভাবে বলছ কেন? তাঁরা আছেন তাঁদের আসনে। আমি ছোট মাপের লেখক, আমি আছি আমার মতো। সূর্য থাকলে লম্ফ কি জ্বলে না?

—ফের ডায়ালগ? তুমি লম্ফ কেন, জোনাকিও নও। সারাটা জীবন লেখা লেখা খেলা করে নিজেও কমপ্লেক্সের ট্যাবলেট বনেছ, বউটাকেও তিলে তিলে মেরেছ। কী লিখেছ তুমি, অ্যাঁ? রাবিশ। ট্র্যাশ। দাঁতে দাঁত ঘসলাম। তর্জনী নাচিয়ে বললাম,—কিসের এত অহংকার তোমার? তুমি কী, সেটা শুনবে? তুমি একজন আদ্যন্ত অসফল মানুষ। আটার ফেলিওর। তুমি কোনও লেখকই নও। লেখকের পর্যায়েই পড়ো না। তুমি কোথ্থাও থাকবে না বোকচন্দর। তুমি একটি অ্যাবসোলিউট জিরো।

স্তম্ভিত মুখে আমায় দেখছে সুধাকর। আস্তে আস্তে মুখখানা পাংশু হয়ে গেল। মাথা নামিয়ে নিয়েছে। অস্থির ভাবে হাত চালাল পকেটে, বিড়ি বার করে ঠোঁটে গুঁজল। দেশলাই-এর বারুদে কাঠি ঠুকছে। আঙুল কাঁপছে সুধাকরের, কাঠি জ্বলছে না।

সুধাকর মুখ থেকে ফেলে দিল বিড়িটা। ঈষৎ স্খলিত পায়ে চলে গেল গঙ্গার পাড়ে। একেবারে নদীর প্রান্তে। বহতা জলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিথর। পড়ন্ত সূর্যের মুখোমুখি।

ক্রমশ সিল্যুয়েট হয়ে যাচ্ছিল সুধাকর।

সুধাকর আর আসে না আমাদের বাড়ি।

বছর আড়াই কেটে গেছে। সুধাকরের কথা আর সেভাবে মনেও পড়ে না। মনীশ আসে মাঝে মাঝে, ফোন টোনও করে, তবে তখন সুধাকরের প্রসঙ্গ ওঠে না বড় একটা। সুধাকর ধূমকেতুর মতোই মিলিয়ে গেছে।

আমি আর উমা এখন আবার নতুন করে সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। চেষ্টাচরিত্র করে বাবান শেষ পর্যন্ত বদলি হয়ে এসেছে কলকাতায়, বউ ছেলে নাতি নিয়ে আমাদের বাড়ি এখন জমজমাট। এর মধ্যে ছুটকুর একটা ফুটপুটে বোনও হল, তাকে নিয়ে জোর মেতে আছি বুড়োবুড়ি। পুচকুনের হামা টানা, হাঁটতে শেখা, আধো আধো বুলি উপভোগ করি প্রাণ ভরে। মনে হয় যেন নাতিনাতনির কারণেই বেঁচে থাকাটা আমাদের সার্থক।

এবার পুজোয় বাবলি এল দিল্লি থেকে। শ্বশুর বাড়িতেই উঠল, তবে বাবা মার কাছে আসছে প্রায়ই। কখনও টুকাইকে নিয়ে, কখনও একা। বাবলির বাজার করার বেজায় নেশা, উমাকেও নিয়ে যায় টেনে টেনে। পুজোর কেনাকাটা করছে মা মেয়ে।

আজও দুপুরে উমা আর বাবলি বেরিয়েছিল। ফিরল দু হাত ভর্তি প্যাকেট নিয়ে। সোফায় বসে ঘাম মুছতে মুছতে উমা বলল,—জানো, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে।

পুচকুনের সঙ্গে ইকড়ি মিকড়ি খেলছিলাম। খেলা থামিয়ে বললাম,—কী হল? মানিব্যাগ খুইয়েছ বুঝি?

—নাগো না। আজ শ্যামবাজার মোড়ে সুধাবাবুর সঙ্গে দেখা। আমি লক্ষ করি নি, উনিই আমায় ডাকলেন।

—সুধাকর?

—হ্যাঁ গো। কী খারাপ হয়ে গেছে চেহারাটা। একদম ঝিরকুট্টে মেরে গেছে।

—অ। ...তা কী বলল?

—তোমার কথা বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন। উমা মুচকি হাসল,—একটা বইও উপহার দিলেন। আমাদের দুজনের নাম লিখে। ওঁর কারেন্ট উপন্যাস।

—ব্যাটা এখনও লিখে চলেছে?

—বলছিলেন না লিখে নাকি ওঁর উপায় নেই। পাবলিশাররা ছাড়ছেই না। হাসি হাসি মুখে উমা প্যাকেট থেকে বইখানা বার করে বাড়িয়ে দিল,—আমি কিন্তু ওঁকে একদিন বাড়িতে আসতে বলেছি। আলুপোস্ত খাওয়াব।

বইটা হাতে নিয়ে দেখছিলাম। মিলনতিথি! সেই বটতলা গোছের নাম। সেই মোটা দাগের মলাট।

উমাকে ফিরিয়ে দিলাম বইটা,—রেখে দাও।

—কোথায়? পুরোন খবরের কাগজের গাদায়?

—নাহ্। কেন যেন ছোট্ট শ্বাস পড়ল একটা। বললাম,—বই-এর আলমারিতেই রাখো।

সহযাত্রী

রাজধানী এক্সপ্রেস ছাড়ল ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায়। কালো কাচের ওপারে দাদা-বউদির অস্পষ্ট হাত নাড়া মিলিয়ে যেতে সিটে থিতু হয়ে বসল রম্যাণি। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল অস্বস্তিটা। যা ভয় পেয়েছিল তাই-ই হল শেষ পর্যন্ত? আপার বার্থই জুটল? এমনিতেই ট্রেনের ওপর বার্থে ওঠার কথা ভাবলে রম্যাণির গায়ে জ্বর আসে, এই নিয়ে কত ঠাট্টা তামাশা করে দ্বৈপায়ন, তায় আবার আজ সঙ্গে ওই দস্যি মেয়ে...। শেষ মুহূর্তে টিকিটের জন্য ট্রাভেল এজেন্টদের পায়ে পড়লে বুঝি এইরকমই হয়।

তিন ছুঁই ছুঁই বিন্তি থম মেরে বসে আছে। দিন পনেরো দাদু-দিম্মা, মামা-মামি হৈহল্লার পর হঠাৎ একা হয়ে একটু যেন মনমরা। রম্যাণি আশপাশে আলগা চোখ বোলাল। টু টায়ার কুপে সামনে একজোড়া বয়স্ক সাহেব-মেম। সাহেবের হাতে ইন্ডিয়া লেখা একটা বই, মেমসাহেবের কোলে ব্র্যাড্‌শ। দুজনেরই চেহারা বেশ লম্বা-চওড়া। স্ক্যানডিনেভিয়ান পর্যটক। পাশেই জানলার ধারে বছর পঁয়তাল্লিশের এক ভদ্রলোক, তারই এই লোয়ার বার্থ।

দেখে মনে হয় লোকটা বাঙালি। চার্টে কী সাম্ গুপ্ত যেন নাম ছিল। গুপ্তাও হতে পারে, অর্থাৎ বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশের। জানলায় চোখ আটকে আছে ভদ্রলোকের। পৃথিবী দর্শন চলছে! আধফেরানো মুখখানা স্পষ্ট নয়, ফ্রেঞ্চকাট দাড়িটি ছাড়া। ভদ্রলোককে একবার লোয়ার বার্থটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে দেখবে রম্যাণি? থাক, তাড়াহুড়োর কী আছে!

ব্যাগ খুলে রম্যাণি চেন-তালা বার করল। দাদা স্টেশনে কিনে দিয়েছে, বড় স্যুটকেসটা বেঁধে রাখার জন্য। আপাতদৃষ্টিতে এই গাড়িতে চোর-ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রব থাকার কথা নয়, তবু সতর্ক থাকা ভাল।

জংলা ছাপ কামিজের ওপর সাদা ওড়নাটা গুছিয়ে নিয়ে সামনে ঝুঁকল রম্যাণি, চেন ঢোকানোর চেষ্টা করছে স্যুটকেসের আংটায়। এক বারে পারল না। দ্বিতীয় বারেও না। তৃতীয় বারে চেন ঢুকলেও হড়হড় করে বেরিয়ে এল। উফ্, বেশ জটিল কাজ তো! অন্য সময়ে দ্বৈপায়ন বা দাদা কেউ সঙ্গে থাকে, রম্যাণিকে এসবে হাত লাগাতে হয় না।

—আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?

রম্যাণি চমকে তাকাল। পাশের ভদ্রলোকের প্রশ্ন, নিখাদ বাংলায়। মনে মনে সামান্য স্বস্তি পেলেও রম্যাণি অপ্রতিভ মুখে বলল,—না না থ্যাংকস্। আমি পারব।

—পারবেন তো বটেই, কিন্তু অনর্থক কষ্ট করবেন কেন?

বলেই প্রায় জোর করে হাত থেকে চেনখানা নিয়ে নিল লোকটা। তালা আটকে টেনে দেখে নিতে নিতে বলল,—কদ্দুর যাচ্ছেন?

—দিল্লি।

—আমিও দিল্লি। লোকটা বিন্তির দিকে চোখের ইশারা করল,—আপনার মেয়ে?

—হ্যাঁ।

—ভেরি সুইট। বিন্তির চুলে আলগা হাত বুলিয়ে দিল লোকটা।

রম্যাণি মৃদু হাসল,—সময় যাক, কেমন সুইট দেখতেই পাবেন। হাড় একদম ভাজা ভাজা করে দেবে।

বিন্তি ভুরু কুঁচকাল। মা'র কমপ্লিমেন্ট বুঝি তার পছন্দ হয়নি। মুখে কিছু না বলে হাই তুলছে ছোট ছোট. ট্রেনের শীতল আমেজে ঘুম এসে গেছে

বোধহয়। মনে মনে শঙ্কিত হল রম্যাণি। মেয়ে যদি এখন চোখ বোজে, রাতে কপালে দুঃখ আছে।

নিচু লয়ে গান শুরু হয়েছে কামরায়। সঙ্গে টুকরো টুকরো ঘোষণা। অ্যাটেন্ডেন্ট মিনারেল ওয়াটারের বোতল দিয়ে গেল। লোকটাই উপযাচক হয়ে বোতল রেখে দিল জায়গায়, রম্যাণিকে উঠতে হল না।

এবার রম্যাণি তেমন খুশি হল না। লোকটার সাহায্য তার প্রয়োজন হয়েছে ঠিকই, তা বলে বেশি গায়েপড়া পুরুষ তার মোটেই পছন্দ নয়। ধন্যবাদ-টন্যবাদের দিকেই গেল না রম্যাণি, মেয়েকে নিয়ে পড়ল,—বাথরুমে যাবে এখন?

বিন্তি দু'দিকে ঘাড় নাড়ল।

—খাবে কিছু। ব্যাগে কলা আছে।

আবারও না।

ব্যাগ থেকে একটা ছবির বই বার করল রম্যাণি,—এটা দ্যাখো। দয়া করে এখন ঘুমিও না।

মেয়ের হাতে বই ধরিয়ে দিয়ে রম্যাণি নিজেই এবার চোখ বুজেছে। দেবব্রত বিশ্বাসের গান বাজছে। আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী...। শুনতে শুনতে রম্যাণির বুক বেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল। বাপের বাড়ি এলে দিনগুলো যে কোথা দিয়ে কেটে যায়! আরও কটা দিন থেকে যেতে পারলে বেশ হত। বাবার প্রেশারটা বেড়েছে, মার কোমরের ব্যথাটাও...। ইন্টারভিউ আসার আর সময় পেল না? অবশ্য চাকরিটা হয়ে গেলে রম্যাণির ভালই হয়। বিন্তি এবার স্কুলে ভর্তি হবে, কাজকর্ম যদি করতে হয় তবে এটাই যথার্থ সময়। নাহলে এরপর রম্যাণি গেঁতো হয়ে যাবে। দ্বৈপায়ন যদিও তড়িঘড়ি ফোন করে ইন্টারভিউ-এর খবরটা জানিয়েছে, তবু চাকরি রম্যাণি না পেলেই দ্বৈপায়ন বেশি খুশি হবে। রম্যাণি জানে। ইল্লি রে, রান্নাবান্না করে, ঘুমিয়ে, আর বিন্তির পিছনে দৌড়ে দৌড়েই বুঝি রম্যাণি জীবনটা শেষ করবে! অত খায় না।

ঝমরঝম শব্দ তুলে শহরতলি পেরিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। গতি বাড়ছে, বাড়ছে। কে একজন টলমল পায়ে প্যাসেজ দিয়ে চলে গেল। প্যাসেজের ওপারের সিটে এক অবাঙালি ভদ্রলোক মাথার অসুখ নিয়ে ভাষণ দিচ্ছে

সঙ্গীকে। হিন্দি আর ইংরিজি মিশিয়ে। লোকটা সম্ভবত ডাক্তার। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ? তা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এত চেঁচায় কেন?

ঈষৎ অপ্রসন্ন মুখে চোখ খুলেই ঝাঁকুনি খেল রম্যাণি। পাশের ভদ্রলোকের দৃষ্টি তারই ওপর স্থির। অদ্ভুত তো! রম্যাণির বিরক্তি আরও বেড়ে গেল। সে এমন কিছু উর্বশী মেনকা রম্ভা নয় যে তার দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকতে হবে। ওফ্, এমন দৃষ্টি গায়ে লাগিয়ে চোখ বুজে থাকাও তো মুশকিল।

টানটান হয়ে বসে রম্যাণি বিন্তির দিকে ফিরল। বই সরিয়ে রেখে দিব্যি স্কার্টের পকেট থেকে চকোলেট বার করে ফেলেছে মেয়ে, একাগ্র মনে মোড়ক খোলায় ব্যস্ত। নির্ঘাৎ প্ল্যাটফর্মে মামার কাছ থেকে বাগিয়েছে।

রম্যাণি খপ করে কেড়ে নিল,—এখন এসব খাবে না।

—এঁকটু খাঁই নাঁ।

—না। কতদিন বলেছি না, চক্‌লেট খেলে দাঁতে পোকা হয়?

লোকটা ফস্ করে কথা ছুঁড়ল,—ভুল ধারণা। আমার এক ডেন্টিস্ট বন্ধু বলে চকোলেট খেলে দাঁতের কিস্যু হয় না। বেশি মিষ্টি খেলে বড়জোর পেটে কৃমি হতে পারে।

চোয়ালে চোয়াল কষল রম্যাণি। লোকটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চকোলেটখানা ব্যাগে পুরে দিল। চাপা স্বরে মেয়েকে বলল,—একদম অবাধ্য হবে না। বসে বসে ছবি দ্যাখো।

মেয়ের গাল ফুলছে,—আমার ছবি দেখতে ভাল্লাগছে না।

—তাহলে চুপ করে বসে থাকো।

বিন্তির মুখ থমথমে। ঘাড় গোঁজ।

লোকটা এক গাল হাসল। হাত বাড়িয়ে কাছে টানল বিন্তিকে,—তোমার মা'টা ভারি দুষ্টু, না?

বিন্তি নিরুত্তর।

—তুমি এ পাশে চলে এসো। জানলার ধারে। বাইরেটা দ্যাখো কী সুন্দর, সবুজ সবুজ!

বিন্তি তড়াক্ করে লাফিয়ে লোকটার কাছে চলে গেল। একদম ওপাশে। রম্যাণি এবার বেশ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। মেয়ে তবু ঢালের মতো এতক্ষণ

মাঝখানে ছিল, চলে যেতেই পাশে লোকটা। যদিও সিট অনেকটাই চওড়া, ঘেঁষাঘেঁষির সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই, তবু এমনটাই মনে হল। মেয়েকে কড়া গলায় ডেকে নেবে এপাশে? থাক, দৃষ্টিকটু দেখাবে।

ট্রেনের লোক চা-বিস্কুট দিয়ে গেল। রম্যাণি চুমুক দিচ্ছে চায়ে। গরম তরলে শরীরের শিথিল ভাব কেটে গেল অনেকটা। লোকটা একটা বিস্কুট তুলে দিয়েছে বিন্তির হাতে, অম্লান বদনে খাচ্ছে মেয়ে। জমিয়ে গল্পও জুড়ে দিয়েছে।

—তোমার নাম কি গো?

—আঙ্কল।

—এমা, আঙ্কল আবার কারুর নাম হয় নাকি?

—হয় না বুঝি?

—মোটেই না। আমি তোমাকে আঙ্কল বলতে পারি, কিন্তু তোমার তো একটা নাম আছে। ভাল নাম? আমার যেমন প্রজ্ঞাপারমিতা।

—ওরে ব্বাস, তোমার এত বড় নাম? আমার নাম খুব ছোট। ঋষি।

বিন্তি হিহি হেসে উঠল। লোকটাকে টপকে চোরা চোখে তাকাচ্ছে রম্যাণির দিকে। সম্ভবত ঋষির সঙ্গে হিসি-টিসির মিল পেয়েছে। রম্যাণি কষ্টে হাসি চাপল, মেয়েকেও চোখ টিপে বারণ করল হাসতে।

বিন্তির দ্বিতীয় দফা প্রশ্নবাণ,—তুমি কি দিল্লিতে তোমার বাবার কাছে যাচ্ছ আঙ্কল?

—না তো। ওখানে তো আমার বাবা থাকে না।

—কোথায় থাকে?

—ওপরে। লোকটা আঙুল তুলল।

ভীষণ অবাক হয়ে ট্রেনের সিলিং-এর দিকে তাকাল বিন্তি,—তোমার বাবা ট্রেনের ছাদে থাকে?

—উঁহু, আরও অনেক ওপরে। আকাশেরও ওপরে।

—ও, মরে গেছে? তাই বলো। পাকা বুড়ির মতো মাথা দোলাল বিন্তি। চোখ ঘুরিয়ে বলল, —তবে বুঝি তুমি আমার মামাদের মতো দিল্লি বেড়াতে যাচ্ছ?

—না না, আমি কাজে যাচ্ছি।

—কী কাজ?

—সে ভারি বিচ্ছিরি কাজ। আমি ফেরিওলার কাজ করি। তেল-সাবান বেচি।

—ওমা, তুমিও ফিরিওলা? আমার বাবাও ফিরিওলা? বাবা অবশ্য তেল-সাবান বেচে না, ওষুধ বেচে।

রম্যাণির চা চলকে গেল। কত বার দ্বৈপায়নকে পই পই করে বলেছে, মেয়ের সামনে নিজেকে ফেরিওলা বোল না? ও যা শুনবে তাই উগরোবে। এখন মানসম্মান কোথায় থাকে!

ঋষি কিন্তু উত্তরটার নির্যাস ধরে ফেলেছে। হাসতে হাসতে বলল,—আপনার হাজব্যান্ড বুঝি মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ?

লোকটার সঙ্গে কথা বলতে না চেয়েও রম্যাণি তড়িঘড়ি বলে উঠল,—না, সেলস ম্যানেজার।

—কোন কোম্পানির?

—রিচার্ড অ্যান্ড ডানকান।

—ও বাবা, সে তো খুব নামী কোম্পানি! সাইডের ছোট্ট টেবিলে চায়ের ফ্লাস্ক রাখল ঋষি,—আপনারা কি বরাবরই দিল্লিতে?

সত্যি-মিথ্যের তোয়াক্কা করল না রম্যাণি, অস্পষ্টভাবে মাথা নেড়ে দিল। দ্বৈপায়ন যে প্রমোশন পেয়ে মাত্র দু'বছর হল এলাহাবাদ থেকে দিল্লি গেছে, এ কথা লোকটাকে কেন বলবে?

রম্যাণি ব্যাগ খুলল। বউদি একট সিনেমার ম্যাগাজিন পুরে দিয়েছিল, সেটাই বার করে উল্টোতে শুরু করেছে। ওই ঋষিকে এড়াতেই। সামনের সাহেবমেম ভারত অনুসন্ধান থামিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কিচমিচ করছে। হঠাৎই সাহেবটা হা হা হেসে উঠল। গোটা কামরায় গমগম করতে লাগল হাসিটা।

ঋষি একটু যেন ঝুঁকে এল। চাপা স্বরে বলল,—কী আনসিভিক দেখেছেন? স্থানকালপাত্র জ্ঞান নেই, হ্যা হ্যা করে হাসি!

রম্যাণি চোয়াল ফাঁক করে হাসল। মনে মনে বলল, তুমিই বা কী এমন সিভিলাইজড? একজন অপরিচিত মহিলার সঙ্গে...?

ঋষি আবার বলল,—ওদের বোঝা উচিত কোপ্যাসেঞ্জারদের অসুবিধে হতে পারে।

—হুম্।

—একটু কড়কে দেব?

কে কাকে কড়কায়! সাহেবটা যদি ঘেঁটি ধরে একেই কোচের বাইরে রেখে আসত! রম্যাণির ঠোঁটের কোণে শ্লেষ ফুটল,—কত ধরনের প্যাসেঞ্জার থাকে। সবই তো সহ্য করতে হয়, না কি?

—বলছেন? ঋষি টেরিয়ে তাকাল রম্যাণির দিকে, —তাহলে থাক। বলতে বলতে রম্যাণির কোলের ওর চোখ,—কী বলছে আপনার ম্যাগাজিন?

অসহ্য! বার্থ নয়, কোচটাই যদি পালটে নেওয়া যায়!

তবু রম্যাণি ভদ্রতাবোধ হারাল না। হেসে বলল,—এই সব গসিপ-টসিপ...যা থাকে।

—পড়তে ভাল লাগে?

—ওই সময় কাটানো।

—সময়! বিড়বিড় করে শব্দটাকে বারকয়েক উচ্চারণ করল ঋষি, হঠাৎই আনমনা সামান্য,—সময় বড় অদ্ভুত জিনিস, তাই না? যখন মনে করবেন সময়টা দ্রুত চলুক, তখন দেখবেন শামুকের মতো যাচ্ছে। আবার যখন সময়টাকে আটকে রাখতে চাইবেন, সে একেবারে জেটপ্লেনের গতিতে দৌড়বে।

কথাটা রম্যাণিকে ছুঁল বটে, তবে বাক্যগুলোকে সে তেমন আমল দিল না। সেল্‌স লাইনের লোকেদের এরকম দার্শনিক বুলি আওড়ানোর অভ্যেস আছে। দ্বৈপায়নের সুবাদে হাড়ে হাড়ে টের পায় সে। যখনই অফিসে টার্গেট নিয়ে দ্বৈপায়নের মাথা খারাপ, তখনই দর্শনশাস্ত্র চাগাড় দিয়ে ওঠে। এ লোকটাও কি এখন তেমনই যাঁতা খাচ্ছে? তবে হ্যাঁ, লোকটা গায়ে পড়া বকবকষষ্ঠী হওয়ার জন্য একটা সুবিধে হয়েছে। লোকটার জন্যই সময় যেন হু হু কাটছে। দেখতে দেখতে বাইরে ঘন আঁধার নেমে গেল!

রাজধানীর কর্মচারীরা যান্ত্রিক হাতে যাত্রীসেবা করে চলেছে। চাদর বালিশ কম্বল এসে যাচ্ছে একের পর এক। কেটলি হাতে ট্যালটেলে টোম্যাটো স্যুপ বিলি হয়ে গেল। সঙ্গে বিস্বাদ ব্রেড স্টিক। রম্যাণি যত্ন করে স্টিকটা পাশে রেখে দিল। দিল্লিতে নেমে গরমে পিঠ চুলকোনোর কাজে লাগবে।

বিন্তি জুলজুল চোখে টোম্যাটো স্যুপের দিকে তাকাচ্ছে। মেয়েকে

স্যুপটুকু খাইয়ে দিল রম্যাণি। ফুঁ দিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করে। ট্রেনের ভেতর শীতলতা এখন বেশ প্রবল, কম্বল এগিয়ে দিল মেয়েকে। বিন্তি কিছুতেই নেবে না কম্বল, গাঁইগুঁই করছে।

ঋষি মৌন ছিল একটুক্ষণ। আবার মুখর,—থাক না। ও যখন নিতে চাইছে না...

—না না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে। জানেন ওর কী সর্দিকাশির ধাত!

—তাই নাকি? টনসিল আছে?

—সব আছে। সেইজন্যই তো কোল্ড ড্রিঙ্কস্ আইসক্রিম সব ওর বন্ধ।

বিন্তি বলে উঠল,—আজ কিন্তু আমি আইসক্রিম খাবই মা।

—আগে কম্বল জড়াও।

সুড়ুৎ করে নিজেকে কম্বলে মুড়ে ফেলল মেয়ে।

রম্যাণি হেসে ফেলল। বিন্তি আজ তেমন বেচালপনা করছে না, এ অতি শুভ লক্ষণ। ভালয় ভালয় রাত্তিরটা কেটে গেলে হয়। নয় দেবেই আজ বিন্তিকে একটা আইসক্রিম। ভাল মেয়ে হয়ে থাকার পুরস্কার। দ্বৈপায়ন তো বলেই ওর সব কিছু খাওয়া পুরোপুরি বন্ধ কোরো না, মেয়ের শরীরস্বাস্থ্য আরও পলকা হয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়াল রম্যাণি, এগোচ্ছে বাথরুমের দিকে। কোচের বেশিরভাগ কুপেরই পর্দা টানা, ছোট্ট ছোট্ট ঘর তৈরি হয়েছে সার সার। ফ্যান চলছে প্যাসেজে, এই ঠাণ্ডাতেও। আলগা হাওয়ায় দুলছে এক-আধটা পর্দা। ভেতরে যাত্রীদের ঝলক দেখা যায়, স্বরূপ চেনা দুষ্কর। বেশির ভাগই ব্যবসায়ী, পরিবারও আছে। সুরার গন্ধও পাওয়া যায় কোথাও কোথাও। উফ্, কেন যে এদের ট্রেনে উঠলেই বোতল খুলতে হয়! খায় তো দ্বৈপায়নও। তবে কক্ষনো ট্রেনে ওই জিনিস সে ছোঁবে না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রম্যাণি বিস্মিত হল। ঋষিবর সিগারেট ফুঁকছেন! রম্যাণির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই অপ্রস্তুত মুখে চোখ সরিয়ে নিল। উঁহু, এ তো ভাল লক্ষণ নয়। লোকটা সারাক্ষণ ধাওয়া করে বেড়াবে নাকি? মতলবটা কী?

ভুরুতে ভাঁজ ফেলে স্বস্থানে ফিরেই রম্যাণির বুক ধড়াস। বিন্তি সিটে নেই! গেল কোথায়? চঞ্চল চোখে স্ক্যানডিনেভিয়ান দম্পতির পানে তাকাল একবার। যদি তার চোখের প্রশ্নচিহ্ন দেখে কিছু বোঝে! সন্ধান দেয়! নাহ্,

তারা নিজেরা গল্পে বিভোর, রম্যাণিকে খেয়ালই করল না। সাইডের অবাঙালি ডাক্তারটি এখনও চ্যালাকে জ্ঞান দিতে ব্যস্ত, তাকে জিজ্ঞাসা করেও কোনও সদুত্তর পাওয়া গেল না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো আশপাশের দু'একটা কুপে উঁকি দিল রম্যাণি। বিন্তি নেই। একে জিজ্ঞাসা করল, ওকে উদ্বেগ জানাল। কারুর কাছেই সন্ধান নেই বিন্তির। দুদ্দাড়িয়ে রম্যাণি ছুটেছে কোচের বাইরে। যেদিকে ঋষি ধূমপান করছে তার উল্টোদিকে। মেয়ে কোথ্‌থাও নেই। দুই কোচের অন্তর্বর্তী পথটুকু দুলছে জোরে জোরে, কাঁপছে ঝনঝন। কাপড়ের পর্দা ছিঁড়ে ভয়ঙ্কর এক হাঁ হয়ে আছে পাশটায়, এদিকে লোকজনও নেই, যদি মেয়ে রেলিং ধরে ধরে ওদিকে যেতে গিয়ে...! হঠাৎই হাঁটুর জোর কমে গেল রম্যাণির। ধড়মড় করে ঢুকেছে পরের কোচে। ভোঁ ভাঁ। আরও কি দূরে যেতে পারে বিন্তি? কোচের দরজা ঠেলে ঠেলে? ওইরকম সব ভয়ানক পথ পেরিয়ে?

রম্যাণির নিশ্বাস আটকে গেল। ধপর ধপর নেহাই পড়ছে হৃৎপিণ্ডে। ছুটতে ছুটতে আবার নিজের কোচে ফিরল। এক মুহূর্ত ন যযৌ ন তস্থৌ। তারপর দৌড়েছে ঋষির কাছে।

—বিন্তি কোথায়? রম্যাণি হাঁপাচ্ছে।

—কেন, সিটে নেই? ট্রেনগাত্রের অ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজল ঋষি।

—না। এদিকে আসেনি?

—না তো। আমি যখন উঠে এলাম, তখনও তো বসে ছিল।

—আশ্চর্য, আপনার ভরসায় মেয়েটাকে ছেড়ে গেলাম, আর আপনি দিব্যি উঠে চলে এলেন? রম্যাণি সংযম ভুলে খিঁচিয়ে উঠল,—অদ্ভুত লোক তো আপনি! ইরেসপনসিবল।

ঋষির মুখ পাংশু হয়ে গেল,—সরি সরি। দেখছি।

—কী দেখবেন? আমার মেয়ের কিছু হয়ে গেলে মেয়ে ফেরত দিতে পারবেন?

পলকের জন্য থমকাল ঋষি। কেমন এক বিচিত্র চোখে তাকাল। পরক্ষণেই দ্রুত ছুটে গেছে ভেতরে। পিছন পিছন দরজা ঠেলে রম্যাণিও।

কুপের সামনে এসেই ঋষি আঙুল তুলল,—ওই তো আপনার মেয়ে।

তাই তো! রম্যাণি হাঁ। ওপরের বার্থে বাবু হয়ে বসে আছে বিন্তি।

ট্রেনের সঙ্গে ছন্দ রেখে নির্বিকার এদিক-ওদিক দুলছে। পাগল পাগল হয়ে রম্যাণি ওপরে তাকাতেই ভুলে গিয়েছিল? পাশের লোকের চোখ এড়িয়ে কখন টঙে চড়ে বসে আছে মেয়ে? কী সাংঘাতিক, রম্যাণি এত বার দৌড়োদৌড়ি করল, এক বারও সাড়া দিল না তো?

রম্যাণি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,—না বলে ওখানে উঠেছিস কেন?

—বারে, এটাইতো আমাদের জায়গা। থার্‌টিএইট্‌।

—ভয়ডর নেই? উঠতে গিয়ে যদি পড়ে যেতিস?

—ইশ্‌, এ তো স্লিপে ওঠার চেয়েও সহজ। তুমি শুধুমুধু ভয় পাও। দেখবে লাফ দিয়ে নামব?

রম্যাণি হাঁ হাঁ করে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই পাকা ফলটির মতো বিন্তিকে পেড়ে নিয়েছে ঋষি। আবার বসিয়ে দিল জানলার ধারে।

উদ্বেগের বেলুন ফেটে যেতেই ভেতর থেকে কুঁকড়ে গেছে রম্যাণি। ছি ছি, অকারণে লোকটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করল। ও কি দ্বৈপায়ন যে ওর ওপর মেজাজ দেখানোর অধিকার আছে রম্যাণির? একটা অচেনা অজানা লোক...বিন্তিকে সে সামলাবেই বা কেন? রম্যাণি কি একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলল না? মুখ ফুটে একটা সরি বলবে?

আড়ষ্ট রম্যাণি ঋষির দিকে তাকাতেই পারল না। গায়ে পড়া ড্যাবড্যাবে চোখ লোকটাও হঠাৎ গম্ভীর, যেন বা সামান্য উদাসীন। বিন্তিই বা লোকটার সঙ্গে কথা বলছে না কেন? তাহলে অন্তত গুমোট ভাবটা কেটে যায়।

রাতের খাবার যথাসময়ে হাজির। বিন্তির খাওয়ার প্রচুর বায়নাক্কা, রুটি ভাত পোলাও কিছুই তার মুখে রোচে না। আজ দিব্যি খানিকটা ফ্রায়েড রাইস মুখে নিল। ফিশফ্রাই খুঁটল একটু, মুরগিও। খেতে খেতেই মেয়ের চোখে নিদ্রাদেবী ভর করেছে। টেনে হিঁচড়ে কোনক্রমে একবার বাথরুম ঘুরিয়ে আনতে না আনতেই একেবারে কাদা। কে বলবে এই মেয়ে একটু আগে আইসক্রিম খাবে বলে শাসাচ্ছিল?

রম্যাণি মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। ঘুমন্ত এই মেয়েকে সে এখন ওপর বার্থে তোলে কী করে? আড়ে একবার দেখল ঋষিকে। চাকুমচুকুম আইসক্রিম খাচ্ছে লোকটা। মরিয়া হয়ে বলে ফেলবে অসুবিধের কথা? নিশ্চয়ই মুখের ওপর না বলে দেবে না?

সুযোগ পেল না রম্যাণি। শূন্য আইসক্রিমের কাপ হাতে ঋষি উঠে উধাও আচমকা। ফিরছেই না, ফিরছেই না, তীর্থের কাক হয়ে বসে আছে রম্যাণি। ভোজনপর্ব শেষ হতেই কুপে কুপে আলো নিবতে শুরু করেছে। বক্তৃতাবাজ ডাক্তার উদ্‌গার তুলতে তুলতে ওপরে উঠে কম্বল মুড়ে শুয়ে পড়ল। সাহেব-মেমও চাদর বিছোচ্ছে। একটা বই হাতে সাহেব উঠে পড়ছে দোতলায়, রিডিং লাইটটা জ্বেলেছে। মেমসাহেব ব্যাগ হাতড়ে ইয়া বড় টিস্যুপেপার বগলে বাথরুমে চলে গেল। মৃদু গুঞ্জন চলছিল কামরায়, কমছে, কমছে।

ঋষি ফিরল। ফিরেই পর্দা টেনে দিল। বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জল খেল খানিকটা। বোতল রেখেও দাঁড়িয়ে আছে।

রম্যাণি ঢোঁক গিলে প্রস্তাব পেশ করার আগেই ঋষি বলে উঠছে,—একটা রিকোয়েস্ট করব ম্যাডাম? যদি কাইণ্ডলি কিছু মনে না করেন...

রম্যাণি চোখ তুলল।

—যদি কাইণ্ডলি আমাকে ওপরের বার্থটা ছেড়ে দ্যান...লোয়ার বার্থে আমার ভাল ঘুম আসে না।

রম্যাণির বুকটা চল্‌কে উঠল। সত্যি কি লোকটার অসুবিধে হয়? নাকি তাকে অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিতেই নিজে থেকে...?

নির্ভার রম্যাণি শুয়ে পড়েছে মেয়ের পাশে। ঋষি নিজের সুটকেস ওপরের বার্থে তুলে পাজামা-টাজামা বার করছে। আবার বাথরুমের দিকটায় চলে গেল। আধো তন্দ্রায় রম্যাণি টের পেল সুরার মৃদু গন্ধ নিয়ে ফিরল লোকটা। এক মুহূর্ত না থেমে উঠে গেল মাথার ওপর। গন্ধটা পাক খেতে লাগল কুপে। চোরা উচ্ছ্বাসের মতো।

বিরক্ত হতে গিয়েও হতে পারল না রম্যাণি। কেমন যেন মনে হল এ এক ধরনের শোধবোধ। ঘুমিয়ে পড়ল ধীরে ধীরে।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল রম্যাণির। ট্রেনের দুলুনিটা নেই, থেমে আছে ট্রেন, বোধহয় সেই জন্যই। মাথা তুলে জানলায় চোখ চালাল রম্যাণি। ঘোর কালো অন্ধকারে গোটা কয়েক কমলা ফুটকি। কোথায় এল? কেন থেমেছে ট্রেন? সিগন্যাল পায়নি? শিথিল মেজাজে জল খেল একটু। রাতে ঘুম ভাঙলে খায়। অভ্যেস। কোচের আলোছায়া মাড়িয়ে বাথরুমে গেল। রাতে ঘুম ভাঙলে

যায়। অভ্যেস। দু'পাশের বিচিত্র নিদ্রাধ্বনির মাঝখান দিয়ে ফিরে আবার এক ঢোক জল খেল। শোওয়ার আগে খায়। অভ্যেস।

তখনই চোখে পড়ল আটত্রিশ নম্বর বার্থের মানুষটাকে। কম্বল গায়ে নেই, সরতে সরতে নেমে গেছে পায়ের কাছে, ঝুলছে। কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে গুটিয়ে-মুটিয়ে শুয়ে আছে লোকটা। পর্দার ফাঁক দিয়ে প্যাসেজের নীল আলোর চিলতে এসে পড়েছে অন্দরে, ঋষির মুখের একাংশ দৃশ্যমান। যেন কোনও ঝানু সেলস্‌ম্যান নয়, যেন নারীসঙ্গ প্রত্যাশী আপাত হ্যাংলা কোনও পুরুষ নয়, এক আত্মীয়পরিজনহীন নিরাশ্রয় নিঃসঙ্গ মানুষ শুয়ে আছে অসহায়। ধুস্‌, লোকটার হয়ত বউ-ছেলেমেয়ে সবই আছে। তবু কেন এমন লাগে? টনটন করে ওঠে রম্যাণির বুকটা?

মোহগ্রস্তের মতো কম্বলটা টানল রম্যাণি, পরিপাটি করে ঢেকে দিল ঋষিকে। ঋষি জানতে পারল না।

দ্বৈপায়ন কি জানবে? কেউ কি জানবে?

নাহ্‌, এই মুহূর্তটা শুধু রম্যাণির একার। একারই।

নক্ষত্রের মন

রোজকার মতই ভোরবেলা রেওয়াজে বসেছিল নীলাদ্রি। ভোর মানে ব্রাহ্মমুহূর্ত নয়, সকাল ছটা সাড়ে ছটা। এর আগে নীলাদ্রির আজকাল ঘুমই ভাঙে না। ভাঙার কথাও নয়। পার্টি ফাংশন আড্ডা এত সব কিছুর পরে বিছানায় যেতে রোজ যার দেড়টা দুটো, কাকভোরে সে উঠবে কেমন করে! এক একদিন তো বাড়ি ফিরতে ফিরতেই রাত ফরসা। রেওয়াজের সময় কমতে কমতে ইদানীং আধ ঘণ্টায় এসে দাঁড়িয়েছে।

তবে হ্যাঁ, ওইটুকু সময় রেওয়াজটা মন দিয়েই করে নীলাদ্রি। যাকে কবির ভাষায় বলে একতানমনা হয়ে। এ সময়ে নীলাদ্রির ঘরের দরজা বন্ধ থাকে, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়, প্রোগ্রাম, স্কোরিং থিয়েটার, ইমপ্রেশারিও, ইনকাম-ট্যাক্স, সাদা টাকা, কালো টাকা, নারীভক্ত কোনও কিছুই তার স্মরণে থাকে না। সত্যি কথা বলতে কী, এ সময়ে আবছা আবছা ঈশ্বরেরও দেখা পায় নীলাদ্রি। ওই সাধনার মধ্যে দিয়েই। এখনও।

আজ তন্ময়তায় চিড় ধরল। বন্ধ দরজায় টোকা দিচ্ছে দীপাবলি। ঘুম

ঘুম আলস্য মাখা গলা,—তোমার টেলিফোন।

তানপুরার তারে শেষ টানটা ককিয়ে উঠল সামান্য। সাড়ে সাতটার আগে নীলাদ্রি কোনও ফোন ধরে না, এ কথা কি জানেনা দীপাবলি!

—কার ফোন?

—বলছে তোমার এক বন্ধু।

—পরে করতে বলে দাও।

—বলেছিলাম। খুব কাকুতি মিনতি করছে। জরুরি দরকার।

তানপুরা শুইয়ে রেখে উঠে এসে দরজা খুলল নীলাদ্রি। বিরক্ত মুখে বলল,—কে, নাম কী?

দীপাবলির সাঁইত্রিশ বছরের কপালে টুকরো ভাঁজ,—নাম বলেনি। পুরনো বন্ধু বলছিল। যত্ত সব!

স্বামীর হাতে কর্ডলেসটা ধরিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে দীপাবলি, তার গমনপথের দিকে নীলাদ্রি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। ঈষৎ ভারী শরীর নিয়ে টলে টলে হাঁটছে দীপাবলি, এখনও ঘুমের খোয়াড়ি কাটে নি, সারাদিন মেজাজ আজ চটকে থাকবে। তাতে অবশ্য নীলাদ্রির কিছু যায় আসে না। ঝি চাকররাই ঝাঁঝ সামলাবে মেমসাহেবের। মুখে এক চিলতে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে কানে কর্ডলেস চাপল,—হ্যালো।

—কে নীলু? আমি মৃন্ময় বলছি রে।

—কে মৃন্ময়?

—চিনতে পারলি না তো? মৃন্ময়...মৃন্ময় দত্ত।

নীলাদ্রি তবু স্মৃতি হাতড়াচ্ছে। সোজাসুজি তুই তোকারি করছে...কে হতে পারে? সহসা এক সুদূর অতীত ঝাপটে এসেছে। কোত্থেকে এক সোনালি শৈশব, রঙিন কৈশোর কাটা ঘুড়ির মতো আছড়ে পড়ল মস্তিষ্কে। এককালের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকে মনে পড়তে এত সময় লাগে!

নীলাদ্রি গলা ওঠাল,—মৃন্ময়? মানে স্কুলের মৃন্ময়?

—হ্যাঁ রে।

—কী আশ্চর্য! অ্যাদ্দিন পরে তুই কোত্থেকে উদয় হলি?

—উদয় অস্ত কিছুই হইনি রে ভাই। এই শহরেই কোনোক্রমে বেঁচেবর্তে আছি। উদয় হয়েছিস তো তুই। গোটা আকাশ একলা ছেয়ে আছিস। চারদিকে

এখন তো শুধু তোরই নাম। গর্বে বুক ফুলে ফুলে ওঠে।

এ ধরনের স্তুতিবাক্য নীলাদ্রির এখন গা সওয়া। সে যে বাংলার সঙ্গীতাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক, তাকে ছাড়া সিনেমা টিভি রেডিও সবই ম্যাড়মেড়ে, এ কথা দিনের মধ্যে শ'দেড়েক বার শুনতে হয় তাকে। তবু পুরনো বন্ধুর মুখের স্বীকৃতির রোমাঞ্চই আলাদা। সবাইকে টেক্কা দিয়ে একা একা যে অনেক ওপরে উঠে যায় সে'ই বুঝি শুধু এই সুখটুকু উপভোগ করতে পারে। সুখ, না অহঙ্কার?

রেওয়াজ শেষ না হওয়ার অপ্রসন্নতা মিলিয়ে গেছে। সযত্নচর্চিত ভারী অথচ লঘু গলায় নীলাদ্রি বলল,—ওই আর কী। করে কম্মে খাচ্ছি। ...তারপর বল্, আমার ফোন নাম্বার পেলি কার কাছ থেকে?

—বিখ্যাত ব্যক্তিদের ফোন নাম্বার জোগাড় করা কি কোনও কঠিন কাজ!

—হুম্। নীলাদ্রি আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল,—তা আছিস কেমন?

—আছি। ওই যে বললাম বেঁচেবর্তে আছি। মৃন্ময়ের স্বর ঈষৎ ম্রিয়মান শোনাল,—যাক গে, যেজন্য তোকে ফোন করা। তোর সঙ্গে আমার একটু জরুরি দরকার আছে রে।

—কী বল্ তো?

—ফোনে বলা যাবে না। আমাকে একটু সময় দিতে পারবি? তুই অবশ্য খুব ব্যস্ত মানুষ...

—দূর দূর, পুরনো বন্ধুদের জন্য আবার সময়ের অভাব হয় নাকি? নীলাদ্রির স্বর উদার পলকে—কবে আসবি বল্?

—আজই যেতে পারলে ভাল হয়। সন্ধের দিকে...তুই ফ্রি আছিস?

নীলাদ্রি অল্প ফাঁপরে পড়ল। সন্ধেবেলা আজ বিশেষ কিছু আছে কি? ডায়েরি না দেখে বলা কঠিন। দুপুরে গোটা তিনেক গানের রেকর্ডিং আছে, আলোচনা আছে। তারপর সুরেন সরকারের সঙ্গে বসার কথা। 'রুদ্রবীণা'-র আবহ সঙ্গীত নিয়ে কিছু আলোচনা আছে। কতক্ষণ লাগবে সেখানে?

একটু ভেবে নিয়ে নীলাদ্রি বলল,—আজ এলে আটটার পর আয়। আমার এই বাড়ির অ্যাড্রেস জানিস?

—টিভি সেন্টারের পাশেই থাকিস না?

—ঠিক পাশে নয়, কাছেই। অ্যাড্রেসটা নোট করে নে। থ্রি বাই সেভেন

গলফ্ গার্ডেন।

—সে তো খুব পশ জায়গা রে। ফ্ল্যাট কিনেছিস?

—না, ছোট একটা গরীবের কুঁড়ে বানিয়েছি। মাথার ওপর একটা ছাদ চাই তো। নইলে বুড়ো বয়সে থাকব কোথায়?

—ভালো ভালো। মৃন্ময়ের স্বর একটুক্ষণ থেমে রইল। তারপর বলল, —আমি তাহলে আটটাতেই যাচ্ছি।

—আয়। কত যুগ তোকে দেখিনি রে শালা, আজ জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।

দূরভাষের রুপোলি দণ্ডটি চেপে নামিয়ে দিল নীলাদ্রি। আর তখনই মনে হল যাহ্, মৃন্ময়ের কথা তো কিছু জিজ্ঞাসা করা হল না। কোথায় থাকে এখন, কী করে, বিয়ে থা করেছে কিনা...! তার কৌতূহলহীনতায় কি আহত হল মৃন্ময়? ধুৎ, সে তো সন্ধেবেলা আসছেই, তখনই...

বারান্দায় বেতের আরাম চেয়ারে এসে বসল নীলাদ্রি। সামনে ছোট্ট সবুজ লন, হেমন্তের শিশির পড়ে ভিজে আছে ঘাস, নবীন সূর্যের আলোয় চিকমিক করছে। এখনও ঠাণ্ডা পড়েনি। সবে একটা নরম আমেজ এসেছে বাতাসে, ভারী মিঠে লাগে সকালটা। মন ফুরফুরে হয়ে যায়।

কাচের টেবিলে গোটা কয়েক খবরের কাগজ। নিতাই সাজিয়ে রেখে গেছে। উল্টোতে ইচ্ছে করছিল না নীলাদ্রির, হালকা চিন্তা পিনপিন করছে মাথায়। কী এমন দরকার পড়ল মৃন্ময়ের, এত বছর পর হঠাৎ যোগাযোগ করল? পাড়ায় বা অফিসে কোনও জলসা টলসা আছে? পরিচয়ের সূত্র ধরে রেট কমাতে বলবে নীলাদ্রিকে? হতে পারে। প্রায়ই তো এ ও সে কোনো আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবকে ধরে...। সব সময়ে না বলাও যায় না, বাজারে চশমখোর বলে বদনাম রটে যাবে। এই তো সেদিন পুরনো পাড়ার সনৎ এসে ধরাতে বিশ হাজারটা বারো হাজার করে দিল নীলাদ্রি, পরে জলসায় গিয়ে শুনল সনৎ নাকি তাকে কনট্র্যাক্ট করার জন্য পনেরো নিয়েছে! এরকমও তো হয়! মৃন্ময় ওরকমই কোনো ধান্দায় আসছে না তো?

যাহ্, যত সব ফালতু ভাবনা। হয়ত এমনিই আসছে মৃন্ময়। হয়ত ছুটছাট সাহায্য চাইতে। হয়ত জরুরি দরকারের বাহানায় অতি সামান্য কথা বলে খ্যাতিমান বন্ধুর গায়ে গা ঘষবে। হয়ত বেখাপ্পা কোনো আবদার জুড়ে

বসবে, মাইরি আমার বউ বিশ্বাসই করতে চায় না তোর মতো একজন সেলিব্রিটি আমার বুজুম ফ্রেন্ড ছিল...একদিন গরীবের বাড়িতে চল্, দুটো ডালভাত খেয়ে আসবি!

এ দাবি বেখাপ্পাই বা হবে কেন। মৃন্ময় একথা বলতেই পারে। মৃন্ময় তো অন্য যেকোনো বন্ধুর মতো নয়, স্কুলে তো তারা সত্যিই অভিন্নহৃদয় ছিল। যোগেন স্যার ঠাট্টা করে বলতেন আইসোটোপ। কত কাল একসঙ্গে এক বেঞ্চে বসেছে তারা। এগারোটা বছর। ইলেভেন লঙ্ ইয়ার্স। ঝটঝট স্মৃতির পাতা উল্টোচ্ছে নীলাদ্রি। স্কুলে প্রথমদিনই টিফিনবাক্স খুলে মৃন্ময় তাকে আধখানা ডিমসেদ্ধ খাইয়েছিল, আর ঠিক তখন থেকেই কীভাবে যেন একটা বন্ধুত্বের সুতোয় বাঁধা পড়ে গেল দুজন। নীলাদ্রির পারিবারিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না, বাবা অ্যাসিস্ট্যান্ট পোস্টমাস্টার, পাঁচ ভাইবোনের সংসারে ক'টা দিনই বা ভাল ভাল টিফিন নিয়ে যাওয়ার বিলাসিতা করতে পারত নীলাদ্রি, ওই মৃন্ময়ই তো...। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় স্কুল থেকে একবার এক্সকারশনে যাওয়া হল। দার্জিলিং। পারহেড দুশো টাকা দিতে হবে। বাড়িতে টাকাটা চাইতে নীলাদ্রির সাহসই হল না, মৃন্ময়ও গেল না দার্জিলিং। হাত উলটে বলল,—ধুস্, পাহাড় আমার ভালই লাগে না। মৃন্ময়রা মাত্র দু ভাই, বাবা ব্যাঙ্কের অফিসার, টাকাটার জন্য মৃন্ময়ের যাওয়া আটকাবে মোটেই এমন নয়। কত ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার সময় জিওমেট্রির থিয়োরেম ভুলে গেছে নীলাদ্রি, একটা ইকুয়েশনও সল্ভ্ করতে পারছে না, ইনভিজিলেটরের চোখ বাঁচিয়ে নিজের খাতা বাড়িয়ে দিল মৃন্ময়। ফিসফিস করে বলে দিচ্ছে ইংলিশ গ্রামারের কারেকশন, অজানা ইডিয়মস্-এর মানে। সব শিক্ষাই দুজনের একসঙ্গে। সুশিক্ষা কুশিক্ষা...স্কুল পালিয়ে ইভনিং ইন প্যারিস দেখতে যাওয়া, চিলেকোঠায় বসে চোখ বড় বড় করে নিষিদ্ধ বই উল্টোনো, মর্নিং-এর মেয়েদের ছুটি হওয়ার পর তপস্বীর মতো মুখ করে কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা...। পাশের বাড়ির চ্যাপ্টা নাক, আরতি না মিনতি কী যেন নাম, তাকে একটা প্রেমপত্র লিখেছিল নীলাদ্রি, পুরোটা মুসাবিদা করে দিয়েছিল মৃন্ময়, কালিদাসের মেঘদূত থেকে উদ্ধৃতি জোগাড় করে। যেকোনো গান একবার শুনেই নিখুঁত তুলে ফেলতে পারত নীলাদ্রি, পাকাপাকি সাধনা শুরু হল তো মৃন্ময়েরই চাপে।

মনে পড়ে যাচ্ছে, সব মনে পড়ে যাচ্ছে। টেবিলে নিতাই চা রেখে গেছে, অন্যমনস্ক মুখে ধূমায়িত কাপে ঠোঁট ছোঁয়াল নীলাদ্রি। কবে থেকে ছাড়াছাড়ি হল? দুজন দু কলেজে যাওয়ার পরেও যোগাযোগ ছিল বহুদিন, তারপর তারপর...? মৃন্ময়ের বাবা রিটায়ারমেন্টের আগে আগে বিরাটিতে বাড়ি করে চলে গেলেন, সেখানেও তো নীলাদ্রি গেছে বার কয়েক। তারপর ক্রমশ...

সুতো বোধহয় এভাবেই ছিঁড়ে যায়। যে যার আপন কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। আবার হয়ত এভাবেই হঠাৎ...

ডাইনিং হলে চেঁচামেচি শুরু করেছে দীপাবলি। উচ্চণ্ড, বেসুরো গলায়। মেয়ের ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়নি বলে বকাবকি করছে গোবিন্দর মাকে। গ্যারেজের শাটার উঠল শব্দ করে, ড্রাইভার এসে গেছে। শোয়ার ঘর থেকে মিহি গলায় দীপাবলিকে ডাকছে তিন্নি, নাকি সুরে কী একটার জন্য যেন বায়না করছে। করপোরেশনের ঝাড়ুদার ময়লা ফেলার জন্য হুইসল দিচ্ছে রাস্তায়। ড্রাইভার স্টার্ট করল গাড়িটা, মেয়ে এবার স্কুলে যাবে।

নীলাদ্রি উঠে পড়ল। দিন শুরু হয়ে গেছে। এখন শুধু কাজ আর কাজ।

বেরনোর আগে নীলাদ্রি ভেবেছিল সকাল সকাল ফিরবে, তালেগোলে সেই দেরি হয়ে গেল। পেটে তরল না পড়লে সুরেন সরকারের মাথা খোলে না, সামনে বোতল খোলা হলে নীলাদ্রিও উদাসীন থাকতে পারে না পুরোপুরি। হুইস্কি সহযোগে আলোচনা প্রায়শই ঘুরপথে চলে যায়। সন্তুর মিঠে শোনাবে, না জলতরঙ্গ, আবেগ কীসে বেশি ফোটে, এসরাজ না তারসানাই— ছোট ছোট তর্ক বাধে হরেকরকম, কেউ কারুর মত থেকে এতটুকু নড়তে চায় না। পরিণামে আজও নটা বেজে গেল।

গাড়িতে উঠেও নীলাদ্রি ছবির সুরটার কথা ভাবছিল, মৃন্ময়ের কথা মনেই ছিল না।

স্মরণে এল বাড়িতে ঢুকে। দেখল, এক বুড়োটে মতো লোক বসে আছে ড্রয়িংরুমের সোফায়, সামনে টিভি চলছে গাঁক গাঁক করে, লোকটার চোখ পর্দায় স্থির।

নীলাদ্রি থ হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ল। এই কি সেই মৃন্ময়? হ্যাঁ, মৃন্ময়ই তো। ওই জ্বলজ্বলে চোখ...এত বদলে গেছে মৃন্ময়! সামনের দিকে চুল উঠে

হা হা করছে টাক, চোয়ালভাঙা ক্ষয়াটে মুখ, একদা শৌখিন মৃন্ময়ের পরনে ঢলঢলে রংজ্বলা প্যান্টশার্ট, ঘাড়টাও কেমন কুঁজোটে মেরে গেছে। মাত্র চুয়াল্লিশেই মৃন্ময়ের এ কী দশা:

গলা ঝেড়ে নিল নীলাদ্রি,—কতক্ষণ এসেছিস?

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল মৃন্ময়। সঙ্কুচিত মুখে বলল,—অনেকক্ষণ। সেই সাড়ে সাতটায়।

—সরি, আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

—না না, ঠিক আছে। তুই কাজের মানুষ...

—হা হা, যা বলেছিস। দম ফেলার ফুরসৎ পাই না। নীলাদ্রি লম্বা সোফায় বিস্তারিত হয়ে বসল। তিন পেগে তার নেশা হয় না, কিন্তু আজ মাথা ঝিমঝিম করছে বেশ। ঝাঁকাল মাথা, একটু ব্যস্তভাবে বলল,—চা টা কিছু খেয়েছিস?

—হ্যাঁ। তোর বউ অনেক কিছু খাইয়েছে। চা চপ মিষ্টি পোট্যাটো চিপস্...রাতে বাড়ি ফিরে আর খেতে হবে না।

—আলাপ হল আমার গিন্নির সঙ্গে?

—হ্যাঁ। কত গল্প হল। তোর মেয়েও এসেছিল...খুব সুইট হয়েছে তোর মেয়েটা। টাটকা ফুলের মতো।

—তুইও নিশ্চয়ই বিয়ে থা করেছিস? ছেলে মেয়ে কটি?

—একটাই। ছেলে।

—কত বড় হল?

—আট বছর। ফোরে উঠবে।

বন্ধুকে আর একবার জরিপ করল নীলাদ্রি,—তোর চেহারা এমন ঝিরকুটে মেরে গেল কেন? অসুখ বিসুখ হয়েছিল নাকি?

একটু বুঝি আড়ষ্ট হয়ে গেল মৃন্ময়। পরক্ষণে হাসল,—তোর চেহারাটা কিন্তু একদম ফিল্ম অ্যাক্টরদের মতো হয়েছে।

—তাই?

—হুঁ। এই সাফারি স্যুটটায় তোকে দারুণ মানিয়েছে। বলতে বলতে ঘরের এদিক ওদিক তাকাল মৃন্ময়,—ঘরটাকেও কী সুন্দর সাজিয়েছিস!

—গিন্নির শখ।

—শুধু কি গিন্নির শখে হয়। তোরও রুচি আছে। ...অনেক বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি তো গেছি, টাকা পয়সা থাকলেও এত সুন্দর করে সাজানোর মন থাকে না।

এ সব প্রশংসা শুনতে ভারী ভালবাসে নীলাদ্রি, কিন্তু এই মুহূর্তে যেন তার তৃপ্তি হচ্ছিল না। মৃন্ময়ের হাবে ভাবে কথায় বার্তায় বড্ড বেশি তেল মারার ভঙ্গি। যৌবনের সেই সতেজ উচ্ছলতার লেশমাত্র নেই, শৈশব কৈশোরের সেই সরল বন্ধুতা নেই...না, এই আধবুড়ো চাটুকারটাকে আর মোটেই মৃন্ময় ভাবতে ইচ্ছে করছে না। নির্ঘাৎ প্রার্থী হয়ে এসেছে। আরও দেরি করে ফেরা উচিত ছিল আজ, এই মৃন্ময়ের সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো ছিল।

নীলাদ্রি তবু প্রশ্ন করে ফেলল,—করছিস কী এখন?

—ব্যবসা। না না, চাকরি। ব্যবসাই বলতে পারিস।

—মানে?

—নামকাওয়াস্তে একটা চাকরি করি এখনও। জুটমিলে। স্টোরে। মিল বছরে ছ মাস বন্ধ থাকে। একটা অর্ডার সাপ্লাই-এর কারবারও তাই ধরেছি এখন। বলেই মলিন হাসল মৃন্ময়—এখন মিলে লক্ আউট চলছে।

আর কোনও সংশয় নেই, সাহায্যের জন্যই এসেছে।

নীলাদ্রি বিস্বাদ গলায় বলল,—কী জরুরি দরকার বলছিলি?

—হ্যাঁ, বলি। মৃন্ময় ঢোঁক গিলে বলল,—তুই সারাদিন খেটেখুটে এলি, একটু ভেতরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আয়...আমি আছি, বসছি।

—না বল্, আমি ঠিক আছি।

মৃন্ময় একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,—খুবই বিপদে পড়ে তোর কাছে এসেছি রে। আমার ছেলেটার হঠাৎ হার্টে একটা ডিজিজ ধরা পড়েছে। ইমিডিয়েটলি অপারেশন করাতে হবে। ওই বাইপাসের মতন...ছোটবেলা থেকেই নিশ্বাসে খুব কষ্ট হত, সর্দিকাশি শ্লেষ্মার ধাত ভেবে ঠিক মতো চিকিৎসা করা হয়নি...হঠাৎ ধরা পড়ে গেল...অনেক টাকার ধাক্কা রে।

—কত? প্রশ্ন না করতে চেয়েও করে ফেলল নীলাদ্রি।

—লাখ দেড়েক তো বটেই। এদিক ওদিক করে, বউ-এর গয়না বেচে পঞ্চাশ ষাট মতো জোগাড় করেছি।

—এত লাগবে কেন?

—ডাক্তার তো সেরকমই এস্টিমেট দিয়েছে। ডাক্তারের ফি, নার্সিংহোমে মাসখানেক থাকার চার্জ, ওষুধ...

—হসপিটালে করা না। অনেক কমে হয়ে যাবে।

—হসপিটালই চেয়েছিলাম রে। ডাক্তার বলছে জটিল অপারেশন, হসপিটালের যন্ত্রপাতি যথেষ্ট মডার্ন নয়, রিস্‌ক হয়ে যাবে।

—হুম্।

—জেনেশুনে ওখানে ছেলেকে কী করে দিই বল্?

কেমন যেন অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে মৃন্ময়। যেন বলতে চাইছে, তোর মেয়ের অমন কিছু হলে তুই কি হসপিটালে...!

গম্ভীরস্বরে নীলাদ্রি বলল,—তো?

—তুই আমাকে কিছু ধার দে। হাজার পঞ্চাশেক।

নীলাদ্রি আঁতকে উঠল,—পঞ্চাশ হাজার!

—হ্যাঁ। মাস ছয়েকের মধ্যে আমি তোকে শোধ করে দেব।

হাহ্, রয়েছে ভিখিরির দশায়, দেবে ছ মাসে শোধ! কেন যে নীলাদ্রি উচ্ছ্বসিত হয়ে আজই আসতে বলে দিল। সাধে কি দীপাবলি বলে তুমি একটা সেন্টিমেন্টাল ফুল!

মৃন্ময় বুঝি বন্ধুর মনের কথাটা পড়ে ফেলেছে। মরিয়া স্বরে বলল,—বিশ্বাস কর, আমি ঠিক শোধ করে দেব। ইউনিয়নের সঙ্গে মিল মালিকের কথা চলছে। এবার খুললেই অনেকে ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিতে পারবে। ...থোক টাকা পাব হাতে, তার থেকে তোকে আগে...

—যাহ্, তা হয় নাকি? তারপর তুই খাবি কী?

—ব্যবসাটা ধরছে আস্তে আস্তে, তাতেই চালিয়ে নেব। বলতে বলতে নিজের জায়গা ছেড়ে বন্ধুর পাশে এসে ধপ করে বসে পড়ল মৃন্ময়,—তুই আমায় বিশ্বাস করছিস না নীলাদ্রি? আমাকে তো তুই অনেক কাছ থেকে দেখেছিস, বল্ আমি কি কারুর টাকা গাপ্ করতে পারি? মনে আছে, রজতেন্দ্রর কাছ থেকে আমি একশো টাকা ধার নিয়েছিলাম, রজতেন্দ্র ভুলেই গেছিল, হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরোনোর দিন আমিই মনে করে...

নীলাদ্রি ভেতর থেকে একটু দুলে গেল। মানুষের বিপদ আপদে সে যে সাহায্য করে না এমন তো নয়। এই তো পুজোর আগেই বিগত দিনের

প্রখ্যাত এক গায়িকার দুর্দশার কথা কাগজে পড়ে দশহাজার একটাকা দিয়ে এল। একটা গোল্ডেন ডিস্‌কের রয়্যালটির টাকা পুরোটাই দান করে এসেছে থ্যালাসেমিয়ার তহবিলে। তবে হ্যাঁ, তাতে প্রেস কভারেজ ভালো ছিল, শ্রোতাদের কাছে তার সম্পর্কে এক ভিন্ন ইমেজ গড়ে উঠেছে।

মৃন্ময়ের কাছে তার কি কোন ইমেজ তৈরি করার আছে?

স্কুলে মৃন্ময় তার জন্য অনেক করেছে, নীলাদ্রি কি ঋণ শোধ করে দেবে? কত টাকা দেওয়া যায়? পঞ্চাশ হাজার মৃন্ময় জীবনে কোনদিন শোধ করতে পারবে না। এমন একটা অঙ্ক দেওয়া উচিত যা গেলেও গায়ে লাগে না, মনেও একটা তৃপ্তি আসে, সাফ হয়ে যায় বিবেকটাও।

নীলাদ্রি মুখে দুঃখী দুঃখী ভাব ফোটাল,—পঞ্চাশ হাজার তো নেই রে। বাড়িটা করতে প্রচুর খরচা হয়ে গেছে...তা ছাড়া বুঝিসই তো, আমাদের রোজগার অর্ধেক ইনকাম ট্যাক্সই খেয়ে নেয়। কুড়িয়ে বাড়িয়ে এখন সাত আট হাজার মতো হতে পারে।

—না না, ঘরের টাকা তোকে দিতে হবে না। যদি বলিস কাল আসব...

—কাল কোত্থেকে পাব? ব্যাঙ্ক থেকে? নীলাদ্রি কাষ্ঠ হাসি হাসল। মনে মনে বলে টাকা কি খোলামকুচি নাকি যে চাইলেই ঝড়াকসে পঞ্চাশ হাজার বেরিয়ে যাবে! কালোই হোক, সাদাই হোক, প্রতিটি টাকা গলা চিরে, ফুসফুস নিংড়ে উপার্জন করতে হয়। ও টাকা নিছক আবেগে ভাসিয়ে দেওয়া যায় না। মুখে বলল,—একটা নতুন গাড়ি বুক করে ফেলেছি রে। দিন পনেরোর মধ্যে ডেলিভারি দেবে। জানিসই তো ওদের সব টাকা হোয়াইটে দিতে হয়।

কথাটা মৃন্ময়ের কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে,

—তাহলে কী হবে?

—শোন্, চেক ক্যাশ মিলিয়ে তোকে দশ হাজার দিয়ে দিচ্ছি। ফেরত দেওয়া নিয়ে ভাবিস না। পারলে দিস, না পারলে...আফটার অল তোর ছেলে তো আমারও ছেলে, কি বল্?

মৃন্ময়কে ভীষণ বিচলিত দেখাচ্ছে। উঠে দাঁড়াল একবার, বসে পড়ল। কপাল টিপে ধরেছে,—খুব আশা নিয়ে তোর কাছে এসেছিলাম। তুই আমাদের মধ্যে সব থেকে কৃতী, এত শাইন করেছিস্...

—বললাম তো, আমি দশই পারব। নীলাদ্রি শক্ত গলায় বলল,—বাকিটা অন্য কোথাও থেকে জোগাড় করে নে। ...বোস্, আমি আসছি।

টাকার বান্ডিল আর চেক বই নিয়ে ড্রয়িংরুমে ফিরে নীলাদ্রি অবাক হয়ে গেল। মৃন্ময় নেই।

দ্রুত পায়ে বারান্দায় এল নীলাদ্রি। গেট খোলা, চলে গেছে মৃন্ময়।

হঠাৎই ভীষণ বিষণ্ণ বোধ করল নীলাদ্রি। তার শেষের কথাগুলো কি বেশি রূঢ় হয়ে গেছে? সত্যিই হয়তো মৃন্ময় বড় বিপদে পড়ে এসেছিল, সত্যিই হয়তো ছেলেটা বাঁচবে না। কাল একবার মৃন্ময়ের বাড়ি যাবে? বিরাটিতে। অপারেশনের টাকাটা দিয়ে আসবে?

ওহো, কাল হবে না। কাল ঠাসা প্রোগ্রাম। পরশু গেলে হয়। না, পরশু তো ভোরেই বর্ধমান যেতে হবে। তার পরদিন...? তার পরদিন...?

কোনো দিনই কি আর যেতে পারবে নীলাদ্রি?

আকাশের নক্ষত্র কি আর মাটিতে নেমে আসতে পারে? ছোটবেলার রূপকথার মতো?

বুকটা তবু খচখচ করছে। মৃন্ময়টা এক সময়ে নিজের টিফিন খাইয়ে দিত। মৃন্ময়টা...মৃন্ময়টা...।

ভাবতে ভাবতে নীলাদ্রি জামাকাপড় বদলাল, মুখ হাত পা ধুল, রাতের খাওয়া সাঙ্গ করে এক সময়ে শুতে এল বিছানায়। পাশে এখন পাতলা নাইটিতে ঘুমন্ত দীপাবলি, খোলা দরজার ওপারে পাশের ঘরে রাশি রাশি রঙিন পোস্টারের মাঝে নিদ্রায় ডুবে আছে নীলাদ্রির মেয়েও, আরও একটু দূরে লনের মখমল ছুঁয়ে হেমন্তের বাতাস, সেই বাতাসে দোল খাচ্ছে রঙিন স্বপ্নের মতো নীলাদ্রির ঘরের নেটের পর্দারা...

এত প্রাচুর্য ছড়িয়ে আছে চারিদিকে! বড় সুখ, বড় সুখ।

নরম শয্যায় হারিয়ে যেতে যেতে নীলাদ্রি বিড়বিড় করে বলল,—তোর এত দেমাক কীসের রে মৃন্ময়, অ্যাঁ? এসেছিলি তো ভিক্ষে চাইতে। আমি কেন যাব, দরকার হলে তুই-ই আবার আসবি। বুঝলি শালা?

বেড সুইচ টিপে আলো নিবিয়ে দিল নীলাদ্রি। ভোরের নস্টালজিয়া রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ফেরা

কাউন্টারে বসে ঘাড় গুঁজে কাজ করছিল কমলেন্দু। রুটিন জব, ডিপোজিট স্লিপ নিয়ে লেজারের পাতায় পাতায় পোস্টিং করে যাওয়া। তাদের ব্যাংকের এই ব্রাঞ্চটা ছোট, কিন্তু ব্যস্ত খুব। দিনের কাজ দিনে না শেষ করলে স্লিপের পাহাড় জমে যায়।

—কমলেন্দুবাবু, আপনার ফোন। অ্যাকাউন্ট্যান্ট হীরেন রায়ের গলা।

কমলেন্দু ঈষৎ অবাক হল। এ সময়ে কে ফোন করছে! জয়ন্ত? দেবু? বাড়ির ফোনটা তো যোলদিন ধরে মরা, জ্যান্ত হল! খবর দিচ্ছে মাধবী? বড় ভায়রা হলেও হতে পারে। পনেরোই আগস্ট তিন দিনের জন্য চাঁদিপুর যাবে বলে উঠে পড়ে লেগেছে, টিকিট ফিকিট করে ফেলল?

উঠে এসে রিসিভার ধরল কমলেন্দু,—হ্যালো!

—কে কমলেন্দু?

—স্পিকিং।

ও প্রান্তর স্বর একটু থেমে গেল।

সামান্য নাড়া খেয়ে গেল কমলেন্দু,—কি হয়েছে পিসির?

—সেরিব্রাল অ্যাটাক। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর। অবস্থা খুব সিরিয়াস। সেন্স তো ছিলই না, সকালে ঘণ্টা খানেকের জন্য একটু জ্ঞান মতো ফিরেছিল। খুব বিল্টু বিল্টু করছিল তখন...তোকে বার বার দেখতে চাইছিল...

বিশ্রী ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে টেলিফোনে, কিছুই আর প্রায় শোনা যায় না। কমলেন্দু গলা ওঠাল,—হ্যালো রাঙাদা, একটু জোরে বলো। পিসি এখন কেমন আছে?

খুব আবছা স্বর শোনা যাচ্ছে। একটিও শব্দ বোঝা যায় না। ক্রেডল-টাকে জোরে জোরে খটখট করল কমলেন্দু, তবুও না। খুট করে লাইনটা কেটে গেল। ঝিঁঝির ডাক।

কমলেন্দু কয়েক পল হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে। কোথ্থেকে ফোন করছিল রাঙাদা? জ্যোতিপুর পোস্ট অফিস থেকে? নাকি সহদেব বেরাদের বাড়ি থেকে? আবার কি এখুনি করবে?

হীরেন রায় চোখ কুঁচকে দেখেছে,—কি খবর কমলেন্দুবাবু? খারাপ কিছু? কে ফোন করছিলেন?

কমলেন্দু হতভম্ব মুখে তাকাল,—আমার দাদা। পিসতুতো দাদা। বলছিল পিসির অবস্থা নাকি...লাইনটা কেটে গেল।

—পিসি..মানে আপনার আপন পিসি?

মুহূর্তের জন্য দ্বিধায় পড়ল কমলেন্দু। বাবার জাড়তুতো বোনকে কি আপন পিসি বলা যায়? আবার সুধাপিসিকে, আপন ছাড়া দূরের কেউ বলেও কি ভাবা সম্ভব? কমলেন্দু আলগা ঘাড় নাড়ল,—হ্যাঁ, আপন পিসিই...প্রায়। দেশে থাকেন।

—দেশ? তার মানে...

—জ্যোতিপুর। ঘাটাল সাবডিভিশান।

ফোনটা আর আসছে না। লাইন পাচ্ছে না বোধহয়। পায়ে পায়ে কাউন্টারে ফিরে এল কমলেন্দু। থুম হয়ে বসে আছে চেয়ারে। কি করবে এখন? যাবে নাকি জ্যোতিপুর? এখনই রওনা দিলে সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। কি আর এমন দূর! হাওড়া থেকে বাগনান সওয়া ঘণ্টা মতো, সেখান থেকে বাস ভুটভুটি ভ্যানরিক্সা মিলিয়ে বড়জোর আরও

ঘণ্টা দেড়েক। আজ গিয়ে সহজেই কাল সকালে চলে আসতে পারবে।

ধুস্, হুট বললেই যাওয়া যায় নাকি! উনচল্লিশ বছর বয়সে এই ছেলেমানুষি মানায় না। মাধবীর সঙ্গে পরামর্শ করা হল না, রিন্টি বুবাই জানল না,...। কালসকালে গেলেও তো হয়। মাধবীরাও যদি চায় সঙ্গে যাবে।

কিন্তু রাঙাদা যা বলল তাতে মনে হয় পিসির এখন তখন দশা। কাল অবধি কি থাকবে পিসি? যদি না থাকে?

প্রায় সাড়ে তিন বছর গ্রামে যায় নি কমলেন্দু। যতদিন বাবা বেঁচে ছিল, ততদিন পর্যন্ত নাড়ির টান ছিল একটা। কিম্বা হয়তো ঠিক নাড়ির টানও নয়, কর্তব্যের টান। বাবা একা একা গ্রামের বাড়িতে পড়ে আছে, পিসি পিসতুতো দাদারা দেখাশুনা করে...একটা অপরাধবোধও বুঝি খোঁচা মারত বুকে। তিনি গেলেন দায়ও সব চুকে বুকে খতম। জমিজমা বাড়িঘর বিক্রিবাটা সারা, রাঙাদা মতিদারাই কিনে নিয়েছে, কমলেন্দুরা তিন ভাই বোন ভাগ করে নিয়েছে টাকাকড়ি। জ্যোতিপুরের জন্য পিছুটান শেষ। পিসির চিঠি আসে মাঝে মাঝে। অনন্ত অভিমানে মাখা কাঁপা কাঁপা অক্ষর। তোকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে রে বিল্টু। কবে মরে যাব, একবার আয় না। বুড়ি পিসিটাকে কি ভুলেই গেলি!

হয় না যাওয়া। সংসার। কাজ। অফিস। ছেলেমেয়ের পড়াশুনো। দেশ গাঁয়ে পা মাড়াতে গায়ে জ্বর আসে বাড়ির লোকের। নিজেরই সৃষ্টি করা জালে নিজেই এমনভাবে জড়িয়ে থাকে মানুষ!

বুকের ভেতরই যেন একটা কুটকুট কামড়াচ্ছে। কী যে হচ্ছে! রাঙাদার শেষ কথাগুলো? ...তোকে বার বার দেখতে চাইছিল...!

তিনটে দশ। এখনও সময় আছে, কমলেন্দু ঝটিতি ডিপোজিট স্লিপগুলো এনট্রি করে ফেলল খাতায়। বড্ড গুমোট আজ, বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে এল একটু। অ্যাকাউন্ট্যান্টের টেবিল থেকে রিঙ্ করল সামনের ফ্ল্যাটে।

—হ্যালো বউদি, একটু মাধবীকে ডেকে দেবেন?

—ধরুন।

ধরে আছে ফোন। নিঃসীম নৈঃশব্দ্য। কমলেন্দু কথা গোছাচ্ছিল। কি ভাবে বলবে মাধবীকে? অফিস থেকে সোজা চলে যাওয়া কি বাঁকা চোখে দেখবে মাধবী? মোটেই না। মাধবী অত অবুঝ নয়। সে জানে সুধাপিসি

কমলেন্দুর কতটা আপন। কমলেন্দুর জন্মের পর পরই মার বিকোলাই হয়েছিল, এই সুধাপিসি বুকের দুধ খাইয়েছিল কমলেন্দুকে, এ গল্প মাধবীর বহু বার শোনা। তার শেষ সময়ে কমলেন্দু ছুটে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক।

মহিলা ফিরে এসেছে,—মাধবী তো নেই। বুবাইকে স্কুল থেকে নিয়ে এখনও ফেরে নি।

সর্বনাশ, কি করে এখন! বাড়ি ঘুরে যাবে? ভবানীপুর থেকে গড়িয়া মিনিট চল্লিশেক লাগে, পাঁচটার আগে বাড়ি থেকে রওনা হওয়া যাবে কি? দেরি হয়ে যাবে না?

কমলেন্দু মরিয়া স্বরে বলল,—কাইন্ডলি একটা ইনফরমেশান দিয়ে দিতে পারবেন? ...আমি এক্ষুনি একবার দেশে চলে যাচ্ছি। মানে যেতে হচ্ছে। মাধবীকে বলবেন জ্যোতিপুরে সুধাপিসির কণ্ডিশান খুব খারাপ...অফিসে খবর এসেছিল... কাল ফিরব।

—ও। ..আচ্ছা। ...হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলে দেব।

—প্লিজ।

টেলিফোন রাখল কমলেন্দু। হীরেন রায়কে বলে বেরিয়ে পড়ল অফিস থেকে। বাইরে শ্রাবণের ধূসর আকাশ, সেদিকে দেখল একটুক্ষণ। পার্স বার করে টাকা গুনল। দেড়শো মত আছে, অসুবিধে হবে না। ট্যাক্সি নিলে হয়। একটু সময় বাঁচে। ভাবতে ভাবতেই একটা চলমান ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়েছে কমলেন্দু,—হাওড়া স্টেশন।

মন্থর হয়েও গতি বাড়াল ড্রাইভার। থামল না।

পর পর তিনটে ট্যাক্সি চলে গেল। কেউ এখন হাওড়া স্টেশন যাবে না। বিরক্ত কমলেন্দু অবশেষে মিনিবাসে। চলছে বাস। ভিড় বাস। হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছে কমলেন্দু। পার্ক স্ট্রিট মোড়ে এসে বাস থেমেছে। থেমেই আছে। সামনে মিছিল। কি নিয়ে মিছিল ঝুঁকে দেখার চেষ্টা করল কমলেন্দু, বুঝতে পারল না। হুঁশিয়ার, চাই, ভেঙে দেব, গুঁড়িয়ে দেব, ঠিকরে ঠিকরে আসছে। পাঁচ মিনিট...দশ মিনিট। কমলেন্দু অধীর। ঘড়ি দেখছে। বিরক্ত হয়ে নেমে পড়তে যাচ্ছিল, ছেড়েছে বাস। শামুকের গতিতে এগোচ্ছে।

হাওড়া স্টেশন পৌঁছতে পাঁচটা বেজে গেল। বাগনানের টিকিট কাটার সময়ে মন খচ খচ করছিল কমলেন্দুর। মাধবীর সঙ্গে একবার মুখোমুখি কথা বলে আসতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। বিনা নোটিশে চলে আসার

অস্বস্তিটা এখন এঁটুলির মতো লেগে থাকবে গায়ে। ফিরে যাবে? কাল ভোরে না হয়...।

স্টেশনে বিজবিজে ভিড়। হকার কুলি ভিখিরি বাড়িমুখো মানুষ। কাজের লোক, অকাজের লোক। এক সময়ে কমলেন্দুও এই লাইনের ডেলি প্যাসেঞ্জার ছিল, পাক্কা তিন বছর জ্যোতিপুর থেকে যাতায়াত করেছে কলকাতায়। দীর্ঘ অনভ্যাস হেতু এ সময়ের স্টেশনকে এখন জঙ্গল বলে ভ্রম হয়। রহস্যময়। শ্বাপদসংকুল। তারই মধ্যে শুনতে পেল মেচেদা লোকাল হুইসিল দিচ্ছে। দৌড়োল কমলেন্দু, আটকে আটকে যাচ্ছে যানজটে। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে মিলিয়ে গেল ট্রেন।

সময় চলে যাচ্ছে। বিভ্রান্ত কমলেন্দু এখন ইলেকট্রনিক বোর্ডের সামনে। পরের ট্রেন খড়্গপুর লোকাল, ছাড়তে আরও সতেরো মিনিট। অসংখ্য ধ্বনি তালগোল পাকিয়ে বিচিত্র এক গর্জন তুলছে চারদিকে, কান মাথা ঝিম ঝিম করে। স্টল থেকে সিগারেট কিনে ধরাল কমলেন্দু। অনেকক্ষণ পর মস্তিষ্কে ছড়িয়ে গেল ধোঁয়া, ফুসফুসে পাক খাচ্ছে। রাঙাদারা কি দাদা দিদিকেও খবর দিয়েছে? দাদা মেদিনীপুরে, দিদি আরামবাগ, তারা কি আসবে? সেই বা এমন তালবেতাল ছুটে যাচ্ছে কেন? হ্যাঁ, একথা ঠিক দাদা দিদির চেয়ে তার সঙ্গে পিসির সম্পর্ক অনেক গভীর ছিল। হয়তো পিসির বুকের দুধ খেয়ে সে বেঁচেছিল বলেই। কিন্তু সেটুকুই কি শুধু কারণ! পিসির আকুল চিঠির উত্তরে প্রতিবারই লিখেছে, সময় পেলেই যাব। আজ অবশেষে সেই সময় এল! না গেলে কি হয়? পিসি হয়তো এখন বোধবুদ্ধির বাইরে, তাকে চিনতেও পারবে না, তবে কেন সে...!

চিন্তা এগোতে পারল না। সম্ভাব্য খড়্গপুর লোকাল প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। পিলপিল মানুষ ধেয়ে যাচ্ছে। আছড়ে পড়ছে কামরায়, সঙ্গে কমলেন্দুও। গুঁতোগুতিও করে অতি কষ্টে বসার জায়গাও করে নিল একটা। জানলার ধারের দ্বিতীয় সিট, হাওয়া আসছে না, বসে ঘামছে দরদর, তবু নিশ্চিন্দি, আর বড় জোর ঘণ্টা আড়াই। আটটা নাগাদ পৌঁছে যাবে।

গাড়ি দুলে উঠল। ঝমরঝমর শব্দ তুলে পেরিয়ে যাচ্ছে শহরতলি, অতিকায় অজগরের মতো। মৌরিগ্রাম পার হতে একটু বুঝি বাতাস এল কামরায়, জুড়িয়ে এল শরীর।

বিকেল ফুরিয়ে আসছে। সূর্যহীন আকাশে মলিন আলো। বাড়ি ঘর কমে

আসছে ক্রমশ, দু ধারে অনেক সবুজ এখন। ধানক্ষেত। গাছপালা। সবই যেন কেমন ছায়ামাখা, ম্রিয়মাণ। তবু ভিড় থসথস বাতাসহীন কামরা থেকে বাইরে তাকালে ভারী আরাম হয় চোখের। আন্দুল পেরিয়ে গেল, সাঁকরাইল আসছে। এর পর আবাদা নলপুর বাউরিয়া চেঙ্গাইল...। পর পর সব স্টেশনের নাম মুখস্থ কমলেন্দুর। শুধু ডেলি প্যাসেঞ্জারি করত বলে নয়, এই সাড়ে তিন বছরেও এ পথ দিয়ে কি কম বার গেছে! দু বার পুরী, একবার ম্যাড্রাস, একবার বম্বে গোয়া, নয় নয় করে বার আষ্টেক শালীর বাড়ি জামসেদপুর। গত শীতেই তো বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘাটশিলা গালুডি বেড়িয়ে এল।

মনে পড়তেই ছোট্ট এক পিন ফুটেছে বুকে। বাগনান মাড়িয়ে এত বার গেল এল, একবারও তো পিসিকে দেখতে যাওয়ার কথা মনে আসে নি কমলেন্দুর! ঘাটশিলা থেকে ফেরার সময়ে বম্বে এক্সপ্রেস কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল বাগনানে, রিন্টি বুবাই গরম সিঙাড়া খেল, কি একটা ম্যাগাজিন কিনল মাধবী, জলের বোতল ভরতে নীচে নামল কমলেন্দু, তখনও তো কই পিসির কথা স্মরণে আসে নি! তখনও রিন্টি বুবাই-এর স্কুল খুলতে দু দিন বাকি, একবার জ্যোতিপুর ঘুরে যাওয়াই যেত। সময় না পাওয়াটা নেহাতই আত্মপ্রবঞ্চনা। আলস্য। ঔদাসিন্য।

কাকে মিথ্যে সময়ের অজুহাত দেখাস্ কমলেন্দু?

বাইরে আঁধার চাদর বিছোচ্ছে। বুকের ভেতরটা মেঘলা হয়ে আসছিল কমলেন্দুর। কামরার কোলাহল আর ছুঁতে পারছে না তাকে, স্পষ্ট টের পাচ্ছে একটা স্যাঁতসেঁতে হাওয়া দখল নিচ্ছে বুকটার। চোখ বুজে পিসির মুখ মনে করার চেষ্টা করল। সাড়ে তিন বছর আগের মুখ। রোগাটে লম্বা চেহারা, একটু বুঝি পাকানো। গালদুটো কি একটু ভাঙা ভাঙা ছিল পিসির? গালে আঁকিবুকি? মনে পড়ছে না। অন্য একটা মুখ চলে আসছে চোখের পর্দায়। চৌষট্টি বছরের পিসি নয়, বত্রিশ বছরের পিসি, চৌত্রিশ বছরের পিসি। বেতসলতার মতো ছিপছিপে শরীর, একটু চাপা গায়ের রঙ, মাথাভরা এক ঢাল চুল, বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ। নাকে সাদা পাথরের নাকছাবি পরত পিসি, আলো পড়লে ঝিক মিক রঙ ছড়াত। ভারী মিষ্টি একটা গন্ধও লেগে থাকত পিসির গায়ে। ফুলেল তেলেরও নয়, স্নো ক্রিম পাউডারেরও নয়, সুগন্ধী সাবানেরও নয়, সে এক অন্য সুবাস। পিসির বুকে মুখ রাখলে গন্ধটা কমলেন্দুর ভেতর অবধি ছড়িয়ে যেত। জ্যোতিপুরেই বিয়ে হয়েছিল পিসির,

এ পাড়া ও পাড়া। ছোট্ট বিল্টু যে তখনও কমলেন্দু হয়ে ওঠে নি, সকাল থেকে পড়ে আছে পিসির বাড়ি। পিসির কাছে খাওয়া, পিসির কাছে স্নান, পিসির কাছে ঘুম। রাতেও কতদিন বাড়ি ফেরে নি। মা বলত, কদিন দুধ দিয়ে সুধা আমার ছেলেটাকে গুণ করে ফেলেছে। পিসির মেয়ে বিন্তি, যে কিনা তার থেকে সাকুল্যে তিন দিনের বড়। হিংসেয় মটমট করত ছোটবেলায়। অ্যাই, তুই রোজ রোজ আমার মার পাশে শুবি কেন রে! ক্লাস ফাইভে উঠে হোস্টেলে চলে গেল কমলেন্দু। ছুটি পড়ার কদিন আগে থেকেই কমলেন্দু আনচান, এবার না জানি তার জন্য কি কি বানিয়ে রেখেছে পিসি! তিলের নাড়ু, ক্ষীর নারকেলের সন্দেশ, নিমকি, গজা...! বিল্টু খেতে ভালবাসে!

বাবার শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার পর মাধবী রিন্টি বুবাইকে নিয়ে যখন রওনা দিচ্ছে কমলেন্দু, তখনও না হাতে এক কৌটো নারকেল নাড়ু ধরিয়ে দিল পিসি! ধবধবে সাদা থানের আঁচলে চোখ মুছছে। মাঝে মাঝে আসবি তো বিল্টু!

কুলগাছিয়া ঢোকার মুখে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেছে। পাওয়ার নেই। ঝুম অন্ধকারে বসে আছে কমলেন্দু। ভিড়ের মাঝে একা হয়ে। সহসা পিসির জন্য তীব্র এক টান অনুভব করছিল সে। প্রতিটি সেকেন্ডকে এক একটা ঘণ্টার মতো দীর্ঘ মনে হচ্ছে। আশপাশের লোক অধৈর্য হয়ে খিস্তি খেউড় করছে রেল কোম্পানীকে। অসহিষ্ণু কমলেন্দুও ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। ভুল হয়ে গেছে। এতদিনেও একবারও পিসির কাছে না যাওয়াটা অন্যায়। পৌঁছতে পারবে তো ঠিক সময়ে!

ঠিক সময়টা কি! মৃত্যুর আগে হাজিরা দেওয়া!

ঝাড়া চল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল গাড়ি। বাগনানে ঢুকল পৌনে আটটায়। স্টেশনের গায়ে বাসস্ট্যান্ড, ত্বরিত পায়ে ওভারব্রিজ টপকে এল কমলেন্দু। স্ট্যান্ড ফাঁকা। বাস নেই। আধো আলো আধো অন্ধকারে এদিক ওদিক মানুষের জটলা। হাটুরে মানুষই বেশি, কারুর তেমন কোন তাড়াহুড়ো নেই। গল্প করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এক সভ্যভব্য লোক দেখে কমলেন্দু তাকে প্রশ্ন করল,—মানকুর ঘাটের বাস কখন আসবে?

—আসবে কি? লোকটার মুখে এক রাশ বিরক্তি,—বাইনান মোড়ে কি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। লোকজন ড্রাইভার কণ্ডাকটরকে পিটিয়েছে খুব।

ওনারা এখন বাস নিয়ে থানায় ধর্না দিয়ে বসে আছেন।

—সর্বনাশ। কমলেন্দু প্রায় আর্তনাদ করে উঠল,—তাহলে আমার কি হবে?

—সবার যা হবে আপনারও তাই হবে। লোকটা কমলেন্দুর আপাদমস্তক জরিপ করল,—যাবেন কোথায়?

—ওপারে। জ্যোতিপুর।

—দুধকুমড়া হয়ে?

ঘাড় নাড়ল কমলেন্দু।

—একটা ভ্যান-ট্যান ধরে নিন। দেখুন যদি শেয়ারে লোক-টোক পান।

আলগা পরামর্শ ছুঁড়ে দিয়ে দূরে সরে গেল লোকটা। কমলেন্দু আবার একা। মনে মনে হিসেব কষছে। ভ্যান রিক্সায় মানকুর ঘাট কম করে ঘণ্টা খানেক। নটা সওয়া নটা তো বাজবেই। বেশ রাত হয়ে যাবে জ্যোতিপুর পৌঁছতে। মনে পড়তেই পেটে চিনচিন ক্ষিধের অনুভূতি। কোন্ দুটোর সময়ে টিফিন করেছে, তারপর তো আর একটা দানাও পেটে পড়ে নি, নাড়িভুঁড়ি তালগোল পাকাচ্ছে ভেতরে। দেরি যখন হয়েছেই, এখানেই খাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিলে হয়। পিসির বাড়ি গিয়ে রাতদুপুরে কি জুটবে কিছু?

পুরনো স্মৃতি দুলে এল সহসা। সেবার স্কুলের সেক্রেটারি মারা গেল হঠাৎ। দিনটা ছিল শুক্রবার, সোমবারও কি কারণে যেন ছুটি ছিল, হোস্টেল থেকে চলে এসেছে কমলেন্দু। রাত দশটায় পৌঁছেই ক্ষিধে তেষ্টায় ছটফট করছে। মা ঝেঁঝে উঠল,—অত তাড়া লাগালে চলে! ভাতটা ফোটানোর সময় তো দিবি!

চোদ্দ বছরের অধৈর্য কমলেন্দু এক দৌড়ে পিসির বাড়ি। পলকে ভাতের থালা হাজির। সামনে পিঁড়ি নিয়ে বসেছে পিসি,—তোর জন্যে বারো মাস আমার দু মুঠো চাল রাঁধা থাকে রে বিল্টু। শুধু সব্জিতে হবে, না একটা ডিম ভেজে দেব?

সেই পিসি এখনও তার প্রতীক্ষায়। কিন্তু অন্যভাবে। অন্য রূপে।

দীর্ঘশ্বাস চেপে বাজারের মধ্যে এল কমলেন্দু। শহরটা হাতের তালুর মতো চেনা। এখানেই তার কলেজ জীবন কেটেছে। রায়দের হোটেলে রান্নাটা ভাল, সেখানে ঢুকে চটপট দু-গরাস্ খেয়ে নিল। বেরিয়ে ভ্যানরিক্সার দর করবে কি করবে না ভাবছে, বাসস্ট্যান্ডে শোরগোল।

এল বাস। হেলতে দুলতে। মুরগিঠাসা হয়ে ছাড়ল প্রায় নটায়। রুটের শেষ বাস। যেখানে থামছে, সেখানেই থেমে থাকছে। শেষ যাত্রীকে নামিয়েও নড়ে না। আধ ঘণ্টার পথ পেরোতে ঘণ্টা কাবার।

মানকুর ঘাট। রূপনারায়ণের তীরে ছমছমে অন্ধকার। ডিঙি নৌকো নেই, একটা মাত্র ভুটভুটি নিরাসক্ত ভাবে দুলছে ঘাটের কিনারে।

আট দশ জন লোক ওপারে যাবে। তাদের সঙ্গে পায়ে পায়ে ভুটভুটির দিকে এল কমলেন্দু।

একজন প্রশ্ন করল,—কখন ছাড়বে গো?

—আসেন না। ...বসেন। হালের পাশে বসে থাকা লোকটা বিড়ি ধরাল।

কমলেন্দু আশ্বস্ত হল। আর বড় জোর ঘণ্টা খানেক।

মেশিন বসানো নৌকোর গলুই-এ বসেছে যাত্রীরা। নদীর বুক থেকে হাওয়া উঠছে মাঝে মাঝে। ভিজে ভিজে। তারাহীন আলোবিহীন মসীকৃষ্ণ আকাশটার দিকে ক্ষণিকের জন্য চোখ গেল কমলেন্দুর। এতক্ষণে ধকলটা জুড়োচ্ছে যেন, বুজে আসছে চোখের পাতা।

মৃদু হট্টগোল। তন্দ্রা ছুটে গেল। নৌকোর লোকটা তাদের বসিয়ে রেখে কোথায় যেন গেছে, ফিরছে না। কয়েকজন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে হঠাৎ, গজগজ করছে সরবে। একটা ছোকরা মতন ছেলে লাফিয়ে নৌকা থেকে নেমে গেল। মিনিট দশেক পর নৌকো চালককে নিয়ে ফিরেছে। গা মোচড়াচ্ছে ভুটভুটি চালক,—তাড়া কিসের কর্তারা? একটু জিরোন না।

ছোকরা তেড়ে উঠল,—রসিকতা হচ্ছে? আমাদের বাড়িঘরদোর নেই?

—তা তো আছে। কিন্তু যাবেন কি করে? দেখছেন না কেমন ভাটির টান? আজ অমাবস্যা, এর পরই বান আসবে।

—সে তো আসবে রাতদুপুরে।

—মনে হয় না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই...

কথা শেষ হওয়ার আগেই চেল্লামিল্লি শুরু করে দিয়েছে যাত্রীরা, নৌকো ছাড়ার জন্য জোরাজুরি করছে। এসব ঝুট ঝামেলা সচরাচর পছন্দ করে না কমলেন্দু, কিন্তু এই মুহূর্তে সকলের ব্যগ্র ভঙ্গি ছুঁয়ে যাচ্ছিল তাকেও। যেন সকলেই এক সুরে তারই হৃদয়ের কথার প্রতিধ্বনি তুলছে।

ভুটভুটি চালক প্রায় বাধ্য হয়ে নেমে এসেছে নৌকোয়, মেশিনে স্টার্ট দিল। নৈশ আঁধার যান্ত্রিক গর্জনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে, নদীর জল ছটফট করে

উঠল। পাড় থেকে সরে গেল নৌকো।

জল কাটছে ছলাৎ ছল। ছিটকে ছিটকে উঠছে জলরেণু, আর্দ্র হয়ে যাচ্ছে মুখচোখ। আবার বাড়ির কথা মনে পড়ছিল কমলেন্দুর। দূর বহুদূর কলকাতার কথা। কি হচ্ছে এখন ফ্ল্যাটে? কি করছে রিন্টি বুবাই? মাধবী কি ওদের আজ তাড়াতাড়ি খাইয়ে শুইয়ে দিল? বুবাই এক রাতও বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, মামার বাড়ি গেলে ফিরে আসার জন্য ছটফট করে। সে কি আজ মুখ ভার করে বসে আছে? নাহ্, দুম করে আবেগের বশে বেরিয়ে পড়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। কাল ধীরেসুস্থে এলেই হত। সত্যি যদি তেমন কিছু ঘটে গিয়ে থাকে, তবে এখন মাঝরাতে পৌঁছনোও যা, কাল দুপুরে পৌঁছনোও তাই। আর যদি পিসি সামলে নিয়ে থাকে, তবে এখন গিয়ে বাড়িশুদ্ধু সকলকে শুধু বিব্রতই করা।

চিন্তার মাঝেই ভুটভুটির আওয়াজ থেমে গেছে। মাঝগাঙে এসেছে নৌকো, দু দিকে নিকষ অন্ধকার। বিন্দুর মতো একটা আলোকরেখা দেখা যায় দূরে। দুধকুমড়া ঘাটের। ওই আলোটুকু অন্ধকারকে যেন বাড়িয়ে দিচ্ছে শতগুণ।

কে যেন হেঁকে উঠল—হল কি? থামলে কেন?

আঁধারই যেন উত্তর দিল। জলদ্‌গম্ভীর স্বর,—বান আসছে।

নৌকো একদম নিঃশব্দ সহসা। পাটাতন কাঁপছে তিরতির। অনেক অনেক দূর থেকে, যেন শৈশবেরও ওপার থেকে একটা চাপা গুমগুম ধ্বনি এগিয়ে এল। কাছে আসছে ক্রমশ, আরও কাছে। স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হল আগুয়ান জলোচ্ছ্বাস।

কমলেন্দু বসে আছে স্থির। নিস্পন্দ। নিজের বুকের ভেতরই শব্দটা বাজতে শুরু করেছে এবার। মাঝ নৌকোয় দুলে উঠল কমলেন্দু, দু-পাড় ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে বান। অন্ধকারে দেখা যায় না, তবু তার সরব উপস্থিতি নাড়িয়ে দিল কমলেন্দুর হৃৎপিণ্ড।

জলের আওয়াজ অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল। এবার কি ছাড়বে নৌকো? কমলেন্দু পৌঁছবে ওপারে?

এক সময়ের অভ্যস্ত তিন ঘণ্টার পথ বড় বেশি দীর্ঘ হয়ে গেছে আজ। বড় বাধাসঙ্কুল। দ্বিধাময়। চাইলেই কি আর উজান স্রোতে ফেরা সহজ হয় এখন!

এই ঊনচল্লিশ বছর বয়সে!

অশরীরী সভা

হাওয়ার আগে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। খবর নয়, বিজ্ঞপ্তি। নিখিল বিশ্ব অশরীরী সমিতির লবণহ্রদ শাখা একটি বিশেষ সভার আয়োজন করছে। আজই। কাঁটায় কাঁটায় রাত বারটায়। সকল সদস্যের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

গুটিকয়েক উৎপটাং সভ্যদের বাদ দিলে লবণহ্রদের অশরীরীরা মোটামুটি প্রায় সকলেই অভিজাত শ্রেণীর, একা একা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতেই তারা বেশি ভালবাসে। সারাদিন আলোয় ঘাপটি মেরে থাকার পর সন্ধে হলেই তারা বেরিয়ে পড়ে হাওয়া খেতে। সান্ধ্যভ্রমণ। কেউ যায় কেষ্টপুর বাগজোলা খালের দিকে, কেউ বাইপাস লেকটাউন, আবার কেউ কেউ ভি আই পি ধরে সোজা এয়ারপোর্ট। দমদম বিমানবন্দরের আশেপাশে বেশ কয়েকটা ভাঙাচোরা বাগানবাড়ি আছে, রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জোর নাচাগানার আসরও বসায় শৌখিন মজলিশিরা। দুচার পিস ছিঁচকাঁদুনে অশরীরী যে লুকিয়ে চুরিয়ে নিজের বাড়ির আনাচেকানাচে ঘুরঘুর করে না তা নয়, তবে তাদের সংখ্যা

নেহাতই কম। অভিজাত বিদেহীদের যে মায়া মমতা থাকতে নেই। সম্প্রতি রাজারহাটের দিকে যাওয়ারও খুব ঝোঁক বেড়েছে বাবুবিবিদের। সেখানে চলছে এক পেল্লায় কর্মযজ্ঞ। কোটি কোটি টাকা খরচা করে তাদেরই বাপঠাকুরদার শ্রাদ্ধের আয়োজন করছে মনুষ্যকুল—এ দেখায় অশরীরীদের ভারী উৎসাহ।

আজ অবশ্য বেড়ানো শিকেয় তুলে সাঁই সুঁই ফিরে আসছিল সবাই। লাফিয়ে লাফিয়ে জড়ো হচ্ছে তিন নম্বর সেক্টরের নীহারিকায়। ঝাঁ চকচকে কটেজ প্যাটার্ন বাড়িখানা পরিত্যক্ত পড়ে আছে বহুকাল। বছর পাঁচেক আগে কর্তা টেঁসেছেন, পর পরই গিন্নিমা। এন আর আই ছেলে আর দেশে ফিরল না, বাবা মা হাপিত্যেশে পথ চেয়ে ছিলেন তার, শেষে মৃত্যুর পর দুজনেই ব্যাকুল হয়ে পাড়ি জমিয়েছেন আমেরিকায়। তাঁরা এখন সমিতির নিউইয়র্ক শাখার সম্মানীয় সদস্য। তবে একদা সাধ করে বানানো এ বাড়ির প্রতি এখনও তাঁদের বড় টান, মাঝে মাঝেই জি-মেলে খোঁজখবর নেন, বাড়িটার একটু দেখভাল করার জন্য অনুরোধ করেন স্থানীয় অশরীরীদের। তাঁরাও নিশ্চিন্ত, এখানকার অশরীরীরাও খুশি। চমৎকার আগাছা ঘেরা কম্পাউন্ড, সামনেই অনাদরে বেড়ে ওঠা ছাতিম অমলতাস, ধুলো ময়লা আবর্জনা মাকড়সার জাল...। সঙ্গে আবার দামী দামী বিদেশী গ্যাজেট। আহা, এ যেন একেবারে আদর্শ ভৌতিক স্থান। এমন ধরনের বাড়ি লবণহ্রদে আরও আছে বটে, তবে ঠিক এমনটি যেন সচরাচর মেলে না। সুখে থাক বিদেশে এন আর আই ছেলে!

রাত বাড়ছে। ছাতিম অমলতাস ক্রমশ ভরে যাচ্ছে অশরীরীতে। লনে ছাদে ব্যালকনিতে সর্বত্র অশরীরী ভিড়। ছোট ছোট জটলায় আড্ডা শুরু হয়ে গেছে।

প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার তেজেন্দ্র সমাদ্দার আগাছায় পায়চারি করছিলেন। দাঁতের ফাঁকে কাল্পনিক পাইপ। চিবিয়ে চিবিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়লেন,—কেসটা কী বলো তো হে? হঠাৎ সমিতি এমন অরাত্রে মিটিং ডাকল কেন? অমাবস্যার তো এখনও তিন রাত বাকি!

এককালের দুঁদে আমলা রণবীর জোয়ারদার ঝুপ করে ছাতিম গাছ থেকে নামলেন। অস্তিত্বহীন ভুরু কুঁচকে বললেন,—নট ওনলি দ্যাট, মিটিং-এর প্রসেডিওর ব্রেক করা হয়েছে। সাত রাত্তির আগে প্রপার নোটিশ সার্ভ

করা উচিত ছিল।

—হতে পারে কোনও আরজেন্ট ডিসকাশান। তেজেন্দ্র গোঁফ চুমরোনোর ভঙ্গি করলেন,—যূথিকার বয়ফ্রেন্ড ভাগেনি তো?

—তার জন্য মিটিং কেন? আমাদের সমিতি তো মোস্ট আধুনিক সোসাইটি। এখানে যে যখন খুশি সঙ্গী বদল করতে পারে। এ নিয়ে নিখিল বিশ্ব অশরীরী কমিটির রেজলিউশানও আছে।

—যূথিকার লেটেস্ট বয়ফ্রেন্ড যেন কে ছিল?

—ওমপ্রকাশ কেজরিওয়াল। সেই যে, বড়বাজারে বেবিফুডের দোকান ছিল। সুনীল সামন্তর বাড়িটা কিনে যে প্রাসাদ হাঁকিয়েছিল একখানা।

—কিন্তু ওটা তো একটা ওল্ড হ্যাগার্ড!

—আহা দেখেননি, যূথিকার একটু দুবলা বুড়ো লোকদের দিকেই বেশি নজর!

—আপনার পেছনেও একবার লেগেছিল না?

—সে তো আপনার পেছনেও...

—আমি মোটেই দুবলা বুড়ো নই। মিলিটারিতে ছিলাম, আটাত্তর বছর বয়সেও রেগুলার ডনবৈঠক করতাম। নেহাত দুম করে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল...

—আমারও তো তাই। রিটায়ারমেন্টের পরেও প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করেছি...। ইভন অ্যাট দি এজ অফ সেভেনটিফাইভ...

কথা শেষ হল না। টুনটুন ঘণ্টা বাজছে অন্দরের দেওয়াল ঘড়িতে। অশরীরীকুল সহসা নীরব।

ঘণ্টাধ্বনি থামতেই যূথিকার আবির্ভাব। বাথরুমের ওয়াশিং মেশিন থেকে বেরিয়ে ড্রয়িংরুমে টিভির চূড়ায় এসে বসল যূথিকা। চোখে ফটোসান, পাছে অন্ধকারে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সাজগোজেও বেশ বাহার আছে। শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ, খোঁপায় রঙিন ক্রান্‌চি, ঠোঁটে টকটকে লিপস্টিক, অদৃশ্য শ্রীচরণে ছইঞ্চি প্ল্যাটফর্ম হিল। অশরীরী হওয়ার সুবাদেই বুঝি লীলাবতী গার্লস হাই স্কুলের এক্স প্রধানশিক্ষিকা কুমারী যূথিকা সেনের পঁয়তাল্লিশ বছরের কাটখোট্টা মুখখানি এখন বেশ কমনীয় দেখায়। বলাই বাহুল্য যূথিকা সেন এখন এই শাখার স্থায়ী সম্পাদিকা।

বছর পাঁচেক আগে মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষায় শাড়ির কুঁচির ভাঁজে

ভাঁজে জিওমেট্রির থিয়োরেম সেঁটে এনে টুকছিল এক ওস্তাদ ছাত্রী। বদরাগী বলে বিখ্যাত দাপুটে যূথিকা দিদিমণি ঘাঁক করে ধরেছিল তাকে। পরিণাম শুভ হয়নি। ছুটির পর ছাত্রীর প্রেমিক দলবল জুটিয়ে পাকড়াও করে যূথিকাকে, গলায় ছুরি ঠেকিয়ে সর্বসমক্ষে ওঠবোস করায়, তাতেই লজ্জায় ঘেন্নায় অপমানে বাড়ি ফিরেই স্লিপিং পিল খেয়ে যূথিকা স্ট্রেট এপারে। মনুষ্যজীবনে দক্ষ প্রশাসক হিসেবে নাম ছিল যূথিকার, এপারে এসেও অশরীরী সমাজের দায়িত্ব সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। আড়ালে আবডালে যে যাই বলুক, সামনাসামনি কেউ তার বিরুদ্ধে ট্যাঁ ফো করার সাহস পায় না।

যূথিকা গুছিয়ে বসেছে। শূন্যে ডটপেন ঠুকে তীক্ষ্ণ মিহি সুরে ঝংকার তুলল,—সাইলেন্স সাইলেন্স।

পিউ সিলিংফ্যানে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। খিলখিল হেসে উঠল,—আমরা তো চুপ করেই আছি যূথিকা আন্টি!

—আন্টি নয়, দিদি। কড়া চোখে তাকাল যূথিকা,—কত বার না বলেছি এপারের নিয়ম সব আলাদা? তুমি এখন আমায় নাম ধরেও ডাকতে পার।

—সরি। মনে থাকে না।

—বাজে কথা। আটাত্তর বছরের তেজেন সমাদ্দারকে নাম ধরে ডাকা যায়, আর আমার বেলাতেই যত...

—ওমা, ওরা তো এখন আমার বয়ফ্রেন্ড।

পিউ আবার খিলখিল হেসে উঠল। হাসতেও পারে বটে মেয়েটা। বন্ধুদের সঙ্গে কলেজ থেকে ফেরার পথে দুই মিনিবাসের পাগলা দৌড়ের শিকার হয়েছিল পিউ, চাকার নীচে পিষে মরার আগের মুহূর্তেও হাসছিল খুব, এখনও কথায় কথায় ছিপিখোলা সোডার বোতলের মতো হাসির বুড়বুড়ি ওঠে তার। যূথিকা মরে গিয়েও অমন উচ্ছল হাসি হাসতে পারে না বলে পিউকে তার একেবারেই নাপসন্দ।

আর একবার কটমট চোখে পিউকে দেখে নিয়ে ঘরে আলগা চোখ বোলালো যূথিকা। হ্যাঁ, কর্মসমিতির সদস্যরা সবাই মোটামুটি এসে গেছে, গাঢ় অন্ধকারে কাউকেই দেখে নিতে অসুবিধে হয় না। মাধুরী বসে আছে পিউ-এর পাশে, শর্মিলাসুতনু ফ্রিজের ডালায়, অনঙ্গমোহন পেলমেটে আধশোওয়া। সনাতন, যাকে সবাই ছোনু মল্লিক বলে চিনত, সে এখন দোল খাচ্ছে পরদায়। ঝাঁকড়াচুলো রামলাল উঁকি মারল এয়ারকুলারের জাফরি থেকে, টসকি

বাজিয়ে হাই তুলল। ফুটপাতে শুত বেচারা, ভিক্ষে করে দিন কাটাত, প্রবল ঠাণ্ডায় রাস্তায় মরে পড়ে ছিল, এখনও তাই এসি মেশিন ছাড়া থাকতে চায় না। সাধারণ সদস্যরাও সভায় উপস্থিত, যে যার মতো জায়গা করে নিয়েছে। কার্পেটে, সোফায়, ক্যাবিনেটে, ডাইনিং টেবিলে...

যূথিকা গার্ডফাইল খুলল। খোনা খোনা গম্ভীর গলায় বলল,—আপনাদের অনেকের মনেই নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে হঠাৎ আজ এই একাদশীর রাতে মিটিং ডাকা হল কেন?

তেজেন্দ্র ক্যাবিনেটের টঙ্ থেকে চেঁচালেন,—জেগেছেই তো।

—কারণটা অত্যন্ত জরুরী। নতুন এক সদস্যর নাম রেজিস্ট্রি করা হবে আজ। জানেনই তো, যতক্ষণ পর্যন্ত না নাম নথিভুক্ত হচ্ছে, কেউ আমাদের সমাজে আইনানুগ স্বীকৃতি পায় না। ফলে তিনি আমাদের অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

ঘরে খুকখুক কাশির আওয়াজ।

যূথিকা বোঁ করে ঘাড় ঘোরাল,—কে?

—আমার একটা নিবেদন ছিল।

—সংক্ষেপে সারুন।

রণবীর ঢোক গিলে বললেন,—আমাদের তো কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে, সেগুলো ব্রেক করে আজই মিটিং...আর তো তিনদিন পরেই...

—অদ্দিন অপেক্ষা করা সম্ভব হত না।

—কেন?

—সেটাই তো বলছি। দয়া করে বসুন, আর ওই হেঁপো রুগীর মতো খুকখুক কাশিটি বন্ধ রাখুন। যত সব বাজে পুরনো স্বভাব। ...মনে রাখবেন, আপনারা অশরীরী। ভূত নন। আপনাদের কাছ থেকে আর একটু ডিগনিফায়েড ব্যবহার প্রত্যাশা করি।

রণবীর কেতরে দুমড়ে মাথা নামিয়ে বসে পড়লেন। দজ্জাল গিন্নি যে কী বদঅভ্যাস করে দিয়েছে, জাঁদরেল মেয়েদের মুখোমুখি হলে এখনও সমস্ত তেজ কর্পূরের মত উবে যায়। তবে যূথিকা একটা কথা ঠিকই বলেছে। তাঁরা মোটেই হেঁচিপেঁচি ভূত নয়, একটু উচ্চস্তরের ইয়ে। খাবার দাবারে হামলান না, অনর্থক ভয় দেখিয়ে বেড়ান না, এর তার ভেতর সেঁধিয়ে গিয়ে ধুন্ধুমার

বাধান না...। তবু সকলের সামনে এভাবে দাবড়ানো...! ভাগ্যিস এই মেয়ে রণবীরের জীবদ্দশায় ইলেকশান লড়ে মন্ত্রী হয়ে বসেনি! তাহলে তো রাইটার্সেই তাঁর জান কয়লা করে ছেড়ে দিত।

যূথিকা আবার প্রসঙ্গে ফিরেছে,—যা বলছিলাম। আমাদের সমাজে এই নবাগতাটির নাম ইন্দুলেখা রায়। সল্টলেকেই থাকতেন, ওখানে সবাই এঁকে মাসিমা বলে ডাকত। সারাটা জীবন শুধু অবহেলা আর বঞ্চনা পেয়েছেন ইন্দুলেখা। এমনকি মৃত্যুর পরেও। মারা গেছেন পাক্কা চারদিন আগে, পোড়ানো হয়েছে সবে গতকাল। টানা তিন দিন পুলিশ মর্গে পড়েছিলেন।

পূর্বতন দারোগা জীবন চৌধুরী ফিসফিস করে কথা বলছিল স্বনামধন্য প্রোমোটার মোহন গুপ্তার সঙ্গে। কার্পেট থেকেই গলা বাজাল,—কী কেস? হোমিসাইড? না সুইসাইড?

—অ্যাক্সিডেন্ট। নাতির দুধ গরম করছিলেন, হঠাৎ কীভাবে যেন কাপড়ে আগুন লেগে যায়। নাইন্টি পারসেন্ট বার্ন ইন্‌জুরি। যাক গে যাক, ওঁর শরীরী অবস্থার দুর্গতির জন্যই ওঁর কেসটা আমি স্পেশাল হিসেবে ট্রিট করেছি। লাশ হয়ে তিন দিন পড়ে থাকা...

—কিন্তু তিন দিন পড়ে রইলেন কেন?

—যে কারণে থাকে। আপনাদের মতো পুলিশদের ক্যালাসনেস। উদাসীনতা। ডাক্তারের ইন্‌ডিফারেন্স...। এর মধ্যে ডোমরাও দুদিন ধর্মঘট করে বসল।

—ডোমদের স্ট্রাইক? ছোনু মল্লিক পরদা থেকে লাফিয়ে পড়ল। মনুষ্যজন্মে সে ছিল তেষট্টিটা ইউনিয়নের সেক্রেটারি, ইউনিয়ন করেই সল্টলেকে জমি বাড়ি করেছিল। রিকশা ঠেলা কুলি ডোম জমাদার সকলেই তার ইউনিয়ন রাজ্যের প্রজা। তাদের কারুর সম্পর্কে সামান্যতম শব্দও সে বরদাস্ত করে না। খনখনে গলায় বলল,—নিশ্চয়ই লেজিটিমেট গ্রাউন্ড ছিল। এত কষ্ট করে মড়া আগলায় ওরা, কেন ওদের পাঁইট অ্যালাওয়েন্স দেওয়া হয় না? পুলিশরা ডেঞ্জার অ্যালাওয়েন্স পায়, পাহাড়ে চাকরি করলে হিল অ্যালাওয়েন্স...

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। যূথিকার গলায় ব্যঙ্গ,—কারুর দোষ নেই। দোষ শুধু ইন্দুলেখার কপালের।

যাঁকে নিয়ে এই আলোচনা, সেই ইন্দুলেখা দরজার এক কোণে

জড়োসড়ো দাঁড়িয়ে। চোখ গোল গোল, শুনছেন অশরীরীদের বাক্যালাপ। তাঁর মতো এক নগণ্য বৃদ্ধাকে নিয়ে এত বড় একটা সভা বসতে পারে ভাবতেও পুলক জাগছিল তাঁর। হেলাফেলার দিন বুঝি কাটল!

যূথিকা নরম গলায় ডাকল,—আর ওভাবে নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন না ইন্দুলেখা। সামনে আসুন, আপনাকে কটা প্রশ্ন করার আছে।

এত জনের মাঝে কথা বলার অভ্যেস নেই ইন্দুলেখার। অনুচ্চ স্বরে বললেন—প্রশ্ন? আমায়? কী প্রশ্ন ভাই?

—তেমনি জটিল কিছু নয়। রুটিন এনকোয়্যারি। আমাদের খাতায় আপনার নাম ওঠার আগে প্রশ্নগুলোর জবাব পাওয়া দরকার। এই উত্তরের ওপরেই নির্ভর করছে আপনার এখানকার সদস্যপদ।

—মানে?

—শুনুন, মানুষের কতগুলো বেসিক নেচার আছে, সেগুলো মরলেও যায় না। এ আমরা জানি। কিন্তু কিছু কিছু পুরোন স্বভাব আপনাকে ছেড়ে আসতেই হবে। আপনার জবাব শুনে এই অশরীরী সমাজের যদি মনে হয় তা আপনি পারবেন না, তাহলে আপনাকে আমাদের সমাজে নেওয়া সম্ভব হবে না। যূথিকা সুঁই করে একটা ভৌতিক শ্বাস ফেলল,—আপনাকে তখন অনন্তকাল ভূত হয়ে থাকতে হবে। আই মিন মেয়েভূত।

—ভূত? অশরীরী? ইন্দুলেখা ফ্যালফ্যাল তাকালেন,—এ দুয়ে কোনও তফাত আছে নাকি?

—বিস্তর ফারাক। ভূত পেত্নী অনেক নীচের লেভেলের। মনুষ্যজগতে উচ্চ শ্রেণীর মানুষরা সাধারণ মানুষদের যে চোখে দেখে, আমরাও ভূতদের সেই চোখে দেখি।

ইন্দুলেখার কিছুই মগজে ঢুকল না। সাদাসিধে ঘরোয়া রমণী তিনি, হেঁসেল ঠেলেই জীবন কেটেছে। তবু এক ধোঁয়াটে অধোগতির আশংকায় অস্বস্তি বোধ করলেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন,—বলো কী জানতে চাও?

—প্রথম প্রশ্ন। এই বিদেহী জীবন আপনার কেমন লাগছে?

সামান্য থমকালেন ইন্দুলেখা। কী বলবেন? সত্যি? না মিথ্যে? কী বললে এরা খুশি হবে? সত্যি বলতে গেলে তো বলতে হয় মৃত্যুর পর জীবনটা এখন অসহ্য রকমের মনোরম। দায়হীন নির্ভার, নিরুদ্বিগ্ন। সারাক্ষণ খালি ঘোরো ফেরো আর উড়ে বেড়াও। যেখানে ইচ্ছে, যেমন খুশি। আহা,

তিনি যেন এখন মুক্ত বিহঙ্গ নন, তার চেয়েও বেশি কিছু। পাখির তো শরীর আছে, সুতরাং শরীরজনিত সমস্যাও আছে। আছে ব্যাধি অপঘাতের আশংকা, আছে জরা টরার ভয়। ইন্দুলেখার এখন ওসব কিস্যু নেই। না পিত্তশূল, না অম্লশূল। কোন্‌কালের শত্তুর চোঁয়া ঢেকুরটাও নেই আর। আটষট্টি বছরের লঝঝরে দেহ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি এখন সর্ব অর্থে ফুরফুরে বাতাস।

তবে আহ্লাদটা প্রকাশ করা কি উচিত হবে? মিথ্যে মিথ্যে একটা মনখারাপের ভাব ফোটাবেন চোখে মুখে?

মাধুরী খুনখুন করে উঠল,—কী হল মাসিমা? কিছু বলুন। ...বানিয়ে বলার চেষ্টা করবেন না, আমরা কিন্তু ধরে ফেলব।

ইন্দুলেখা আমতা আমতা করলেন,—না, না, মিছে কথা বলব কেন? ভালই তো আছি এখন। দিব্যি আছি।

—কতটা ভাল?

—মাপ তো বলতে পারব না। তবে সারাক্ষণ মনে হয়, আহা এ জীবন কেন আগে পাইনি!

মাধুরীর অবয়বহীন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্বামী শাশুড়ি ননদ একজোট হয়ে দুধে বিষ দিয়ে মেরেছিল তাকে, মনুষ্যজীবনের প্রতি তার প্রবল ঘৃণা।

উচ্ছল স্বরে প্রশ্ন করল,—তার মানে আপনি এখন আর ওপারের জন্য টান অনুভব করছেন না, তাই তো?

—ঠিক তাই। ইন্দুলেখা চোখ ঘোরালেন,—কার জন্য টান থাকবে?

—কেন, ছেলেমেয়ে?

—হুঁহ, ছেলেমেয়ে! ইন্দুলেখা মুখ বেঁকালেন,—দেখলাম তো ছেলেমেয়ের চেহারা। মর্গে আমি পচছি, এদিকে বাবুরা সামনের দোকানে বসে সিঙাড়া কচুরি সাঁটাচ্ছে! চিতেয় উঠতে না উঠতে আমার গয়নাগুলো নিয়ে সব কাড়াকাড়ি পড়ে গেল! ছেলে তো গুণের গুণনিধি! কাল আমাকে পুড়িয়ে এসেই টিভিতে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে বসে গেল! অজুহাত কী? না, কদিন ধরে লাশকাটা ঘরে ঘুরে আর থানায় দৌড়ে মাথা জ্যাম হয়ে গেছে, শচীন সৌরভের ব্যাটিং দেখলে মনটাও একটু ভাল লাগবে! কে তোকে ন মাস পেটে ধারণ করেছিল, অ্যাঁ? কে দুধকলা দিয়ে বড় করল? চিরকালের লাজুক ইন্দুলেখার মুখে সহসা কথার খই ফুটছে। গজগজ করে উঠলেন, মার শোক

তিন দিনেই উবে যায়? আমি ওই ছেলের কথা আর মনেও আনতে চাই না।

—আর নাতি নাতনি? পিউ পুটুস করে ফুট কাটল।

—মায়া বাড়ানোর চেষ্টা কোরো না বাছা। তারাও আমার আপন নয়। সব তাদের মা বাপের সম্পত্তি। মা বাপ দুটিতে সাজুগুজু করে অফিস বেরিয়ে গেলেন, আমার কাজ হল বিনি মাইনের আয়া হয়ে তাদের সামলানো! আদর সোহাগ দেখানোর জো নেই, শাসন করার অধিকার নেই...! সবেতেই দোষ বার করবে, খুঁত খুঁজবে!

—আর আসল লোকটা? শর্মিলা ঢুলুঢুলু চোখে তাকাল। নার্সিংহোমের অপারেশনে থিয়েটারে সিজারিয়ানের সময়ে অ্যানেসথেসিয়ার ডোজ বেশি হয়ে গিয়েছিল, আর জ্ঞান ফেরে নি শর্মিলার। এখনও তার কাজলকালো আঁখিতে শেষ ঘুমটুকু লেগে আছে। ঈষৎ জড়ানো গলায় বলল,—আপনার স্বামীর কথা কিন্তু আপনি চেপে যাচ্ছেন।

—মরণ। চেপে যাব কেন? সেই লোকটাই তো আমার আসল শত্তুর। সারাজীবন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে আমায়। কী অত্যাচারটাই না করে গেছে বাপ! সেই বিয়ের রাত থেকে শুধু হম্বিতম্বি আর খবরদারি। ঘড়ি মাপা সময়ে ভাতের থালাটি সামনে চাই! জ্বরজারি হোক, শরীর খারাপ হোক, কোনও রেয়াত নেই...! ভুলেও নিজে কুটোটি নাড়বে না, খালি হুকুম হুকুম হুকুম। বাপের বাড়ি গিয়েও এক রাত্তিরের বেশি থাকার জো ছিল না গো! কত যে লক্ষ রকম বায়নাক্কা! একটু ভাল করে নারকোল কুরে মোচা রাঁধো তো! কইমাছ এনে দিলাম, গঙ্গাযমুনা করলে না কেন! সব্বসময় নিভাঁজ জামাপ্যান্টটি হাতের গোড়ায় চাই...রুমাল পর্যন্ত কখনও বার করে নিত না! ইন্দুলেখার গলা গুমগুম বাজছে,—বুড়ো বয়সেও কি একটু রেহাই দিয়েছে? চব্বিশ ঘণ্টা মেজাজ আর দাবড়ানি! সকাল বিকেল গরম জল চাই, কর্তাবাবু পা ডুবিয়ে বসে থাকবেন! ওতে নাকি বাতব্যাধি ধরবে না! সওয়া চারটের জায়গায় চারটে আঠেরোয় চা দিলে কাপ ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। ছানায় তিন দানা চিনি কম হয়েছে, প্লেটশুদ্ধ দিয়ে এলেন নর্দমায়! সিগারেট খেয়ে ছাই ফেলবেন, অ্যাশট্রে বাড়িয়ে দিতে দেরি হয়েছে, ওমনি কাচের গ্লাস ছুঁড়ে মারলেন মুখে...

—সেকি! এ তো অ্যাটেমপ্ট টু মার্ডার! সেকশান থ্রি হানড্রেড অ্যাণ্ড এইট! একদা উকিল সুতনু শর্মিলার খোলা চুলে বিলি কাটছিল, আচম্বিতে

গর্জে উঠেছে,—আপনি কি আঘাত পেয়েছিলেন?

—পাইনি আবার! বুকটা আমার ভেঙে গিয়েছিল।

—অ, তাহলে সাত বছর হবে না। তবু অন্তত তিনটে বছর...ঘানিতে যুতে দেওয়া উচিত ছিল ব্যাটাকে।

—যাক ভাই, যার ধর্ম তার কাছে। সে যদি আঘাত দিয়ে সুখ পায় তো পেয়েছে। ইন্দুলেখা লম্বা শ্বাস ফেললেন,—আরও কত যে অত্যাচার করেছে! কর্তার হার্টের ব্যামো, ডাক্তার ফর্মান দিল রাতে ভাত রুটি চলবে না, ব্যস শুরু হল আর এক যন্ত্রণা। দুধ কলা খই খাবেন তিনি, তারও কত তরিবৎ! কাঁটায় কাঁটায় সন্ধে সাতটায় ফুটন্ত দুধের বাটি এনে রাখতে হবে ডাইনিং টেবিলে, ঠিক সাতটা পঁচিশে কাঁসির পাশে হাজির করতে হবে এক জোড়া সিঙ্গাপুরি কলা। টিপে টিপে দেখবেন উনি, যেন বেশি নরমও না হয়, শক্তও না হয়। কলার মাপ হবে এক বিঘতের বেশি, দেড় বিঘতের কম। তারপর সাতটা আটাশে হাজির করতে হবে খই-এর কৌটো, গুণে গুণে ন মুঠো খই তুলে তুলে দুধে ফেলে দিতে হবে। সাতটা চল্লিশে চিনি, চার চামচ। আটটায় খোসামুক্ত হয়ে কলা পড়বে দুধে, আটটা পঁচিশ অব্দি সেই কলা গলবে। ঘড়ির কাঁটা টং করে সাড়ে আটটা বাজলে তবে আমার ছুটি, এবার কর্তা আহার মুখে তুলবেন! অবশ্য যতক্ষণ না খাওয়া শেষ হচ্ছে, চেয়ার ছেড়ে ওঠা চলবে না। টিভিতে কত ভাল ভাল সিরিয়াল হয়ে যায়...

—ব্যস ব্যস, বুঝেছি। চিরকুমারী যূথিকা আচমকাই ছরছর করে উঠেছে, আপনারা, মানে বিবাহিত মহিলারা সবাই শুধু স্বামীর নামে কমপ্লেন করেন কেন বলুন তো? এবং আপনাদের নেচার অফ কমপ্লেন সব এক ধরনের...?

বৃদ্ধা অশরীরী সরলাবালা বলে উঠলেন,—স্বামীরা যে সব একরকম হয় ভাই। ওই যে কথায় বলে, স্বামীরা সবাই হল একটা স্বামীরই জেরক্স কপি...

—তার মানে বলতে চান স্ত্রীরা সব ধোয়া তুলসিপাতা?

—তা কেন, বউও নানান রকম হয। তবে স্বামী হল গিয়ে...

পাঁচ বছর আগেও এ ধরনের কথা শুনলে যূথিকা মহা খুশি হত। একটা সময়ে বহু পাত্রপক্ষের সামনে ইনটারভিউতে বসতে হয়েছে তাকে, রঙ একটু বেশি কালো আর ত্বক শুখা বলে বার বার সে বাতিল, পুরুষ জাতটার ওপর রীতিমত বিদ্বেষ ছিল তার। এখন পরিবেশ অন্যরকম। এখন খোলামেলা

সমাজ, রূপ বয়স কিছুই এখন বিচার্য নয়, পুরুষ জাতটার ওপর আজকাল ভারী দয়া যূথিকার। জীবদ্দশায় যা পায়নি, মরণে তা পেয়ে গেলে আর কি কোনও ক্ষোভ দুঃখ থাকে? কমবয়সী পুরুষদের থেকেও যূথিকার টান অবশ্য বেশি বৃদ্ধদের ওপর। বেচারা বুড়োর দল! এত অভিযোগ তাদের নামে! অ্যাত্ত অভিযোগ!

যূথিকা গোমড়া হয়েছে সামান্য। তবে বেশিক্ষণ চুপ থাকলেও তো তার চলবে না, সভা চালাতে হবে। ঠাণ্ডা মেশিনের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল,—আমার প্রশ্ন শেষ। এখন কর্মসমিতির সদস্য হিসেবে আপনার কি কোনও জিজ্ঞাস্য আছে রামলাল?

—হামি আর কী পুছব? রামলালের ঝটপট উত্তর,—দেবীজি তো সচ বাতই বলছেন।

—বুঝেছি। তোমারও বুড়িদের দিকে মন হয়েছে। যূথিকার ফটোসান পেলমেটে ঘুরল,—অনঙ্গবাবু, আপনি কিছু প্রশ্ন করবেন না?

অনঙ্গমোহন মাথা ঝাঁকালেন। অর্থাৎ না। রাজনীতির মানুষ, মন্ত্রীও হয়েছিলেন একবার, সারাজীবন মিটিং মিছিলে এত বকবক করেছেন যে এপারে এসে কথা বলার ইচ্ছেটুকুও লোপ পেয়ে গেছে, এখন ইশারা ইঙ্গিতেই কাজ সারেন।

যূথিকা টেরচা চোখে তাকাল,—তার মানে ইন্দুলেখা পাশ?

অনঙ্গমোহন হাতটাকে একবার দুলিয়ে দিলেন। হ্যাঁ।

যূথিকা অস্থিমাংসহীন হাতখানা বাড়িয়ে দিল ইন্দুলেখার দিকে,—অভিনন্দন। ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বঞ্চনা আর অবহেলা পাওয়ার দিন আপনার শেষ। বলেই একটু মুচকি হাসল—অবিবেচক স্বামীর হাত থেকেও মুক্ত হলেন আপনি। আজ থেকে আপনি মুক্ত সমাজের মুক্ত সদস্য।

ঘরময় তুমুল হর্ষধ্বনি। করতালি। চিঁ চিঁ চ্যাঁ চ্যাঁ। টি টি ট্যাঁ ট্যাঁ। ইন্দুলেখা আহ্লাদে আটখানা। স্বাধীন হওয়ার আনন্দে শূন্যে পাক খেলেন বার দুয়েক। কৈশোরের চাপল্য ফিরে পেয়েছেন যেন, ঘুরে ঘুরে কথা বলছেন সবার সঙ্গে; আলাপ পরিচয় সারছেন।

ঠিক তখনই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে এক সৌম্যকান্তি অশরীরীর প্রবেশ। ডক্টর রবীন বক্‌সি। গোটা ঘরের বিশৃঙ্খল চেহারা দেখে জিভ কাটলেন এক হাত। কাল্পনিক কব্‌জির দিকে তাকাতে তাকাতে বললেন,—যাহ্, মিটিং খতম?

ফাইলে লেখাজোখার কাজ সারছে যূথিকা। মাথা না তুলেই বলল,—নইলে কি মিটিং বসে থাকবে? সেই মনুষ্যজীবন থেকেই তো আপনি লেট। চেম্বারে লেট, ওটিতে লেট, পার্টিতে লেট। মারাও গিয়েছিলেন আপনি দুটো বাহান্নয়, ভেন্টিলেটারের কল্যাণে আপনার অফিশিয়াল ডেথ আরও তিন ঘণ্টা পরে হয়েছিল। অর্থাৎ মরাতেও আপনি লেট।

পিউ পা নাচাল,—করছিলেন কি এতক্ষণ? যাদের পেছনে দৌড়ে বেড়ান, সেই নার্সদিদিরাও তো আজ এখানে!

খিকখিক হাসলেন রবীন,—সুযোগ পেয়েছ বলে নাও। নেক্সট মিটিং-এ সবার আগে এসে বসে থাকব। দেখব সেদিন গভর্নমেন্টের লোকগুলো কটার সময়ে ঢোকে।

—খবরদার, সরকার তুলে কথা বলবেন না। ভুলে যাবেন না, সরকার ইজ অলমাইটি।

—বটেই তো। বটেই তো। সরকার সেজে যখন যাকে খুশি বাঁশ দিয়েছেন, পৈতৃক সম্পত্তি ভেবে ফাইল আটকে রেখেছেন...

—আহা, সে সব তো আগের জন্মে করত। পিউ রণবীরের পাশে এসে গেল,—আজ আমায় একটু খালপাড়ে বেড়াতে নিয়ে যাবে রণবীর?

রণবীর প্রায় গলে পড়লেন,—যাবে? চলো।

যূথিকা বলল,—এক্ষুণি নয়, আগে ইন্দুলেখার ফর্মাল এনট্রির কাজটা শেষ হয়ে যাক।

প্রথমে শপথবাক্য পাঠের পালা। পিউ নেচে উঠল,—আমি দিদাকে মন্ত্র পড়াই?

—পড়াও।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দুলেখার সামনে এসে চোখ বুজেছে, পিউ,—বলো কৃতস্য করনং নাস্তি...

ইন্দুলেখা বিড়বিড় করে বললেন,—কৃতস্য করনং নাস্তি...

—এবার বলুন, গতস্য শোচনাং নাস্তি।

—গতস্য শোচনাং নাস্তি

—এবার চিৎকার করে বলুন, মৃতস্য মরণং নাস্তি। হি হি হি।

—মৃতস্য মরণং নাস্তি...

শপথ পাঠ সমাপ্ত। যূথিকা টিভি থেকে ঝুপ করে নেমেছে,—এবার

আমাদের নিয়মকানুনগুলো আপনাকে জানিয়ে দিই। এগুলো অবশ্য প্রেসিডেন্ট অনঙ্গমোহনবাবুরই বলার কথা, কিন্তু সমস্যা হল উনি সাধারণ কথা সাধারণভাবে বললেও কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। পাস্ট রেকর্ড ভাল নয় তো। নেহাত প্রেসিডেন্ট পদে মন্ত্রী ছাড়া কাউকে রাখলে খারাপ দেখায়...

রামলাল হাই তুলল,—যা বোলার তাড়াতাড়ি বলুন। জাড়ে আমার নিদ এসে যাচ্চে।

—বলি। যূথিকা গলা ঝাড়ল,—শুনুন ইন্দুলেখা, মুক্ত সমাজে কিন্তু লজ্জা ঘেন্না ভয়ের কোনও জায়গা নেই।

ইন্দুলেখা বুঝদারের মতো মাথা নাড়লেন,—বটেই তো। নইলে আর মরে সুখ কিসের?

—এখন থেকে আপনি যা খুশি তাই করতে পারেন। শুধু ওপারের লোকের কাছে যাওয়া ছাড়া।

—বলেইছি তো, ও বাসনা আর নেই।

—এখন থেকে আপনি যাকে খুশি সঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে পারেন। পুরুষসঙ্গী নারীসঙ্গী যা ইচ্ছে।

—বটে?

—হ্যাঁ। ঝাং করে সানগ্লাস খুলল যূথিকা,—আপনি কী চান? হি? আর শী?

—পুরুষে আমার ঘেন্না ধরে গেছে ভাই।

—তাহলে মেয়ে পার্টনার চাই?

—কটা দিন একাই থাকি না। একা বেশ লাগছে। নিজের মনে ঘুরি ফিরি বেড়াই...

—তার সঙ্গে লিভটুগেদারের বিরোধ কোথায়? দু একটা ভাল জাতের পুরুষ এখন খালি আছে। এই যেমন ধরুন কোণে চুপটি মেরে বসে আছে, মাল্টিন্যাশনালের চিফ অ্যাকাউট্যান্ট ছিল...কিম্বা ওই যে সুপান্থ তালুকদার, পি ডব্লু, ডি-র ইঞ্জিনিয়ার, সদ্য ব্লাড ক্যানসারে মরে এখানে এসেছে...

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুজনকেই দেখলেন ইন্দুলেখা। প্রায় আঁতকে উঠে বললেন,—ওমা, এরা যে সব আমার ছেলের বয়সী!

—তুৎ, এপারে আবার ছেলে কিসের? অশরীরীদের কোনও বয়স থাকে না। যার সঙ্গে ইচ্ছে যতদিন খুশি থাকুন, ছেড়ে দিন, আবার একজনের সঙ্গে

ভাব করুন...। পত্রিকার সম্পাদক চলবে? বই-এর প্রকাশক? লেখক? গাইয়ে নাচিয়ে শিল্পী খেলোয়াড় সবই দু চার পিস করে পেয়ে যাবেন।

—না বাপু, ওসব আমার ভাল্লাগে না।

—আরে বাবা, থেকেই দেখুন না। এ একেবারে অন্য জীবন। মাধুরী প্রায় উড়ে পাশে এল,—আমি তো স্বাদ বদলানোর জন্য কটা দিন রামলালের সঙ্গেও থাকলাম। কী মিষ্টি গলা রামলালের, কত সুন্দর সুন্দর গান শোনাত! ...কী যেন? হ্যাঁ হ্যাঁ...গরীবোঁ কি শুনো, উও তুমহারি শুনেগা, তু এক পয়সা দে দে, উয়ো দশলাখ দেগা...

রীতিমত গলা ছেড়ে গান ধরেছে মাধুরী। সঙ্গে গলা মিলিয়েছে বাকিরা। গানের তাণ্ডব চলছে। থরথর কাঁপছে নীহারিকা। মেটালিক সাউন্ড!

সহসা এক ঝোড়ো বাতাস। ইন্দুলেখাও কখন যেন গানের তালে শরীর দোলাতে শুরু করেছিলেন, চমকে ফিরে তাকালেন। ওমা, বাতাস কোথায়, এ ঝড় যে সাক্ষাৎ পরিমল! তাঁর স্বামী!

ইন্দুলেখার মুখ দিয়ে বিস্ময় ঠিকরে এল,—তুমি কোথ্‌থেকে?

পরিমল খেঁকিয়ে উঠলেন,—যেখান থেকে তুমি এসেছ সেখান থেকে।

—হঠাৎ?

—হঠাৎ এর কী আছে? সন্ধেবেলা বুকে খুব পেইন হল, ডাক্তার এসে পৌঁছনোর আগেই ফুড়ুৎ। তিন ঘণ্টার মধ্যে কেওড়াতলা, সড়াৎ চুল্লিতে ঢুকে গেলাম, তারপর সোজা এখানে।

—এখানে কেন? ইন্দুলেখা অধৈর্য হলেন,—আবার বুঝি আমার হাড় জ্বালাবে?

—বয়েই গেছে। তুম ভি ফ্রি, তো হাম ভি ফ্রি। খুব ভেবেছিলে একা একা পালিয়ে এসে মজা মারবে, অ্যাঁ?

মুগ্ধ নয়নে পরিমলকে দেখছিল যূথিকা। কুঞ্চিত ললাট, তোবড়ানো গাল, দন্তহীন মাড়ি, ধনুকের মতো বেঁকে যাওয়া দেহকাণ্ড...!

আপন মনেই বলে উঠল,—উফ্, কী স্মার্ট!

পরিমল ফিরে তাকালেন। ভূতুড়ে মুগ্ধতায় দেখছেন যূথিকাকে। চড়া গলা খাদে নামিয়ে বললেন,—আপনার পরিচয়টা...?

—আমি যূথি। যূথিকা।

বলেই পরিমলের কানে এসে কানে কানে কী যেন বলল যূথিকা।

পরিমলের ফোকলা গালে হাসি ছড়িয়ে গেল।

ইন্দুলেখা ছটফট করে উঠলেন,—অ্যাই, তুমি ওর অত গায়ে পড়ছ কেন?

যূথিকা পাত্তাই দিল না। পরিমলের হাতে হাত রেখে ওয়াশিংমেশিনের দিকে যাচ্ছে। গোটা ঘর নীরব। চকিত ঘটনায় সবাই যেন থতমত খেয়ে গেছে।

—দেখতেই তো পাচ্ছেন পরিমল অনেকটা পথ ভেসে এল, এখন আমার সঙ্গে বিশ্রাম নেবে একটু। যূথিকা ফিক করে হাসল,—আপনার তো একে ঘোর অপছন্দ ছিল, নয় কি?

ইন্দুলেখা অসহায় চোখে উপস্থিত অশরীরীদের দিকে তাকালেন,—আপনাদের সভাপতিই নিয়মভঙ্গ করছে, অথচ আপনারা...?

পরিমলকে নিয়ে ওয়াশিংমেশিনের ডালা বন্ধ করছে যূথিকা। টুকুন মুখ বাড়িয়ে বলল,—কিছু মনে করবেন না ইন্দুলেখা, পরিমল যে আজ আসবেন তা আমি জানতাম। বুড়ো বয়সে বউ হারিয়ে বেচারা বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল। আর তাই তো একটু কায়দা করে আপনাকে আগে মুক্ত করে দিয়ে...সামনের অমাবস্যায় পরিমলও সমিতির পাকাপাকি সদস্য হয়ে যাবে। টা টা।

ইন্দুলেখা নিথর। হঠাৎই বুকে একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করছেন। বুক নয়, বুকের মতো কোনও একটা জায়গায় কোনও এক পরিত্যক্ত খাঁচার অন্তঃস্থলে। লোকটা এক কথায় যূথিকার সঙ্গে চলে গেল! এত বছর ইন্দুলেখার সঙ্গে ঘর করার পরও!

অশরীরীর দল তখনও হাঁ। নেতা হলে সব সমাজেই আইন ভাঙা চলে তাহলে? ছলনা প্রতারণাও? কী কাণ্ড!

৪ আলোছায়া

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরোতে বেরোতে সওয়া ন'টা বেজে গেল। কার্তিকের শেষ, এখনও তেমন শীত পড়েনি। তবে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব এসে গেছে। রাস্তাঘাট রীতিমত নির্জন। এ সময়ে কলকাতাকে কেমন যেন অচেনা অচেনা লাগে।

অন্তত অতসীর লাগছিল। আজ। এই মুহূর্তে। একা একা বলেই কি লাগছে এরকম? কেউ একজন পাশ দিয়ে গেলেই গা ছমছম করে ওঠে। ছিনতাই-এর মতলব নেই তো? কেউ একবার ফিরে তাকালেই মনে হয় নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য ভাল নয়। যদিও এমনটা মনে হওয়ার কোনও মানেই হয় না। এই চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সে। দু দুটো ধাড়ি ছেলেমেয়ের মা হয়ে। কিন্তু কী করবে অতসী, মনে হচ্ছে যে! দিব্যেন্দুটা যেন কী! বিকেলে নয় কাজে আটকে পড়েছিল, পরেও কি ডাক্তারের চেম্বারে চলে আসতে পারত না! অবলীলায় বলে দিল—যাদবপুর থেকে এন্টালি একদিন তুমি একা যেতে পারবে না! প্লিজ আজকের দিনটা যাও, অফিসে খুব বিশ্রী ফেঁসে গেছি। কাজ কাজ কাজ,

দিব্যেন্দুর কাছে এখন কাজটাই বড়। বউ-এর শরীর খারাপের থেকেও। এমনটাই বুঝি হয়। একটা বয়সে পৌঁছে পুরুষের কাছে বউ শুধুই একটা পাশবালিশ। থাকলে সুখ, না থাকলে আরও সুখ, দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে চিৎপাত হয়ে শোওয়া যায়। অবশ্য নিত্যদিন যে রোগে ভোগে তার প্রতি কতদিনই বা অন্যদের মনোযোগ থাকে! অতসীর ছেলেমেয়েরই কি আছে? মা মাঝে মাঝে নিশ্বাসের কষ্টে ছটফট করবে, রুটিন করে ডাক্তারের কাছে যাবে, বাড়াবাড়ি হলে ওষুধ ইঞ্জেকশান চলবে, আবার দিব্যি খাড়া হয়ে ঘানি টানবে সংসারের, এরকমই তো একটা সোজা সরল হিসেবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে বুবুলি টুবলু। একা একা ডাক্তার দেখাতে আসতে ভাল লাগে কারুর? কেউ বোঝে না, কেউ না। দিব্যেন্দু বা বুবলি টুবলুর এমন হলে অতসী কি তাদের একা ছেড়ে দিতে পারত!

ছোট্ট একটা নিশ্বাস চেপে অতসী বাসস্টপে এসে দাঁড়াল। রাত ন'টা কলকাতা শহরে এমন কিছু রাত নয়, দিব্যি গাড়িঘোড়া চলছে, বাসের প্রতীক্ষায় লোকও দাঁড়িয়ে আছে দু চার জন। ট্যাক্সি ধরে নেবে একটা? সামনে দিয়ে গোটা দু-তিন খালি ট্যাক্সি চলেও গেল, কিছুতেই সাহস করে ডাকতে পারল না অতসী। একা একা ট্যাক্সি চড়ার অভ্যেস অতসীর নেই এমন নয়। হরবখতই তো একা ট্যাক্সিতে যায় এদিকে ওদিকে। বাপের বাড়ি, ননদের বাড়ি, নিউমার্কেট—। কিন্তু রাত বড় রহস্যময়। দুটো অচিন লোকের পিছনে একা একা বসে আছে অতসী, ভাবতেই কেমন গা শিরশির কেন?

দৈত্যের মতো হাউমাউ করে প্রাইভেট বাস আসছে একটা। অতসী বাসের নম্বরটা পড়ার চেষ্টা করল। আঃ দূর থেকে ভাল বোঝা যাচ্ছে না। হেডলাইটের তীব্র দুটি পিঙ্গল চোখ আর হেমন্তের কুয়াশায় সংখ্যাটা বড় ঝাপসা ঝাপসা। চোখ কুঁচকে কপালে হাত রাখল অতসী ফুটপাথ থেকে নামল এক পা।

তখনই এক সাদা ফিয়াট সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—কোন্ দিকে যাবেন ম্যাডাম?

অতসী চমকে তাকাল। কে রে বাবা? তাকেই বলল কি?

সাদা ফিয়াটের চালক ঝুঁকে এদিকের জানলায় মুখ এনেছে,—কদ্দুর?

অতসীর সম্বিৎ ফিরল। ডাক্তারের চেম্বারে সদ্য পরিচয় হওয়া লোকটা।

উল্টোদিকের সোফায় বসে তারই মতো অপেক্ষা করছিল। টুকটাক কথাও বলছিল মাঝে মাঝে। ডাক্তাররা আজকাল কখনই ঘড়ি ধরে চেম্বারে আসে না, অপেক্ষা করে করে রুগীরা ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়, অ্যাপয়েন্টমেন্টে যে টাইম দেওয়া থাকে, কোনদিনই কেউ সেই সময়ে রুগীকে ডাকে না, সব ডাক্তারই এখন বড় বেশি প্রফেশনাল হয়ে গেছে, এই সব। লোকটা একবার অতসীর কাছ থেকে ম্যাগাজিনও চেয়ে নিয়েছিল। সাড়ে ছটা থেকে ঠায় বসে থাকতে থাকতে অতসীর গলা শুকিয়ে কাঠ, লোকটাই দেখিয়ে দিয়েছিল ওয়াটারফিল্টার।

অতসী সৌজন্যের হাসি হাসল। আঙুল তুলে বলল,—আমি এদিকে যাব। যাদবপুর।

—যাদবপুর? আমিও তো ওদিকেই। —আসুন উঠে পড়ুন।

অতসী অস্বস্তিতে পড়ে গেল। হুট বলতে অজানা লোকের গাড়িতে উঠে পড়া যায়? প্রাইভেট বাসটা গাড়ির ঠিক পিছনে, গাঁক গাঁক হর্ন দিচ্ছে। ঝটিতি চোখ বুলিয়ে অতসী বাসটাকে একবার দেখে নিল। নাঃ, বালিগঞ্জ স্টেশন। যাদবপুর যাবে না।

গর্জনরত বাসকে পথ দিতে গাড়ি খানিক এগিয়ে ফুটপাথ ঘেঁষে লাগাল লোকটা। দরজা খুলে নেমে এল,—সংকোচ করবেন না। আসুন, আপনাকে নামিয়ে দিচ্ছি।

স্টপে অপেক্ষমান দু একটা লোক বাসে উঠে গেল। আর মাত্র দুজন শেডের নীচে। লুঙ্গিসার্ট শোভিত দরিদ্র গোছের একজন, অন্যজন বছর কুড়ি পঁচিশেকের এক যুবক। ছেলেটা সিগারেট ফুঁকছে, কান অতসীদের সংলাপ। কোত্থেকে এক ভিখিরি শিশুর উদয়। নিঃশব্দে অতসীর পাশে এসে হাত পেতে দাঁড়িয়ে ছেলেটা।

ঝটিতি পরিপার্শ্বের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল অতসী। ঈষৎ চোয়াল ফাঁক করে বলল—থ্যাংক ইউ। এক্ষুণি বাস এসে যাবে। আপনি কেন মিছি মিছি...।

—আসুন না। রাতবিরেতে কেন দাঁড়িয়ে থাকবেন? আমি তো যাচ্ছিই ওদিকে।

এত জোরাজুরি করে কেন লোকটা? মনে অন্যকিছু আছে? একা মহিলা দেখেই অনেক পুরুষের মধ্যে নাইটহুড জেগে ওঠে, তারপর একটু সুযোগ

বুঝলেই খোলসটা সরে যায়। এই লোকটার চেহারা অবশ্য যথেষ্ট ভদ্র। বয়সেও খুব একটা চ্যাংড়া নয়, মোটামুটি অতসীর সমবয়সীই হবে।

ইতস্তত করে অতসী বলল,—আমি পারব চলে যেতে।

লোকটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল—অ্যাজ ইউ প্লিজ। আমরা দুজনে একসঙ্গে বসেছিলাম, ইন্সিডেন্টালি আমাদের ডেস্টিনেশানও কাছাকাছি, আমি আপনাকে নামিয়ে দিতে পারতাম।

আর আপত্তি করার যুক্তি পেল না অতসী। কী আর এমন ভয়ংকর কিছু হবে? অতসী তো আর বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে না, লোকটার যদি কোনও বাজে উদ্দেশ্য থাকেও, মুখ বাড়িয়ে চেঁচাতে তো পারবে।

ঘাড় নেড়ে বলল,—চলুন।

লোকটা পিছনের দরজা খুলে ধরল। ভব্য স্বরে বলল,—বসুন কমফর্টেব্‌লি।

অতসীর এবার সত্যিই লজ্জা লাগল। লোকটা গাড়ি চালাবে, আর অতসী পিছনের সিটে মেমসাহেবের মতো বসে থাকবে, এটা কি শোভন?

এগিয়ে গিয়ে সামনের দরজা খুলে বসল অতসী,—আপনি ওদিকে কোথায় থাকেন?

—সন্তোষপুর। গাড়ি স্টার্ট দিল লোকটা,—লেক মতো আছে একটা, তার ধারেই।

—ও।

ছোট্ট ধ্বনিটুকু উচ্চারণ করে অতসী চুপ। রাস্তায় জ্যাম ট্যাম নেই, গাড়ি সহজ ছন্দে ছুটছে। চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল ছাড়িয়ে গোল হয়ে ঘুরে পার্কসার্কাস ময়দানের দিকে এল। ময়দানে বোধহয় অচিরেই কোনও সার্কাস টার্কাস বসবে। প্রকাণ্ড এক বাঁসের খাঁচা তৈরি হয়েছে, কুয়াশা কুয়াশা অন্ধকারে খাঁচাটা কেমন আধিভৌতিক।

ছায়া ছায়া পথটুকু নীরবে পার হল লোকটা। চোখ গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনে স্থির। পাশে চুপচাপ অতসী। অস্বচ্ছন্দ। আড়ষ্ট টের পাচ্ছে, কিছু কথা বলা উচিত। কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছে না। আলগা কব্‌জি উল্টোল, ঘড়ি দেখার চেষ্টা করছে।

লোকটাই কথা বলে উঠল—টেনশান হচ্ছে খুব?

অতসী টানটান হয়ে বসল,—নাহ্। —রাত একটু হয়েছে বটে, তবে—

—বাড়ির লোক খুব ভাবছে মনে হয়?

অতসী শুকনো হাসল,—না, তার আর কী ভাববে! জানেইতো ডাক্তারের কাছে গেছে—

—আপনি বুঝি ডক্টর সেনকে রেগুলার দেখান?

—বছর খানেক দেখাচ্ছি। দু মাস তিন মাস পর পর ডেট দ্যান।

—প্রবলেমটা কী আপনার?

—নিশ্বাসের প্রবলেম।

—খুব কষ্ট হয়?

—যখন হয়, ভালই হয়। বিশেষ করে এই ঠাণ্ডা পড়ার আগে—এ বছর অবশ্য অনেক ভাল আছি। বলতে নেই, ডক্টর সেন রোগটা অনেক চেক করে দিয়েছেন।

—মাত্র এক বছরেই বুঝে ফেললেন?

—বারে, বুঝব না। আগে তো কম ডাক্তার দেখাইনি। ডক্টর সেনই তো প্রথম বললেন, লাঙ্‌সে নয়, আপার রেসপিরেটারি ট্র্যাকে প্রবলেম। নিশ্বাসের যেটুকু কষ্ট, পুরোটাই এক টাইপের অ্যালার্জি। ডাস্ট, ধোঁয়া, গন্ধ—

অতসী থেমে গেল। একটু বেশি কথা বলছে কি সে?

অনাবশ্যক। কিন্তু কষ্টের কথাটা বলতে পেরে ভালও লাগছে। টুবলু হওয়ার পর থেকেই কী যে হল! ঠাণ্ডা পড়লে নিশ্বাসে টান, গুমোট হলে দম বন্ধ, গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল কি পড়ল না অমনি গলা দিয়ে সাঁই সাঁই শব্দ। এমন অবস্থা, একদিন একটু ঘর ঝাড়াঝুড়ি করলেই সাত দিন বিছানায় পিঠে বালিশ নিয়ে পড়ে থাকো। ঠাকুরের ধূপ দেওয়া তো কবেই বন্ধ করে দিয়েছে অতসী, ঘরদোরে কীটনাশক তেল ছড়ানোর কথা ভুলেও ভাবতে পারে না। কী জীবন!

স্কুটার আরোহী এক দম্পতিকে পাশ কাটাতে ডানদিকে স্টিয়ারিং ঘোরাল লোকটা। মৃদুস্বরে বলল,—যখন সুস্থ থাকেন, তখন ভারি অদ্ভুত লাগে না? মনে হয় না, পৃথিবীতে এত বাতাসও আছে?

অতসী অল্প মাথা নাড়ল। তারপর বলল,—আপনারও কি এই কেস?

—এরকমই অনেকটা। তবে আরেকটু জটিল। আমার ফুসফুসে একটা

ছোট্ট ফুটো আছে।

—সেকি!

—হ্যাঁ। আছে কনজেনিটাল ডিফেক্ট। ছোটবেলাতেই ধরা পড়েছিল। হঠাৎ হঠাৎ দম আটকে যায়, চতুর্দিক অন্ধকার দেখি, বইখাতা খুলে বসতে পারি না—প্রচুর টেস্ট মেস্ট করে ডাক্তাররা শেষে ডিটেক্ট করল।

—তারপর? অতসীর চোখ বড় বড়।

—তার আর পর নেই। এখনও সেই অবস্থাতেই চালিয়ে যাচ্ছি। এক দু মাস ভাল থাকি, তো সাতদিন বিছানায়। কখনও হসপিটাল, তো কখনও নার্সিংহোম।

—ডক্টর সেন কী বলছেন? সারানো যায় না?

—দূর, এ রোগ সারে নাকি। লাঙ্ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারলে তাহলে হয়তো—মা কোনওদিন রিস্ক নিতে দিল না। ডক্টর সেনই চোদ্দ বছর দেখছেন। একই বাঁধা গৎ বলেন। গড়িয়ে গড়িয়ে হয়তো ষাট সত্তরও টেনে দিতে পারি, আবার হয়তো কালই—বলতে বলতে অল্প হাসল লোকটা,—মাঝখান থেকে মার হয়েছে জ্বালা। রাত্তিরে রোজ চারবার করে ঘরে এসে দেখে যেতে হয় ছেলের শ্বাস ঠিকঠাক চলছে কিনা।

অতসীর বাক্যস্ফূর্তি হচ্ছিল না। কোনরকমে অস্ফুটে বলল,—কোনও ওষুধ বিষুধে কিচ্ছু হয় না? প্রিকশানও নিয়েও সামাল দেওয়া যায় না?

—মেডিসিনই তো ঠেকা দিচ্ছে। নইলে বেঁচে আছি কী করে? আর প্রিকশান তো কয়েকটা আছেই। টেনশান ফ্রি লাইফ লিড করতে হবে, ফিজিকাল মেন্টাল কোনও স্ট্রেইন চলবে না—এই গাড়ি ড্রাইভ করাও আমার বারণ।

—চালাচ্ছেন কেন? ড্রাইভার রেখে দিন।

—বাড়ির লোকরাও খুব ফোর্স করে। রেখেও ছিলাম ড্রাইভার। অন্য কেউ গাড়ি চালালে আমার ভীষণ টেনশান হয়।

—কেন?

—একটা লোক আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বেঁচে থাকা, মরা, সবই তার ওপর ডিপেন্ডেন্ট, ভাবলেই আমার দম আটকে আসে। পাবলিক ভেহিকিলেও চড়তে পারি না, এত ভিড়—

বালিগঞ্জ ফাঁড়ি এসে গেছে। এদিকে এখনও অনেক মানুষ। হ্যালোজেন আলোয় ঝলমল করছে অন্ধকার।

অতসী আনমনে বলল,—এটা কিন্তু ভাল না।

—কোন্‌টা ম্যাডাম?

—এই ডাক্তারের কথা না মানা। গাড়ি চালানোর স্ট্রেইন নেওয়া।

লোকটা আচমকা বলে উঠল,—ডোন্ট মাইন্ড ম্যাডাম, আপনি ডাক্তারের সব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন?

—আমার প্রবলেম আর আপনার প্রবলেম এক হল? তাছাড়া আমাদের, মেয়েদের অত মানামানি করলে চলে না। সংসার ছেলেমেয়ে ম্যানেজ করে যতটা সম্ভব ততটাই মানি।

—তার মানে আপনিও লুকিয়ে চুরিয়ে একটু আধটু অনিয়ম করেন! লোকটা হা হা হেসে উঠল,—ম্যাডাম, মানুষের জীবনটা এরকমই। ম্যান ইজ ডেসটিনড্ টু ডাই। আজ, নয় কাল। যেদিনই জন্মেছেন, সেদিন থেকেই মৃত্যুর দিকে এক পা এক পা করে এগোতে শুরু করেছেন। মাঝখানে গাদা গাদা নিষেধের বেড়া তুলে কী লাভ?

সহসা অতসী কেঁপে উঠল সামান্য। ঠাণ্ডা হাওয়ায়, নাকি লোকটার কথায়? লোকটার কথায়, না লোকটার উদাসীন ভঙ্গিতে? নির্মম পরিণতিটাকে কী নির্বিকারভাবে মেনে নিতে পেরেছে! কিম্বা হয়তো পারেনি, রোজ যুঝতে যুঝতে হাল ছেড়ে দিয়ে বেঁচে থাকার দর্শনটাকেই বদলে নিয়েছে। করে কী লোকটা? চাকরি? ব্যবসা? নাকি কিছুই করে না? গাড়ি যখন আছে বাড়ির অবস্থা মনে হয় স্বচ্ছল। মার কথা তো বলছিল, আর কে কে আছে। বিয়ে থা করেনি, এটা নিশ্চিত। নাহলে একবার না একবার বউ বাচ্চার উল্লেখ করত। হঠাৎ অতসী আবিষ্কার করল, লোকটার চোখদুটো ভারি উজ্জ্বল, চশমার আড়ালেও ঝিকঝিক করছে। ওই চোখকে কি উজ্জ্বল বলে, না গভীর? গভীর চোখের মানুষরা বড় স্পর্শকাতর হয়, দুঃখীও।

অতসীর বুকটা চিনচিন করে উঠল। মায়ায়। সহানুভূতিতে। আহা রে, নিশ্চয়ই এ জীবনে কোনও মেয়ের প্রেম ভালবাসা পেলনা লোকটা। বেচারা।

গড়িয়াহাটের মোড়ে ট্রাফিক সিগনালে দাঁড়িয়ে গেছে গাড়ি। পাশেই মিনিবাস বিশ্রী ধোঁয়া ছাড়ছে। শাড়ির আঁচলে নাক চাপল অতসী। লোকটা

ঝুঁকে অতসীর দিকের কাঁচটা তুলে দিল। লোকটার কনুই একটু বুঝি ছুঁটে গেল অতসীকে। আলগাভাবে।

লাল নির্দেশ সবুজ হয়ে গেছে। গাড়ি চলছে নিঃশব্দ গতিতে। গাড়ির মধ্যেও নৈঃশব্দ। হঠাৎই।

ঢাকুরিয়া ব্রিজে উঠে লোকটাই প্রথম কথা বলল,—যাদবপুরের কোথায় আপনার বাড়ি?

—ইব্রাহিমপুর রোড।

—এইট বি স্ট্যান্ডের পেছনে?

—হ্যাঁ।

—বাড়ি অব্দি পৌঁছে দেব?

—না না, কী দরকার। সরু গলি—

—আমার প্রবলেম নেই।

—না না, ঠিক আছে। আমি বড় রাস্তাতেই নামব।

লোকটা আর কথা বাড়াল না। যান্ত্রিক পুতুলের মতো স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে, গিয়ার বদলাচ্ছে, ব্রেকে পা, ক্লাচে পা।

যাদবপুর এসে গেল।

গাড়ি থেকে নামল অতসী। ঝুঁকল,—থ্যাংক ইউ।

গাড়ি এগোচ্ছে না। থেমেই আছে। লোকটাকে কি অতসীর বাড়ি যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো উচিত? এখানেও গাড়ি রেখে স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসা যায়। সামনেই তো অতসীর বাড়ি। গলিতে ঢুকে, মাত্র দুটো বাড়ির পর। বুবলি টুবলু কি কিছু মনে করবে? দিব্যেন্দু? মনে হয় না। দুঃখী মানুষটার কথা শুনলে ওরাও নিশ্চয়ই—

আশ্চর্য, অতসীর মুখে অন্য কথা ফুটল,—অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবার হয়তো ডাক্তারের চেম্বারে দেখা হবে। আজ চলি।

একটু বুঝি দ্রুত পায়েই রাস্তা পার হল অতসী। গলির মুখে এসে ফিরে দেখল, গাড়ি মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। গতি যেন সামান্য মন্থর।

দিব্যেন্দু বেশ উদ্বিগ্ন হয়েই প্রতীক্ষা করছিল। অতসী ফ্ল্যাটে পা রাখতেই প্রশ্ন উড়ে এল,—এত দেরি? চেম্বারে বুঝি খুব ভিড় ছিল আজ?

অন্যমনস্ক স্বরে অতসী বলল,—হুঁ।

—ফিরলে কিসে? মিনিবাস?

—জেনে তোমার লাভ? ফিরেছি, ব্যস্।

—চটে যাচ্ছ কেন? দিব্যেন্দু তোষামোদের সুরে বলল, —যাই তো তোমার সঙ্গে, আজই নয় হয়ে উঠল না। ট্যাক্সি ধরে নিলে পারতে।

অতসী উত্তর দিল না। অপাঙ্গে দেখে নিল গোছানো সংসারটাকে। ষোলো বছরের বুবলি যথেষ্ট সাব্যস্ত হয়ে গেছে, খাবার-দাবার গরম করে খেতে দিয়ে দিয়েছে ভাইকে। নিজেও খাচ্ছে। দিব্যেন্দু আবার ফিরে গেছে টিভির সামনে, রিমোটে আঙুল, ঠোঁটে সিগারেট। উড়ে উড়ে আসছে ছোট ছোট প্রশ্ন। নতুন কোনও ওষুধ দিল কি ডাক্তার? টেস্ট করতে বলেছে কি কিছু? নেক্সট কবে আবার ডেট দিয়েছে?

উত্তর দিতে দিতে সংসারে ডুবে যাচ্ছিল অতসী। তারমধ্যেই মৃত্যুর ছোঁয়া মাখা চোখ দুটোকে মনে পড়ে যাচ্ছিল হঠাৎ হঠাৎ। একবার ভাবল লোকটার গল্প করে দিব্যেন্দুকে। ফুসফুসে ফুটো নিয়ে বেঁচে থাকা এক মানুষের গল্প। মৃত্যু দরজায় কড়া নাড়ছে জেনেও নিরাসক্ত জীবনের গল্প।

পারল না বলতে।

—কেন যে পারল না!

আশ্চর্য, লোকটার নাম ঠিকানা কিচ্ছু জানেনি অতসী!

কেন যে জানে নি!